# ইসলাম ও শীয়া মাযহাব

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ

# বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

## লেখক পরিচিতি

আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ একটি অতীব সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারের জন্ম গ্রহণ করেন । যে পরিবারের চৌদ্দ পুরুষ বংশ পরস্পরায় তাব্রীজের আলেম হিসাবে প্রখ্যাত ছিলেন । তিনি হিজরী ১৩২১ সনের ২৯ শে জিলক্বদ জন্ম গ্রহণ করেন । প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নিজের এলাকাতেই অর্জন করেন । অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি হিজরী ১৩৪৪ সনে ইরাকের 'নাজাফে আশরাফ' নামক শহরে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে যান । শীয়াদের সর্ব বৃহৎ এই জ্ঞান কেন্দ্রে তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান অর্জনে মশগুল হন । তিনি ফিকহ্ ও উসুল শাস্ত্রদ্বয়কে 'আয়াতুল্লাহ শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন নায়েনী' ও আয়াতুল্লাহ শায়খ মুহাম্মদ হুসাইন গারাবী ইস্পাহানী 'কোম্পানী' নামক প্রসিদ্ধ শিক্ষকদ্বয়ের নিকট এবং দর্শন শাস্ত্র 'আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ হুসাইন বদকুবী' ও গণিতশাস্ত্র 'আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আবুল কাসিম খুনসারী' নামক প্রসিদ্ধ শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন । অন্যদিকে আধ্যাত্ম বা নিজেকে নৈতিক ভাবে গড়ে তোলার জন্যে হাজী মির্জা আলী কাজীর শিষ্যত্ব বরণ করেন । এই মহান ব্যক্তি প্রজ্ঞাশাস্ত্রের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শাখায় উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন ।

উল্লেক্ষ্য যে ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা ইমাম খোমেনী (রহঃ) ও আত্মগঠনের ক্ষেত্রে জনাব কাজী (রহঃ)- এর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন । অতঃপর তিনি হিজরী ১৩৫৪ সনে নিজের জন্ম স্থান তাব্রিজে ফিরে আসেন । আল্লামা তাবাতাবাঈর শিক্ষা কেবল মাত্র ফেকাহ্ শাস্ত্রের সাধারণ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তিনি আরবী ব্যাকারণ, অলংকার শাস্ত্র ও সাহিত্যে এবং ফেকহ্ ও উসুল শাস্ত্রে গভীর ভাবে জ্ঞান অর্জন করেন । একই ভাবে তিনি প্রাচীন গণিত ইউক্লিডের মুলনীতি থেকে টলেমীর লেখা জ্যোর্তি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ (The Almagest) টলেমী পদ্ধতি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন । অন্য দিকে তাফসীর, দর্শন শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা ও ইরফান শাস্ত্রে এত গভীর ভাবে জ্ঞান অর্জন করেন যে, ইজতিহাদের পর্যায়ে উপনীত হন ।

জনাব আল্লামা হিজরী ১৩৬৫ সনে আপন জন্মভূমি ত্যাগ করে কোমে এসে অবস্থান নেন । কোমে তিনি নীরবে কোন হৈ চৈ ছাড়াই তাফসীর ও দর্শনের ক্লাশ নেয়া শুরু করেন । এ সময়ে তিনি

তেহরান সহ আরো বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শন বা ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞানপ্রিয় লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন । যাদের মধ্যে অবশ্যই ওস্তাদ হেনরী কার্বনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । জনাব আল্লামা কয়েক বছর যাবৎ জ্ঞানী- গুনী- পণ্ডিত ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে হেনরী কার্বনের সাথে বৈঠক অব্যাহত রাখেন । উক্ত আলোচনায় ধর্ম, দর্শন ও আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ও বাস্তবতা অনুসন্ধানীর করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে অতিগুরুত্ব পূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হত । ঐ জাতীয় উচ্চ মার্গীয় উন্মুক্ত চিন্তার আলোচনা বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অতি বিরল । এই আলোচনা সমষ্টি পরবর্তীতে দু'খণ্ডে গন্থাকারে প্রকাশ করা হয় । কোমের ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র আল্লামার সবচেয়ে বড় অবদান হল বুদ্ধিবৃত্তিক ও কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত জ্ঞান চর্চায় পুনরুজ্জীবন সঞ্চার করা । তারই একান্ত প্রচেষ্টায় দর্শন শাস্ত্রের মৌলিক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ 'আশ্ শাফা' ও 'আসফার' এই গন্থদ্বয়ের শিক্ষার প্রসার ঘটে ।

আল্লামার বিশ্বাস ও আচার- আচারণ ছিল অতীব আকর্ষনীয়, একজন পরিশুদ্ধ মানবের ন্যায় । তাই জ্ঞান প্রিয় ব্যক্তিরা অতি সহজে তার আলোচনা সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন । আল্লামা বিশ্বাস করতেন জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক গঠন একান্ত প্রয়োজন । এ জন্যেই তিনি আপন ছাত্রদের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন । প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে ব্যক্তি গঠনের এক সুনিপুন আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

## ভূমিকা

'ইসলাম ও শীয়া মাযহাব' নামক এ গ্রন্থে ইসলামের দু'টি বৃহৎ উপদলের (শীয়া ও সুন্নী) অন্যতম শীয়া মাযহাবের প্রকৃত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি, বিকাশ ও চিন্তাধারার প্রকৃতি এবং ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপারে শীয়া মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গী এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

**ধর্ম :** এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ তার স্বজাতীয় লোকদের সাথে সমাজবদ্ধ হয়ে একসংগে জীবন যাপন করে। মানুষ তার জীবনে সামাজিক পরিবেশে যে সব কাজ করে, সে সকল কাজ পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। যেমনঃ মানুষের খাওয়া, পড়া, পান করা, চলা, ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া, পরস্পরের সাথে মেলা মেশা ইত্যাদি কাজ বাহ্যতঃ পরস্পর সম্পর্কহীন বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলো সম্পূর্ণ রূপে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যে কোন কাজই ইচ্ছেমত যত্র- তত্র ও যখন ইচ্ছে তখন করা যায় না। বরঞ্চ যে কোন কাজের জন্যেই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রয়েছে। তাই মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ- কর্মগুলো সুনির্দিষ্ট একটি নিয়মতান্ত্রিকতার অধীনে সম্পন্ন করে, যা কখনই ঐ নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয় না। আর মানব জীবনে সম্পাদিত সকল কাজের উদ্দেশ্যই বিশেষ একটি বিন্দু থেকে উৎসারিত। আর সেই কেন্দ্র বিন্দুটি হল, মানব জীবনের সাফল্য ও সৌভাগ্র লাভের আকাংখা, অর্থাৎ মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তার অভাব ও প্রয়োজন গুলোকে যথাসম্ভব পূর্ণ করার আকাংখা পোষণ করে।

এ কারণেই মানুষ তার জীবনের সকল কাজকর্মকে তার স্বরচিত নিজের ইচ্ছেমত রচিত আইন বা অন্যের কাছ থেকে গৃহীত আইনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। এ ভাবে সে আপন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করে। তাই জীবন যাপনের স্বার্থে সে প্রয়োজনীয় জীবন উপ্রকরণ সংগ্রহের জন্যে আত্মনিয়োগ করে। কেননা, সে বিশ্বাস করে জীবন উপ্রকরণ সংগ্রহ জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি বিধান। সে রসনার তৃপ্তি সাধান এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে খাদ্য ও পানি পান করে থাকে। কেননা, সে

সৌভাগ্যপূর্ণভাবে বেচে থাকার জন্যে খাওয়া ও পান করাকে সে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। ঠিক এভাবেই সে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের লক্ষ্যে পূর্বনির্ধারিত কিছু নিয়ম মেনে চলে।

মানব জীবনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী উল্লিখিত বিধি বিধানের ভিত্তিমূল একটি বিশেষ মৌলিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার উপরই মানব জীবন নির্ভরশীল।

মানুষ এই সৃষ্টি জগতেরই একটি অংশ বিশেষ এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের মূলরহস্য সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস রয়েছে। সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে মানুষের চিন্তা- ভাবনা বা ধারণার প্রকৃতি কেমন হতে পারে, একটু চিন্তা করলেই তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন- যারা এ সৃষ্টি জগতর্ক শুধুমাত্র জড় বা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে এবং মানুষকেও সম্পূর্ণরূপে (১০০%) জড় অস্তিত্ব (জন্মের মাধ্যমে জীবনের সূচনা এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তার ধ্বংস) বলে বিশ্বাস করে, তাদের অনুসৃত জীবন পদ্ধতিও জড়বাদের উপর ভিত্তি করেই রচিত। অর্থাৎ স্বল্পকালীন এ পার্থিব জীবনের স্বাদ উপভোগই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর এ জন্যেই সমগ্র বিশ্বজগৎ ও প্রকৃত্রিক বশে আনার জন্যে তারা তাদের জীবনের সকল প্রচেষ্টা ও সাধানা বিনিয়োগ করে।

আবার অনেকেই (মূর্তি উপাসকরা) এ বিশ্ব জগৎ ও প্রকৃত্রিক তার চেয়ে উচ্চতর ও মহান এক অস্তিত্বের (আল্লাহ) সৃষ্টিকর্ম বলে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ মানুষকে তার অসংখ্য অনুগ্রহ মূলক দান ও নেয়ামতের মাঝে নিমজ্জিত রেখেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত অসীম অনুগ্রহ উপভোগ করে উপকৃত হতে পারে। সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ এমন এক জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করেন, যার মাধ্যমে সর্বস্রষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার ক্রোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, যদি তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে সমর্থ হন, তাহলে তিনি তাদের প্রতি তার অনুগ্রহের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন এবং তাদেরকে অসীম ও চিরন্তন অনুগ্রহ বা নেয়ামতের অধিকারীও করবেন। আর মানুষ যদি তার কৃতকর্মের মাধ্যমে মহান স্রষ্টার ক্রোধের সঞ্চার করে, তাহলে তারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ বা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।

অন্য দিকে যারা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়াও মানুষের জন্যে এক অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী, এবং মানুষকে তার পার্থিব জীবনের কৃত সকল ভাল ও মন্দ কাজের জন্যে দায়ী বলে বিশ্বাস করে । ফলে তারা কেয়ামত দিনের প্রতিও বিশ্বাসী, যে দিন মানুষকে তার ভাল মন্দ সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এবং ভাল কাজের জন্যে পুরস্কৃত করা হবে; এই কেয়ামতের দিনকে ইহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী এবং মুসলমানরা ও বিশ্বাস করে । এ ধরণের বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিরা এমন এক জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করে যা ঐ মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জশ্যপূর্ণ এবং মানুষের ইহকাল ও পরকালীন উভয় জীবনেই সৌভাগ্যবান হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে । এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাসসমূহ এবং তার ভিত্তিতে রচিত অনুকরণীয় জীবন পদ্ধতির নীতিমালা সমষ্টির অপর নামই 'দ্বীন' । 'দ্বীনের' মধ্যে সৃষ্ট শাখা সমূহকে 'মাযহাব' বলা হয় । উদাহরণ স্বরূপ যেমন : আহলুস সুন্নাহ ও আহলুস তাশাইয়ূ ইসলামের অন্যতম দু'টি মাযহাব এবং খৃষ্টান ধর্মের মালেকানী ও নাসতুরী মাযহাবদ্বয় ।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মানুষ দ্বীনের (এক শ্রেণীর মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত জীবন পদ্ধতি) প্রতি নির্ভরশীলতা থেকে (যদি সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নাও হয়) আদৌ মুক্ত নয় । সুতরাং 'দ্বীন' মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় এমন এক জীবন পদ্ধতি, যা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ । পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী 'দ্বীন' কে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের জন্যে অসম্ভব । এটা এমন এক পথ যা স্বয়ং মহান আল্লাহ মানব জাতির প্রতি প্রসারিত করেছেন এবং মহান আল্লাহতে গিয়েই এ পথের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । অর্থাৎ সত্য 'দ্বীন' ( ইসলাম) গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথেই ধাবিত হয় । আর যারা সত্য 'দ্বীন'কে গ্রহণ করেনি প্রকৃতপক্ষে তারা ভ্রান্ত পথই অনুসরণ করেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে ।[১]

**ইসলাম :** আত্মসমর্পণ ও মাথানত করাই 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ । পবিত্র কুরআনে যে 'দ্বীন' অনুসরণের প্রতি মানব জাতিকে আহবান্ করা হয়েছে, তা হচ্ছে 'ইসলাম' । ইসলাম নাম করণের মূল কারণ হচ্ছে, সমগ্র বিশ্ববাসী একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে

আত্মসমপণ করবে । এই আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতিতে সে এক আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কারো নির্দেশের আনুগত্য করবে না এবং একমাত্র তারই উপাসনা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না । আর এটাই হল ইসলামের মূল কর্মসূচী ।[২] পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই 'দ্বীন' কে ইসলাম' ও এর অনুসারীদেরকে 'মুসলমান' হিসেবে নাম করণ করেন, তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) ।

শীয়া: 'শীয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অনুসারী । যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পরিবারকে তার প্রকৃত ও একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করেন, তারাই 'শীয়া' নামে পরিচিত । তারা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পবিত্র আহলে বাইত (আ.)- এর আদর্শের অনুসারী ।[৩]

# শীয়া মাযহাবের উৎপত্তি ও তার বিকাশ প্রক্রিয়া

সর্বপ্রথম যারা 'শীয়াতু- আলী' বা হযরত আলী (আ.) [পবিত্র আহলে বাইতের (আ.) ইমামদের প্রথম ইমাম]- এর অনুসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল, তাদের আবির্ভাব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবদ্দশাতেই ঘটেছিল । মহানবী (সা.)- এর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ নবুয়ত কাল ইসলামের আবির্ভাব, প্রচার ও অগ্রগতির ঘটনা অন্য উপলক্ষ্য বা হেতুর সৃষ্টি করেছিল । ঐসব উপলক্ষ্য বা হেতুগুলোই রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদের মাঝে এ ধরণের একটি সম্প্রদায়ের (শীয়া) আবির্ভাব ঘটিয়ে ছিল ।[৪]

১. নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিনগুলোতে মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম নিকটআত্মীয়দের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন ।[৫] তখন তিনি স্পষ্টভাবে তাদেরকে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমার আহবানে সাড়া দিবে, সেই হবে আমার প্রতিনিধি এবং স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী ।" তখন একমাত্র হযরত আলী (আ.)- ই সবার আগে মহানবী (সা.)- এর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (আ.)- এর ঈমান আনয়নের বিষয়টিকে স্বাগত জানান এবং তাঁর ব্যাপারে স্বীয় প্রতিশ্রুত্রিকও তিনি রক্ষা করেছিলেন ।[৬] এটা কখনই সম্ভব নয় যে, কোন একটি আন্দোলনের নেতা, আন্দোলনের সূচনা লেগে কোন একজন সহযোগীকে তার প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসেবে অন্য সবার কাছে পরিচিত করাবেন, অথচ তার একনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী সহযোগীদের কাছে তাকে তিনি পরিচিত করাবেন না । অথবা তাকে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পরিচিত করাবেন, কিন্তু তার সমগ্র জীবদ্দশায় তাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করবেন, তার স্থলাভিষিক্তের পদমর্যাদাকে উপেক্ষা করবেন এবং অন্যান্যদের সাথে কোন পার্থক্যই রাখবেন না ।

১. শীয়া ও সুন্নী উভয় সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য 'মুতাওয়াতির' ও 'মুস্তাফিজ' হাদীসে মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) তার কথায় ও কাজে ভুল- ত্রুটি থেকে মুক্ত।[৭]

তিনি যা কিছু বলেন এবং করেন, সবই ইসলামের প্রচার কাজের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ । ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞান ও শরীয়তের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ।[৮]

২. হযরত আলী (আ.) ইসলামের জন্যে অতীব মূল্যবান সেবামুলক কাজ করেছেন । ইসলামের পথে তিনি আশ্চর্যজনক আত্মত্যাগের প্রমাণ রেখেছেন । উদাহরণ স্বরূপ মদীনায় হিজরতের রাতে মহানবী (আ.)- এর বিছানায় শয়ন, [৯] বদর, ওহুদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধ তার দ্বারা অর্জিত বিজয়সমূহ উল্লেখযোগ্য । এ সব ঘটনার কোন একটিতেও যদি তিনি উপস্থিত না থাকতেন তাহলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ সেদিন আল্লাহর শত্রুদের হাতে ধ্বংস হয়ে যেত ।[১০]

৩. 'গাদিরে খুমের ঘটনা', এ ঘটনায় মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে জনসাধারণের মাঝে তাদের গণনেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ও পরিচিত করিয়ে দেন । তিনি আলী (আ.)- কে নিজের মতই জনগণের অভিভাবকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ।

৪ হযরত আলী (আ.)- এর এধরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মহত্বের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি ছিল একটি সর্বসম্মত ব্যাপার ।[১১] এ ছাড়াও তাঁর প্রতি আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর ভালবাসা ছিল অপরিসীম ।[১২] সব মিলিয়ে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সত্য ও মহত্বের অনুরাগী রাসূল (সা.)- এর বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী আলী (আ.)- এর প্রেমে অনুরক্ত ও তার অনুসারীতে পরিণত হবেন । একইভাবে এ বিষয়টি বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীর ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণও ঘটিয়েছিল, যা তাদেরকে আলী (আ.)- এর প্রতি শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল । এ সকল বিষয় ছাড়াও স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর পবিত্র বাণীসমূহে "শীয়াতুআলী [আলী (আ.)- এর অনুসারী] এবং 'শীয়াতু আহলুল বাইত' ( পবিত্র আহলে বাইতের অনুসারী) নামক শব্দগুলোর বহুল ব্যাবহার পরিলক্ষিত হয় ।[১৩]

## সুন্নী জনগোষ্ঠী থেকে শীয়া জনগোষ্ঠীর পৃথক হওয়ার কারণ

রাসূল (সা.) সাহাবাবৃন্দ এবং মুসলমানদের কাছে হযরত আলী (আ.) উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন । স্বাভাবিকভাবেই হযরত আলী (আ.)- এর ভক্ত ও অনুসারীদের এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মহানবী (সা.)- এর তিরোধনের পর মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব ও খেলাফতের অধিকার একমাত্র হযরত আলী (আ.)- এর- ই- রয়েছে । আর রাসূল (সা.)- এর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থ অবস্থার সময়ে সংঘটিত কিছু ঘটনা ছাড়া অন্য সকল ঘটনা প্রবাহ তাদের এ ধারণারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল ।[১৪]

কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে তাদের ধারণার বিপক্ষে বইতে শুরু করল । আর এটা তখনই ঘটল, যখন বিশ্বনবী (সা.) সবেমাত্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন । তার পবিত্র দেহ এখনও দাফন হয়নি । রাসূল (সা.)- এর শোকগ্রস্থ পবিত্র আহলে বাইত (আ.) ও কিছু সংখ্যক সাহাবী যখন রাসূল (সা.)- এর দাফন কাফনের আয়োজন্য ব্যস্ত, ঠিক তখনই খবর এল, কিছু সংখ্যক সাহাবী খলিফা নির্বাচন করে ফেলেছেন । খলিফা নির্বাচনের ঘটনা এত দ্রুত ও তাড়াহুড়ার মধ্যে ঘটানো হয়েছিল যে, এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর পবিত্র আহলে বাইত (রাসূলের পরিবার), আত্মীয় স্বজন এবং ভক্ত ও অনুসারীদেরকে পরামর্শের জন্যেও কোন প্রকারে সংবাদ দেয়া হয়নি । এ ঘটনার মূল ব্যক্তিরা পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও প্রথম অবস্থায় এদের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য । অথচ তারা বাহ্যত মুসলমানদের কল্যাণকামীতার দাবিদ্যার ছিল । এ ভাবেই হযরত আলী (আ.) ও তার অনুসারীরা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখী হলেন ।[১৫]

হযরত সালমান ফারসী, হযরতুমিকদাদ, হযরত আবুযার, হযরত আব্বাস, হযরত যুবাইর, হযরত আম্মারসহ হযরত আলী (আ.) ও তার অন্যান্য অনুসারীরা রাসূল (সা.)- এর দাফন কাফনের অনুষ্ঠান শেষ করা এবং খলিফা নির্বাচনের ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে তারা কঠোর সমালোচনা করেন । এ ছাড়াও তথাকথিত নির্বাচিত খলিফা এবং এ ঘটনার মূল ব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারে তারা ব্যাপক প্রতিবাদ জানান । এমন কি এ ব্যাপারে

তারা কিছু গণজমায়েতও করেন । কিন্তু এর উত্তরে তাদেরকে বলা হয়, এ ঘটনাকে মেনে নেয়ার মাঝেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।[১৬]

প্রতিষ্ঠিত খলিফার প্রতি সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচারণই হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার কারণ ঘটিয়ে ছিল । আর তখন থেকেই হযরত আলী (আ.)- এর অনুসারীরা 'শীয়াতু আলী' (আলীর অনুসারী) নামে সমাজে পরিচিতি লাভ করে । অবশ্য খলিফার প্রশাসনিক অঙ্গনে এমন এক সতর্কপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল যে, আলী (আ.)- এর অনুসারীরা এভাবে বিশেষ একটি নামে সমাজে পসিদ্ধি লাভ না করুক । মুসলিম সমাজ এভাবে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি দলে বিভক্ত না হোক । বরং তাদের প্রচেষ্টা ছিল খেলাফতর্ক একটি সর্বসম্মত বিষয় হিসেবে সমাজের কাছে তুলে ধরা । তাই খেলাফতের বিরোধীদেরকে তারা 'বাইয়াতের' বিরোধী ও মুসলিম উম্মার বিরোধী হিসেবে সমাজে পরিচিতি করাতে থাকলেন । কখনও বা খেলাফতের বিরোধীদেরকে এর চেয়ে জঘণ্য ভাষায় সম্বোধন করা হত ।[১৭]

অবশ্য শীয়াদেরকে সেদিন তাদের জন্ম লেগেই প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা পদদলিত হতে হয়েছিল । শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিবাদ- কর্ম সূচীর মাধ্যমে তারা একপাও অগ্রসর হতে পারেনি । আর হযরত ইমাম আলী (আ.) ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থের অভাবে একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব থেকে বিরত রইলেন । কিন্তু খেলাফত বিরোধী পক্ষ তাদের মতাদর্শের ব্যাপারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি । রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকার ও জ্ঞানগত নেতৃত্বের ব্যাপারে তারা একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)- কেই যোগ্য বলে বিশ্বাস করতেন ।[১৮] তারা জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের গুণাবলী একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন । তাই তারা তাঁর দিকেই মুসলমানদেরকে আহবান জানাতেন ।[১৯]

## রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকার ও জ্ঞানগত নেতৃত্বের বিষয়

ইসলামের শিক্ষা থেকে শীয়ারা যে জ্ঞান লাভ করেছিল, তাতে শীয়ারা বিশ্বাস করত যে, যে বিষয়টি সমাজের জন্যে সর্বপ্রথম জরুরী তা হল, ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সবার সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হওয়া ।[২০] আর পরবর্তী পর্যায়ে সেই ইসলামী শিক্ষা সমূহকে পূর্ণ ভাবে সমাজে প্রয়োগ করা । অন্য কথায়,

**প্রথমতঃ** সমাজের প্রত্যেককেই এ পৃথিবী ও মানব জাতিকে বাস্তব দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে একজন মানুষ হিসেবে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত এবং তা পালনে বর্ত হওয়া উচিত । এমন কি তা যদি তার ইচ্ছার বিরোধীও হয় তবুও তা পালন করা উচিত ।

**দ্বিতীয়তঃ** একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সমাজে ইসলামের প্রকৃত বিধি বিধান সমূহকে সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করবে । যাতে করে ঐ সমাজের কেউই যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা না করে এবং সবাই পূর্ণ স্বাধীনতাসহ ব্যক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভোগ করতে পারে । আর এদু'টি মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিস্পাপ হওয়ার মত গুণের অধিকারী হবে । অন্যথায় হয়ত এমন কোন লোক সেই শাসন ব্যবস্থা ও জ্ঞানগত নেতৃত্বের আসনের অধিকারী হয়ে বসবে, যে তার ঐ গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চিন্তাগত পথভ্রষ্টতা বা বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভবনা থেকে মুক্ত নয় । এর ফলে তখন ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা ব্যহত হবে ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা একটি অত্যাচারী একনায়েক বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে । তখন ইসলামের পবিত্র জ্ঞানভান্ডার পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মতই স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থান্বেষী পণ্ডিত মহলের দ্বারা বিকৃতির স্বীকার হবে । বিশ্বনবী (সা.)- এর সাক্ষ্য অনুযায়ী একমাত্র যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে এ পদের জন্যে উপযুক্ত ছিল এবং যার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.)- এর সুন্নাতের অনুরূপ ছিল, তিনি হচ্ছেন হযরত আলী (আ.) ।[২১]

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠদের বক্তব্য ছিল এই যে, 'কুরাইশরা' খেলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী (আ.)- এর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির বিরোধী । তারপরও তাদের উচিত ছিল বিরোধীদেরকে সত্যের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করা এবং বিদ্রোহীদেরকে দমন করা । ঠিক যেমনটি যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের সাথে করা হয়েছিল । এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধও করা হয়েছিল । তবুও যাকাত আদায় থেকে তারা বিরত হয়নি । তাই কুরাইশদের বিরোধীতার ভয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে হাত গুটিয়ে সত্যকে হত্যা করা তাদের কখনও উচিত হয়নি । নির্বাচিত খেলাফতর্ক সম্মতি প্রদান থেকে যে কারণটি শীয়াদের বিরত রেখে ছিল, তা হচ্ছে এ ঘটনার অনাকাংখিত পরিণতি, যা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসত এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিত । বাস্তবিকই পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে ক্রমেই এ ধারণার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় । এর ফলে শীয়াদের এ সংক্রান্ত বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হতে থাকে । যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে শীয়ারা বাহ্যত হাতে গানা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যা বৃহত্তর জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল, তথাপি পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.) গোপনে ইসলামের শিক্ষাদান কর্মসূচী এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে নিরন্তন চেষ্টা চালিয়ে যান । অন্যদিকে এর পাশাপাশি ইসলামী শক্তির উন্নতি ও সংরক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে তারা শ্বাসক গোষ্ঠির সাথে প্রকাশ্যে বিরোধীতা থেকে বিরত থাকেন । এমন কি শীয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে সকল জিহাদেরও অংশ গ্রহণ করতেন এবং গণ- স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপও করতেন । স্বয়ং হযরত আলী (আ.) ইসলামের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পথ নির্দেশনা দিতেন ।[২২]

# নির্বাচিত খেলাফতের রাজনীতি ও শীয়াদের দৃষ্টিভঙ্গী

শীয়া মাযহাবের অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের ঐশী আইন বা শরীয়ত, যার উৎস পবিত্র কুরআন ও বিশ্বনবী (সা.)- এর সুন্নাত তা কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ও অপরিবর্তীত অবস্থায় এবং স্বীয় মর্যাদায় টিকে থাকবে ।[২৩] ইসলামী আইনসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যাপারে এতটকু টাল- বাহানা করার অধিকার ইসলামী সরকারের নেই । ইসলামী সরকারের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে পরামর্শ সভার পরামর্শ ও সমস্যামায়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী ইসলামী শরীয়তের (আইন) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ । কিন্তু রাসূল (সা.)- এর মৃত্যু পুর্ব অসুস্থ অবস্থার সময়ে সেই ঐতিহাসিক 'কাগজ কলম আনার ঘটনা' খলিফা নির্বাচন ও রাজনৈতিক বাইয়াত গ্রহণসহ ইত্যাদি ঘটনা তদানিন্তন খেলাফতের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে । এ ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যায় যে, নির্বাচিত খেলাফতের মূল ব্যক্তিবগ ও সমর্থকগণ পবিত্র কুরআনকে কেবল মাত্র একটি সংবিধান হিসাবে সংরক্ষণে বিশ্বাসী । কিন্তু রাসূল (সা.)- এর সুন্নাত ও আদর্শকে তারা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করত না । বরং তাদের ধারণা ছিল ইসলামী সরকার নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে রাসূল (সা.)- এর সুন্নাত বাস্তবায়ন থেকেও বিরত থাকতে পারে । তদানিন্তন খেলাফততন্ত্রের এ দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রমাণ পরবর্তীতে রাসূল (সা.)- এর বহু সাহাবীদের কথা ও কাজে পরিলক্ষিত হয় (সাহাবীরা মুজতাহিদ । ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সত্যে উপনীত হন, পুরস্কৃত হবেন । আর যদি ভুল করেন, ক্ষমা প্রাপ্ত হবেন) । এর স্পষ্ট উদাহরণ জনৈক সাহাবী ও সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের ঐতিহাসিক ঘটনায় পাওয়া যায় । কোন এক রাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ জনাব মালিক বিন নুওয়াইরা নামক জনৈক গণ্যমান্য মুসলমানের বাড়িতে আকস্মিকভাবে অতিথি হন । খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা করেন এবং তাঁর কর্তিত মাথা চুলার আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন ।

অতঃপর ঐ রাতেই নিহতের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন । কিন্তু, সামরিক বাহিনীর জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদের মত সুযোগ্য সেনাপতির প্রয়োজন । এই স্বার্থে খলিফা এ ধরণের জঘণ্য ও নৃশংস

হত্যা কান্ডের বিচার ও প্রয়োজনীয় শাস্তি, খালিদ বিন ওয়ালিদের উপর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকলেন ।[২৪] একইভাবে খলিফার প্রশাসন মহানবী (সা.)- এর আত্মীয়- স্বজন ও পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) প্রতি নিয়মিত প্রদত্ত খুমস্ বন্ধ করে দেন ।[২৫] রাসূল (সা.)- এর হাদীস লেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় । যদি কখনও লিপিবদ্ধ কোন হাদীস কোথাও কারো কাছে পাওয়া যেত তাহলে সাথে সাথেই তা বাজেয়াপ্ত করা হত এবং পুড়িয়ে ফেলা হত ।[২৬] হাদীস লিপিবদ্ধকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সমগ্র 'খুলাফায়ে রাশেদীনের' যুগে অব্যাহত ছিল । আর তা উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন আমলে (হিঃ ৯৯ - ১০২ হিঃ) পর্যন্ত বলবৎ থাকে ।[২৭] দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময় (হিঃ ১৩ - ২৫ হিঃ) খেলাফত প্রশাসনের এ রাজনৈতিক পদক্ষেপটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এ সময় দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইসলামী শরীয়তের বেশ কিছু আইনের পরিবর্তন সাধান করেন । যেমন : 'হজ্জে তামাত্তু' 'মুতা বিবাহ্ এবং আযান' এ 'হাইয়্যা আলা খায়রিল আমাল' ব্যাক্যটির ব্যাবহার তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ।[২৮] তিনিই একই বৈঠকে তিন তালাকসহ এজাতীয় আরো অন্য নীতির প্রচলন শুরু করেন ।[২৯]

দ্বিতীয় খলিফা ওমর সর্বপ্রথম বাইতুল মালের অর্থ জনগণের মধ্যে বন্টনের সময় বৈষম্যেরে সৃষ্টি করেন ।[৩০] এ বিষয়টি পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে আশ্চর্যজনক শ্রেণীবৈষম্য এবং ভয়ংকর ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায় । দ্বিতীয় খলিফা ওমরের খেলাফতের সময়েই মুয়াবিয়া সিরিয়ায় রাজপ্রাসাদে বসে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন । দ্বিতীয় খলিফা ওমর তাকে আরবের 'কাসূরা' ( জনৈক বিখ্যাত পারস্য সম্রাটের উপাধি) বা বাদশাহ্ বলে ডাকতেন । তিনি কখনো মুয়াবিয়ার এধরণের কাজের প্রতিবাদ করেননি ।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর হিজরী ২৩ সনে জনৈক পারসিক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন । মৃত্যুর পূর্বে খলিফা ওমরের নির্দেশে ৬ সদস্য বিশিষ্ট খলিফা নির্বাচন কমিটি গঠিত হয় । এ কমিটির সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন ও তার শাসনভার গ্রহণ করেন । তৃতীয় খলিফা ওসমান তার শাসন আমলে উমাইয়া বংশীয় আপন আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপক হারে প্রশাসনে নিযুক্ত করার মাধ্যমে উমাইয়্যাদেরকে জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সহায়তা করেন ।

হিজাজ (বর্তমান সৌদি আরব) ইরাক ও মিশরসহ অন্যান্য ইসলামী প্রদেশগুলোর শাসনভার তিনি উমাইয়া বংশের লোকজনের উপর অর্পন করেন ।[৩১] এরা সবাই প্রকাশ্যভাবে অন্যায়-অত্যাচার, দূর্নীতি, ইসলামী নীতিমালা লংঘন ও পাপাচার পচলনের মাধ্যমে ইসলামী প্রশাসনে চরম অরাজকতার সূত্রপাত ঘটায় ।[৩২] তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিক থেকে জনগণের অভিযোগ ওসমানের কাছে পৌছতে লাগল । কিন্তু খলিফা ওসমান উমাইয়া বংশীয় ক্রীতদাসী এবং বিশেষ করে জনাব মারওয়ান বিন হাকামের (খলিফার চাচাতো ভাই এবং প্রধানমন্ত্রী) দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন । ফলে জনগণের অভিযোগকে তিনি কখনই গুরুত্ব দিতেন না ।

শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তিনি অভিযোগকারীদের শায়েস্তা করার নির্দেশ জারী করতেন ।[৩৩] অবশেষে হিজরী ৩৫ সনে জনগণ খলিফার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে । খলিফা ওসমানের বাড়ী বেশ ক'দিন ঘেরাও রাখা হয় এবং কিছু সংঘর্ষের পর তারা খলিফাকে হত্যা করে । সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের লোক এবং তৃতীয় খলিফা ওসমানের ঘনিষ্ট আত্মীয় । ওসমান তার শাসন আমলে সিরিয়ার প্রশাসনকে অধিক শক্তিশালী করেন । প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের গুরুভার ক্রমেই সিরিয়ায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে । যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোগত কেন্দ্র ছিল মদীনা । তবে তা একটি বাহ্যিকরূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ।[৩৪]

ইসলামের প্রথম খলিফা সাহাবীদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন । দ্বিতীয় খলিফা, প্রথম খলিফার ওসিয়াত নামার মাধ্যমে মনোনয়ন লাভ করে ক্ষমতায় আসেন । আর তৃতীয় খলিফা, দ্বিতীয় খলিফার দ্বারা মনোনিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে মনোনীত হন । ঐ কমিটির নির্বাচনের নীতিমালাও পূর্ব থেকেই দ্বিতীয় খলিফার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল । যাই হোক, ইসলামের প্রথম তিন খলিফা, যাদের শাসনকাল প্রায় পচিশঁ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত রাজনীতির স্বরূপ এটাই ছিল যে, তারা নিজস্ব 'ইজতিহাদু'( গবেষণা) অনুসারে প্রয়োজনীয় যুগপোযাগী সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সমাজে তা প্রয়োগ করবেন । ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রসারের ব্যাপারে তাদের নীতি ছিল এই যে, পবিত্র

কুরআন, তাফসীর (ব্যাখা) বা গবেষণা ছাড়াই পঠিত হবে। আর রাসূল (সা.) এর হাদীস অলিখিত ভাবে প্রচারিত হবে এবং অবশ্যই তা মৌখিক বর্ণনা ও শবণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনের অনুলিপি তৈরী করণ অত্যন্ত সীমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। আর হাদীস লিখন ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৩৫] হিজরী ১২ সনে সংঘটিত 'ইয়ামামা'র যুদ্ধ পর্যন্ত এ অবস্থা বলবৎ ছিল। ঐ যুদ্ধে বেশ কিছু সাহাবী নিহত হন যারা কুরআনের কারী ও হাফেজ ছিলেন। তখন দ্বিতীয় খলিফা ওমর, প্রথম খলিফা আবুব বকরকে সমগ্র কুরআনকে গ্রন্থবদ্ধ আকারে এক যায়গায় সংগৃহীত করার জন্য প্রস্তাব দেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব বলেন, ভবিষ্যতে যদি এ ভাবে কুরআনের আরও হাফিজ নিহত হন, তাহলে অদুর ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আর কুরআনের অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং কুরআনের সব আয়াতগুলো এক যায়গায় সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।[৩৬]

এ সিদ্ধান্ত শুধু কুরআনের ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়। অথচ রাসূল (সা.)- এর হাদীস, কুরআনের পরই যার অবস্থান, তাও একই বিপদের সম্মুখীন ছিল। কারণ, রাসূল (সা.)- এর হাদিসের ভাবার্থ মুলক বর্ণনা তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংকোচন, বিস্মৃতি, বিকৃতি ও জালকৃত হওয়ার হাত থেকে আদৌ নিরাপদ ছিল না। কিন্তু রাসূল (সা.)- এর হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমন কি যেখানেই লিপিবদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া যেত, সাথে সাথেই তা পুড়িয়ে ফেলা হত। পরিণতিতে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছালো যে, খুব অল্প দিনের মধ্যেই নামায, রোযা.... ইত্যাদির মত ইসলামের অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারেও পরস্পর বিরোধী মতামতের সৃষ্টি হল। একইভাবে এ যুগে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারেও আদৌ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ, পবিত্র কুরআনে ও হযরত রাসূল (সা.)- এর হাদীসে, জ্ঞান অর্জন ও তার প্রসারের ব্যাপারে যে প্রশংসা, অনুপ্রেরণা ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, খেলাফতের যুগে এসে তা সম্পূর্ণ নিস্ক্রীয় ও স্থবির হয়ে পড়ে। অধিকাংশ মুসলমানই তখন একের পর এক রাজনৈতিক বিজয় নিয়ে মেতে ছিল। আর তখন তাদের যুদ্ধলদ্ধ গণিমতের সীমাহীন সম্পদের স্রোত সমগ্র আরব সাম্রাজ্যের

দিকে ধাবিত হয়েছিল । যার ফলে নবীবংশের পবিত্র জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়নি । ঐ পবিত্র জ্ঞানধারার উৎসমুখ ছিলেন হযরত ইমাম আলী (আ.) তার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, হযরত আলী (আ.)- ই ইসলাম এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি । এমন কি কুরআন সংগ্রহের সময়ও খেলাফত প্রশাসন হযরত আলী (আ.)- কে সে ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়নি । শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তার নামটাও তারা উচ্চারণ করেনি সেদিন । অথচ খেলাফত প্রশাসন এটা ভাল করেই জানতেন যে, রাসূল (সা.)- এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (আ.) বহুদিন পর্যন্ত নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন । আর ঐ সময়ে তিনি কুরআনের সমগ্র লিপিসমূহকে একর্তিতে ভাবে সংগ্রহ করে ছিলেন ।[৩৭] খেলাফত প্রশাসনের এমনই ধরণের আরও অনেক কর্মকান্ড হযরত আলী (আ.) এর ভক্ত ও অনুসারীদের বিশাসকে অধিকতর সূদৃঢ় এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক হতে সাহায্য করেছিল । এর ফলে দিনের পর দিন তাদের কার্যক্রমের গতিও বহু গুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে । ওদিকে ব্যাপক ভাবে গণ- প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকায় হযরত আলী (আ.) ব্যক্তিগত পর্যায়ে লোক তৈরীর কাজ চালিয়ে যান । এই দীর্ঘ ২৫ বছরের মধ্যে হযরত আলী (আ.)- এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারজন শিষ্য ও আপ্রাণ সহযোগীর তিনজনই পরলোক গমন করেন । যারা ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত আবুযার গিফারী (রা.) এবং হযরতুমিকদাদ কিন্তু ইতিমধ্যেই আরও বহু সংখ্যক সাহাবী এবং হেজাজ (বর্তমান সৌদি আরব), ইয়ামান, ইরাক সহ বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য তাবেয়ীন (যারা রাসূলের সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ করেছেন) হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর অনুসারীতে পরিণত হন । যার ফলে তৃতীয় খলিফা নিহত হওয়ার পর প্রশাসন রাজ্যের চতুর্দিক থেকে গণসমর্থনের জোয়ার হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর দিকে ধাবিত হয় । সকলে গণভাবে হযরত আলী (আ.)- এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিনি খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন ।

# হযরত আলী) আ- (.এর খেলাফত ও তার প্রশাসনিক পদ্ধতি

হিজরী ৩৫ সনের শেষ ভাগে হজরত আলী (আ.)- এর খেলাফত কাল শুরু হয় । প্রায় ৪ বছর ৫ মাস পর্যন্ত এই খেলাফত স্থায়ী ছিল । হযরত আলী (আ.) খেলাফত পরিচালনার ব্যাপারে হযরত রাসূল (সা.)- এর নীতির অনুসরণ করেন ।[৩৮] তার পূর্ববতী খলিফাদের যুগে যেসব (ইসলামী নীতি মালার) পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল, তিনি সেগুলোকে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন । খেলাফত প্রশাসনে নিযুক্ত অযোগ্য লোকদের তিনি দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন ।[৩৯] তার এসব পদক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল, যা পরবর্তিতে প্রচুর সমস্যারও সৃষ্টি করেছে । হযরত ইমাম আলী (আ.) খেলাফতের প্রথম দিনে জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেন : হে জনগণ! জেনে রেখো নবুয়তের যুগে যে সমস্যায় তোমরা ভুগেছিলে আজ আবার সেই সমস্যাতেই জড়িয়ে পড়লে । তোমাদের মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে । যে সকল মহৎ ব্যক্তিরা এতদিন পিছিয়ে ছিলেন তারা এখন সামনের সারিতে চলে আসবেন । একইভাবে যেসব অযোগ্য লোক এতদিন সামনের সারিতে অবস্থান নিয়েছিল আজ তারা পিছনে চলে যাবে । (সত্য ও মিথ্যা বিদ্যমান এবং এতদুভয়ের প্রত্যেকেরই অনুসারীও রয়েছে । তবে সবারই উচিত সত্যকে অনুসরণ করা) মিথ্যার পরিমাণ যদি অধিকও হয়, সেটা এমন নতুন কিছু নয় । সত্যের পরিমাণ যদি কমও হয়, হোক না! অনেক সময় কমওতো সবার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে থাকে । আর উন্নতির আশাও এতের রয়েছে । তবে এমনটি খুব কমই দেখা যায় যে, যা একবার মানুষের হাতছাড়া হয়ে গেছে তা পনুরায় তার কাছে ফিরে এসেছে ।[৪০]

এ ভাবে হযরত আলী (আ.) তার বৈপ্লবিক প্রশাসনকে অব্যাহত রাখেন । কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলন সমূহের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে, এই আন্দোলনের ফলে যাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তারা এ ধারার বিরোধী হয়ে ওঠে । আমরা দেখতে পাই হযরত আলী (আ.)- এর খেলাফতের বৈপ্লবিক নীতি বহু স্বার্থন্বেষী মহলকে আঘাত করেছিল । তাই শুরুতেই সারা দেশের যত্রতত্র থেকে আলী (আ.)- এর খেলাফতের বিরোধী সূর বেজে ওঠে । বিরোধীরা তৃতীয় খলিফার রক্তের প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র মুলক শ্লোগানের ধুয়া তুলে বেশ কিছু রক্তাক্ত যুদ্ধের অবতারণা করে । এ

জাতীয় গৃহযুদ্ধ হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সমগ্র খেলাফতকালব্যাপী অব্যাহত ছিল । শীয়াদের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার ছাড়া এসব যুদ্ধ সূচনাকারীদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না ।

তৃতীয় খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শ্লোগান ছিল সম্পূর্ণরূপে গণপ্রতারণামূলক একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার । এমনকি কোন ভুল বোঝা বুঝির এখানে অবকাশ নেই ।[৪১]

হযরত আলী (আ.)- এর যুগে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ যা ‘জংগে জামাল’ নামে পরিচিত, তা শুধুমাত্র শ্রেণী বৈষম্যগত মত পার্থক্যের জঞ্জাল বৈ আর কিছুই ছিল না । ঐ মতপার্থক্য দ্বিতীয় খলিফার দ্বারা ‘বাইতুল মালের’ অর্থ বন্টনে শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টির ফলে উদ্ভুত হয়েছিল । হযরত ইমাম আলী (আ.) খলিফা হওয়ার পর ঐ সমস্যার সমাধান ঘটান এবং তিনি জনগণের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ‘বাইতুল মালের’ অর্থের সুষম বন্টন করেন ।[৪২] আর এটাই ছিল হযরত রাসূল (সা.)- এর জীবনাদর্শ । কিন্তু হযরত আলী (আ.)- এর এ পদক্ষেপ তালহা ও যুবাইরকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত করেছিল । যার ফলে তারা হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরোধীতা করতে শুরু করেন । তারা যিয়ারতের নাম করে মদীনা ছেড়ে মক্কায় গেলেন । উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়শা তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন । তারা এটা ভাল করেই জানতেন যে, ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে উম্মুল মুমেনীন আয়শার সম্পর্কের টানা পোড়ন চলছে । এ অবস্থাকে তারা আপন স্বার্থে কাজে লাগান এবং নবীপত্নী আয়েশাকে খুব সহজেই হযরত আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে নিজ পক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন । অতঃপর তৃতীয় খলিফার হত্যার বিচারের দাবীর শ্লোগানে আন্দোলন গড়ে তোলেন । অবশেষে ‘জংগে জামাল’ নামক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করেন ।[৪৩] অথচ এই প্রসিদ্ধ সাহাবীদ্বয় তালহা ও যুবায়ের বিপ্লবীদের দ্বারা ওসমানের বাড়ী ঘেরাওকালীন মুহূর্তে মদীনাতেই ছিলেন । কিন্তু তৃতীয় খলিফা ওসমানকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে এতটুকু সাহায্যও তারা করেননি ।[৪৪] এমনকি খলিফা ওসমান নিহত হওয়ার পর মুহাজিরদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম তিনিই হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর হাতে ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করেন ।[৪৫] ওদিকে নবীপত্নী আয়শাও স্বয়ং ওসমানের বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । তিনি

ওসমানকে হত্যার ব্যাপারে সব সময়ই বিরোধীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ।[৪৬] নবীপত্নী আয়শা ওসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ শোনা মাত্রই তার প্রতি অপমান সূচক শব্দ উচ্চারণ করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন । তৃতীয় খলিফাকে হত্যার ব্যাপারে মূলত রাসূল (সা.)- এর সাহাবীরাই জড়িত ছিলেন । তারা মদীনার বাইরে বিভিন্ন স্থানে চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন ।

হযরত আলী (আ.)- এর খেলাফতের যুগে দ্বিতীয় যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, তা'হচ্ছে 'সিফফিনের যুদ্ধ । দীর্ঘ দেড়টি বছর এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে । এ যুদ্ধটি ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফত প্রসাশন দখলের জন্যে মুয়াবিয়ার চরম লালসার ফসল । তৃতীয় খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ছলনাময়ী শ্লোগানের ছত্রছায়ায় তিনি এ যুদ্ধের অবতারণা করেন । এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ্যেরও বেশী লোক অন্যায়ভাবে নিহত হন । এ যুদ্ধে মুয়াবিয়াই ছিলেন প্রথম আক্রমনকারী । এটা কোন আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধ ছিল না । বরং এটা ছিল মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে একটি আক্রমনাত্মক যুদ্ধ । কারণ, প্রতিশোধ গ্রহণ মূলক যুদ্ধ কখনই আত্মরক্ষামূলক হতে পারে না । এ যুদ্ধের শ্লোগান ছিল তৃতীয় খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ । অথচ তৃতীয় খলিফা তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে দেশের রাজনৈতিক অরাজকতা ও বিশৃংখলা দমনে মুয়াবিয়ার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান । মুয়াবিয়াও তার সেনাবাহিনীসহ সিরিয়া থেকে মদিনার দিকে অগ্রসর হন । কিন্তু মুয়াবিয়া উদ্দেশ্য মূলক ভাবে পথিমধ্যে এত বেশী দেরী করেন যে, ততদিনে তৃতীয় খলিফা বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন । এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই মুয়াবিয়া তার বাহিনী সহ সিরিয়ায় ফিরে যান । এর পর সিরিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি তৃতীয় খলিফার হত্যার বিচারের দাবীতে বিদ্রোহ শুরু করেন ।[৪৭] 'সিফফিন' যুদ্ধের পর 'নাহরাওয়ান' যুদ্ধ সংঘটিত হয় । রাসূল (সা.)- এর বেশ কিছু সাহাবীও এ যুদ্ধে জড়িত ছিলেন । একদল লোক যারা 'সিফফিনের' যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারাই পরবর্তিতে আবার মুয়াবিয়ার প্ররাচণায় হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে । তারা তদানিন্তন ইসলামী খেলাফত বা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে থাকে । তারা হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর অনুসারী বা সমর্থকদের

সন্ধান পাওয়া মাত্রই তাদেরকে হত্যা করত । এমন কি গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে গর্ভস্থ সন্তানকে বের করে তাদের মাথা কেটে হত্যা করত ।[৪৮]

সিফফিন যুদ্ধের পর মুয়াবিয়ার প্ররাচণায় সংঘটিত এ- বিদ্রোহও হযরত ইমাম আলী (আ.) দমন করেন । কিন্তু এর কিছুদিন পরই একদিন কুফা শহরের এক মসজিদে নামাযরত অবস্থায় ঐসব 'খাওয়ারেজদের' হাতেই তিনি শাহাদৎ বরণ করেন ।

## ইমাম আলী (আ.)- এর পাঁচ বছরের খেলাফতের ফসল

হযরত আলী (আ.) তার ৪ বছর ৯ মাসের শাসন আমলে খেলাফত প্রশাসনের স্তুপীকৃত অরাজকতা ও বিশৃংখলাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যদিও সমর্থ হননি তবুও এ ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল ।

১ । নিজের অনুসৃত ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিক জীবনাদর্শের মাধ্যমে জনগণকে এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র ও আকর্ষনীয় জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করেন । মুয়াবিয়ার চোখ ধাধানো রাজকীয় জীবন যাপন পদ্ধতির সমান্তরাল তিনি জনগণের মাঝে অতি দরিদতেম জীবন যাপন করতেন । তিনি কখনো নিজের বন্ধু- বান্ধব, পরিবার বা আত্মীয় স্বজনকে অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেননি । অথবা ধনীকে দরিদ্রের উপর বা সক্ষমকে অক্ষমের উপর কখনো তিনি অগ্রাধিকার দেননি ।

২ । পর্বতসম সমস্যাকীর্ণ দিনগুলো অতিবাহিত করা সত্ত্বেও জনগণের মাঝে তিনি ইসলামের সত্যিকারের অমূল্য জ্ঞান সম্ভার বা সম্পদ রেখে গেছেন ।

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরোধীরা বলত, ইমাম আলী (আ.) একজন মহাবীর ছিলেন । তিনি কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না । কেননা, তিনি বিরোধীদের সাথে সাময়িক বন্ধুত্ব স্থাপন ও তেলমর্দনের মাধ্যমে তিনি পরিস্থিত্রিক শান্ত করে, নিজের খেলাফতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে পারতেন । অতঃপর সময় বুঝে তাদের দমন করতে পারতেন ।

কিন্তু বিরোধীরা একথাটি ভুলে গেছে যে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফত ছিল এক বৈপ্লবিক আন্দোলন । আর যে কোন বৈপ্লবিক আন্দোলনকেই সব ধরণের তৈল মর্দন ও মেকী আচরণ নীতিগুলো বর্জন করতে হয় । ঠিক একই পরিস্থিতি মহানবী (সা.)- এর নবুয়ত প্রাপ্তির যুগেও পরিলক্ষিত হয় । মহানবী (সা.)- কে মক্কার কাফের ও মুশরিকরা বহুবার আপোষের প্রস্তা দিয়েছিল । তাদের প্রস্তাব ছিল, মহানবী (সা.) যেন তাদের খোদাগুলোর ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিরোধীতা না করেন, তাহলে তারাও মহানবী (সা.)- এর ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কোন বাধা

দেবে না । কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের এই প্রস্তাব আদৌ মেনে নেননি । অথচ নবুয়তের চরম দূযোগপূর্ণ সেই দিনগুলোতে তৈলমদন ও আপোষমুখী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারতেন । অতঃপর সময় সুযোগ মত শত্রুদের দমন করতে পারতেন । কিন্তু সত্যিকারের ইসলাম প্রচার নীতি কখনই একটি সত্যকে হত্যার মাধ্যমে অন্য একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা বা একটি মিথ্যাকে দিয়ে অন্য একটি মিথ্যাকে অপসারণ করার অনুমতি দেয় না । এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখযোগ্য ।[৪৯]

আবার অন্য দিকে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর শত্রুরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে যে কোন ধরণের অন্যায় অপরাধ এবং ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিলংঘনের ব্যাপারেও কুন্ঠিত হয়নি । শুধু তাই নয়, নিজেদের চারিত্রিক কলঙ্ক গুলোকে 'সাহাবী' বা 'মুজতাহীদ' ( ইসলামী গবেষক) উপাধি দিয়ে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন । অথচ হযরত ইমাম আলী (আ.) সব সময়ই ইসলামী নীতিমালার পুঙ্খানু পুঙ্খ অনুসরণের ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধ পরিকর ।

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর দ্বারা বর্ণিত জ্ঞান- বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রায় এগারো হাজার অমূল্য সংক্ষিপ্ত হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে ।[৫০] তিনি ইসলামের সুগভীর জ্ঞানরাজীকে অত্যন্ত শুদ্ধ ও উন্নত অথচ প্রাঞ্জল ভাষার বক্তৃতামালায়[৫১] বর্ণনা করেছেন ।[৫২] তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ভাষার ব্যাকারণ ও সাহিত্যের মূলনীতি রচনা করেন । তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের উচ্চতর দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করেন এবং উন্মুক্ত যুক্তি- বিন্যাস ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামকে ব্যাখার নীতি প্রচলন করেন । সে যুগের দার্শনিকরা তখনও যেসব দার্শনিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন, তিনি সেসব সমস্যার সমাধান দিয়ে ছিলেন । এমন কি এ ব্যাপারে তিনি এতবেশী গুরুত্বারোপ করতেন যে, যুদ্ধের ভয়াবহ ডামাডোলের মাঝেও[৫৩] সুযোগ মত ঐসব জ্ঞানগর্ভ মুলক পর্যালোচনার প্রয়াস পেতেন ।

৩ । হযরত ইমাম আলী (আ.) ব্যাপক সংখ্যক লোককে ইসলামী পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলেন ।[৫৪] ইমাম আলী (আ.)- এর কাছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঐসব জ্ঞানী- পণ্ডিতদের মাঝে হযরত ওয়ায়েস কারানী (রা.), হযরত কুমায়েল বিন যিয়াদ (রা.), হযরত মেইসাম তাম্মার

(রা.) ও রশীদ হাজারীর (রা.) মত অসংখ্য সাধুপুরুষও ছিলেন । যারা ইতিহাসে ইসলামী ইরফানের (আধ্যাত্মবাদ) উৎস হিসেবে পরিচিত । ইমাম আলী (আ.)- এর শিষ্যদের মধ্যে আবার অনেকেই ইসলামী ফিকাহ (আইন শাস্ত্র), কালাম (মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত শাস্ত্র), তাফসীর, কিরাআত (কুরআনের শুদ্ধপঠন শাস্ত্র) ও অন্যান্য বিষয়ের মুল উৎস হিসেবে পরিচিত ।

## মুয়াবিয়ার কাছে খেলাফত হস্তান্তর ও রাজতন্ত্রের উত্থান

আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর শাহাদতের পর তার 'ওসিয়ত' ( উইল) এবং জনগণের 'বাইয়াতের' ( আনুগত্য জ্ঞাপন) মাধ্যমে হযরত ইমাম হাসান (আ.) পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন । বারজন ইমামের অনুসারী শীয়াদের মতে হযরত ইমাম হাসান (আ.) ছিলেন দ্বিতীয় ইমাম ।

ওদিকে মুয়াবিয়াও এ ব্যাপারে চুপ করে বসে থাকেননি । মুয়াবিয়া, হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর বিরুদ্ধে তদানিন্তন খেলাফতের রাজধানী ইরাকের দিকে সেনা অভিযান পরিচালনা করলেন । বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র ও ইমাম হাসান (আ.)- এর সমর্থকে ও সেনাপতিদের বিপুল পরিমাণ ঘষু প্রদানের মাধ্যমে মুয়াবিয়া তাদেরকে দূর্নীতির সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন । এর ফলে হযরত ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তিতে বাধ্য হন । চুক্তি অনুসারে খেলাফতের ক্ষমতা মুয়াবিয়ার কাছে এই শর্তে হস্তান্তর করা হয় যে, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর খেলাফত পুনরায় ইমাম হাসান (আ.)- এর কাছে হস্তান্তর করা হবে । আর তারা ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হাসান (আ.)- এর অনুসারীদেরকে উৎপীড়ন করবেন না । এভাবেই খেলাফতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মুয়াবিয়ার কাছে হস্তান্তরিত হয় ।[৫৫]

হিজরী ৪০ সনে মুয়াবিয়া খেলাফতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা লাভ করার পর পরই ইরাকে এসে জনগণের উদ্দেশ্যেএকটি বক্তৃতা দেয় । ঐ বক্তৃতায় তিনি জনগণের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেনঃ আমি নামায রোযার জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি । বরং আমি তোমাদের শাসন ক্ষমতা দখল করার জন্যে যুদ্ধ করেছি এবং শেষপর্যন্ত আমি তা লাভও করেছি !![৫৬] মুয়াবিয়া আরো ব্যক্ত করে : হাসানের সাথে যে মর্মে আমি চুক্তি সাক্ষর করেছিলাম, তা আমি বাতিল বলে ঘোষণা করছি এবং ঐ চুক্তি আমি পদদলিত করলাম!![৫৭]

মুয়াবিয়া তার সেই বক্তব্যের মাধ্যমে ধর্ম থেকে রাজনীত্রিক পৃথক করার আভাস দেয় । উক্ত বক্তব্যে আরো ইঙ্গিত দেয় যে, ধর্মীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে না

এবং রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন । আর এটা খুবই স্পষ্ট যে, এ জাতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি আদৌ কোন ইসলামী খেলাফত বা রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী প্রশাসন ছিল না । বরং ওটা (মুয়াবিয়া প্রশাসন) ছিল সম্পূর্ণ রাজতান্ত্রিক প্রশাসন । এ জন্যে যখন কেউ তার (মুয়াবিয়া) সাক্ষাতে আসতো তখন ঐ ব্যক্তিকে (মুয়াবিয়াকে) বাদশাহী পদ্ধতিতে সালাম দিতে হত ।[৫৮] এমন কি স্বয়ং মুয়াবিয়াও বিশেষ বৈঠকগুলোতে নিজেকে রাজা বা বাদশাহ্ হিসেবে পরিচিত করতেন ।[৫৯] অবশ্য জনসমক্ষে তিনি নিজেকে ইসলামী খলিফা উপাধিতে ভূষিত করতেন । অবশ্য যেসব প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি কেবল স্বেচ্ছাচারীতার উপর প্রতিষ্ঠিত সেসকল প্রশাসন ব্যবস্থা সাধারণত রাজতন্ত্রের জনক । আর শেষপর্যন্ত মুয়াবিয়াও তার হৃদয়ে লালিত আকাংখা বাস্তবায়িত করেন ।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার যুবক পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার উত্তরাধিকার অর্পণ করেন ।[৬০] চারিত্রিক দিক থেকে ইয়াযিদ ছিল লম্পট ও অনৈসলামী ব্যক্তিত্বের আধিকারী । এই ইয়াযিদই ইতিহাসে অনেক লজ্জাষ্কর ঘটনার সূত্রপাত করে । মুয়াবিয়া তার পূর্ববতী বক্তব্যে ইঙ্গিত করেন যে, কোনক্রমেই তিনি খেলাফতের ক্ষমতা ইমাম হাসান (আ.)- এর কাছে হস্তান্তরিত হতে দিবেন না । কারণ, তার পরবর্তী খেলাফতের ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তা পোষণ করতেন । যে চিন্তার ফলশ্রুতিতে তিনি হযরত ইমাম হাসান (আ.)- কে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন ।[৬১] এভাবেই তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াযিদের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা লাভের পথকে কন্টকমুক্ত করেন । ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণার মাধ্যমে মুয়াবিয়া সবাইকে এটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে পবিত্র আহলে বাইতের (নবীবংশ) অনুসারী শীয়াদেরকে তিনি কখনও শান্তি ও নিরাপদে বাস করতে দেবেন না যে তারা (শীয়া) তাদের নিজস্ব ধর্মীয় কর্মকান্ড পূর্বের মতই চালিয়ে যাবে । আর এ বিষয়টি তিনি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করেন ।[৬২] তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দেন : 'যে ব্যক্তি পবিত্র আহলে বাইতের ফযিলত বা গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণনা করবে, তার জান- মাল বা সম্মানের নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকবে না' ।[৬৩] এর পাশাপাশি আরো ঘোষণা দেন, 'যে ব্যক্তি কোন সাহাবী বা খলিফার মহত্ব ও পদ মর্যাদার

ব্যাপারে কোন হাদীস বর্ণনা করবে, তাকে বিপলু ভাবে পুরস্কৃত করা হবে' । এ ঘোষণার পরিণতিতে উক্ত বিষয়ের উপর অসংখ্য বানোয়াট ও জাল হাদীস সৃষ্টি হয় ।[৬৪] মুয়াবিয়া আরো ঘোষণা দেয় যে, রাষ্ট্রের সকল মসজিদের মিম্বারগুলোতে বক্তারা যেন নিয়মিত ভাবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে গালি দেয় ও কুৎসা রটনা করে । (এই ঘোষণার বাস্তবায়ন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের {হিঃ - ৯৯- হিঃ- ১০১} পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল) । মুয়াবিয়ার সহকারীদের মধ্যে রাসূল (সা.)- এর বেশ কিছু সাহাবীও ছিলেন । মুয়াবিয়া তার ঐসব সাহাবী ও সহকারীদের সহযোগিতায় হযরত আলী (আ.)- এর অনুসারী অসংখ্য শীয়াকে হত্যা করে । এমন কি এসব নিহতদের অনেকের কর্তিত মস্তক বিভিন্ন শহরে গণপ্রদর্শনের জন্যে প্রদক্ষিন করানো হত । সর্বত্র শীয়াদেরকে হযরত আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বা অকথ্য ভাষা ব্যাবহার করতে বাধ্য করা হত । আর যে কেউ এ আদেশ লংঘন করত, তাকেই হত্যা করা হত ।[৬৫]

## শীয়াদের দূর্যোগপূর্ণ ও কঠিনতম দিনগুলো

মুয়াবিয়ার দীর্ঘ বিশ বছরের শাসনকালই শীয়াদের ইতিহাসের দূর্যোগপূর্ণ ও কঠিনতম দিন ছিল । ঐ সময় নিরাপত্তা বলতে শীয়াদের কিছুই ছিল না । শীয়াদের অধিকাংশই ছিল সর্বজন পরিচিত ও জনসমক্ষে চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব । শীয়াদের দু'জন ইমাম [ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.)] স্বয়ং মুয়াবিয়ার শাসনামলে জীবন যাপন করেছেন । ইসলামী রাষ্ট্রে এহেন অরাজক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সামান্যতম সুযোগও তাদের ছিল না । এমন কি তৃতীয় ইমাম [হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)], যিনি ইয়াযিদের শাসন আমলের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে তার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন, যার পরিণতিতে তিনি স্বপরিবারে শাহাদত বরণ করেন । কিন্তু মুয়াবিয়ার শ্বাসনের প্রথম দশ বছর জীবন- যাপনকালীন সময়ে এ (বিদ্রোহ) সুযোগটিও পাননি । রাসূল (সা.)- এর বিভিন্ন সাহাবী, বিশেষ করে মুয়াবিয়া ও তার সহকর্মীরা ইসলামী রাষ্ট্রে

অন্যায়ভাবে হত্যা ও নির্যাতনসহ যে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে ছিলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশই ঐসব অপকর্মের যুক্তিযুক্ত ব্যাখা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন । এ ব্যাপারে তাদের প্রধান যুক্তি হল, তারা ছিলেন রাসূল (সা.)- এর সাহাবী । আর সাহাবীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)- এর যেসব হাদীস আমাদের কাছে পৌছেছে, সে অনুযায়ী সাহাবীরা মুজতাহিদ (ইসলামী গবেষক) তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমার যোগ্য । মহান আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট তাই তারা যে কোন ধরণের অন্যায়- অপরাধই করুক না কেন, সে ব্যাপারে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত! কিন্তু শীয়াদের দৃষ্টিতে এ যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ :

**প্রথমত :** মহানবী (সা.) সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করেছেন । এক দল লোককে নিজ বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে ঐ পবিত্র লক্ষ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে বিলীন করে দিয়েছেন । এ জাতীয় যুক্তি আদৌ বুদ্ধিমত্তা প্রসূত ব্যাপার নয় যে, এত কষ্টের বিনিময়ে স্বীয় পবিত্র লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) জনগণ ও ইসলামের পবিত্র নীতিমালার ব্যাপারে তার সঙ্গী বা সাহাবীদেরকে যা ইচ্ছে করার মত পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে যাবেন? স্বীয় সহকর্মীদের দ্বারা সংঘটিত সত্যের অপ্রলাপ, ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ও অরাজতাকে তিনি ক্ষমা করবেন! এ জাতীয় কথার অর্থ হচ্ছে যাদের সহযোগীতায় তিনি সত্যের ভিত্তিরপস্তর স্থাপন করেছেন, তাদের দ্বারাই আবার তা ধ্বংস করবেন । এটা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয় ।

**দ্বিতীয়ত :** যেসব হাদীসে সাহাবীদের নিষ্কলুষতা ও অপরাধ মুলক শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপকে পরিশুদ্ধতার আবরণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্যে অগ্রিমভাবে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে পক্ষে ওগুলো সাহাবীদের দ্বারাই বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে এবং রাসূল (সা.)- এর সাথে তা সম্পর্কিত করা হয়েছে । অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বয়ং সাহাবীরাই একে অন্যের অন্যায়কে কখনও ক্ষমা করেননি । সাহাবীদের অনেকেই একে অনেকে হত্যা করেছেন, পরস্পরকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দিয়েছেন এবং একে অনেকে অপদস্থ করতেও ছাড়েননি । প্রতিপক্ষের সামান্যতম ভুলকেও তারা এতটকু ক্ষমার চোখেও দেখেননি । সুতরাং

সাহাবীদের কার্যকলাপের সাক্ষ্য অনুযায়ী- ও ঐসব হাদীসের অসত্যতা প্রমাণীত হয় । যদি ঐসব হাদীসকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে তার অর্থ অন্যকিছু হবে । আর তা অবশ্যই সাহাবীদের কলংকহীনতা বা আইনগত বৈধতা সংক্রান্ত নয় । যদি ধরে নেয়া যায় যে, মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআনে সাহাবীদের কোন কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, [৬৬] তাহলে সেটা তাদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপের প্রশংসারই প্রমাণ । এর অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে যা ইচ্ছে তাই করা বা আল্লাহর আদেশ বিরোধী কার্যকলাপও তারা করতে পারবেন ।

## উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

হিজরী ৬০ সনে মুয়াবিয়া মৃত্যু বরণ করে । মৃত্যুর পূর্বে সে জনগণের কাছ থেকে আপন পুত্র ইয়াযিদের খেলাফতের ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ করিয়ে নেয় । সে অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযিদ ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয় । ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ইয়াযিদ মোটেও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল না । এমন কি পিতার জীবদ্দশাতেও এই যুবক ইসলামী নীতিমালার প্রতি এতটুকু তোয়াক্কাও করত না । বিলাসিতা, উচ্ছৃংখলতা ও লাম্পট্য চারিতার্থ করা ছাড়া আর কোন কাজ তার ছিল না । তার তিন বছরের শাসন আমলে এত অধিক পরিমাণে জঘণ্য অপরাধ সে ঘটিয়েছিল যা ইসলামের ইতিহাসে বিরল । প্রাথমিক যুগে ইসলামকে অসংখ্য জঘণ্য সামাজিক দুর্নীতিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল । কিন্তু সেযুগে ইয়াযিদের দ্বারা সাধিত অপকর্মের কোন উদাহরণ ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না । ইয়াযিদ তার শাসন আমলের প্রথম বছরই রাসূল (সা.)- এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে সংগী- সাথী সহ স্বপরিবারে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে হত্যা করে । অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পরিবারের মহিলা, শিশু ও আহলে বাইতগণকে (নবীবংশ) শহীদদের কর্তিত মস্তক সহ গণ প্রদর্শনীর জন্যে বিভিন্ন শহরে প্রদক্ষিণ করানো হয় ।[৬৭] ইয়াযিদ তার খেলাফতের দ্বিতীয় বছর পবিত্র মদীনা নগরীতে গণহত্যা চালায় এবং তিন দিন পর্যন্ত সে তার সেনাবাহিনীকে ব্যাপক লুটতরাজ ও

গণধর্ষনের অনুমতি দিয়েছিল ।[৬৮] খেলাফতের তৃতীয় বছর ইয়াযিদ পবিত্র কাবাঘর ধ্বংস করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়![৬৯] ইয়াযিদের মৃত্যুর পর উমাইয়া বংশীয় মারওয়ান পরিবারের লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে । ইতিহাস অনুযায়ী উমাইয়া বংশীয় এগারো জন ব্যক্তি প্রায় সত্তর বছর যাবৎ খেলাফতের শাসন কার্য পরিচালনা করে । ইতিহাসের এ অধ্যায়ই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে সবচেয়ে দূর্যোগপূর্ণ ও তিক্ত । যেসময় ইসলামী সমাজের শাসন ক্ষমতায় একজন খলিফা নামধারী অত্যাচারী আরবীয় সম্রাট ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না । অবস্থা এক সময় এমন পর্যায়ে গিয়ে দাড়ালো যে, রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী ও দ্বীনের ধারক- বাহক হিসেবে খ্যাত খলিফা 'অলিদ বিন ইয়াযিদু' নির্ভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পবিত্র কাবা ঘরের ছাদে একটি ঘর তৈরী করবেন!! হজ্জের সময় তিনি সেখানে বিলাস যাপন করবেন!![৭০] খলিফা 'অলিদ বিন ইয়াযিদু' পবিত্র কুরআনকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে । তীর নিক্ষেপের সময় কুরআনকে লক্ষ্য করে কবিতার সুরে বিদ্রূপ করে বলে 'কেয়ামতের দিন যখন তোর খোদার কাছে উপস্থিত হবি, বলিস খলিফা আমাকে ছিন্ন- ভিন্ন করেছে!!"[৭১] শীয়ারা খেলাফতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্ব এ দু'টো বিষয়ে অধিকাংশ আহলে- সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে মৌলিকভাবে ভিন্ন মত পোষণ করত । তারা ইতিহাসের এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ে চরম কষ্ট ও তিক্ততাপূর্ণ দিন যাপন করেছেন । খেলাফত প্রসাশনের অবিচার, অত্যাচার ও অরাজকতা এবং নির্যাতিত আহলে বাইতের ইমামগণের তাকওয়া ও পবিত্রতা দিনের পর দিন তাদের ধর্মীয় বিশাসকে অধিকতর সুদৃঢ় করে তোলে । বিশেষ করে তৃতীয় ইমাম হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর শাহাদতের হৃদয় বিদ্যারক ঘটনা রাজধানীর বাইরে বিশেষ করে ইরাক, ইয়ামান ও ইরানে শীয়া মতাদর্শের সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহযোগিতা করে । উপরোক্ত বক্তব্যর প্রমাণ শীয়াদের পঞ্চম ইমামের (হযরত ইমাম বাকের (আ.)) যুগের ঘটনায় দেখতে পাওয়া যায় । হিজরী বর্ষের এক শতাব্দী তখনও পূর্ণ হয়নি । তৃতীয় ইমাম হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর শাহাদতের পর ৪০ বছরও তখন পূর্ণ হয়নি । ইতিমধ্যেই উমাইয়া খলিফার প্রশাসনে বিশৃংখলার সূত্রপাত ঘটে এবং এর ফলে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে । এ সুযোগে খেলাফত বা

রাজ্যের চতুর্দিক থেকে শীয়ারা বন্যার বেগে পঞ্চম ইমাম হযরত ইমাম বাকের (আ.)- এর দিকে ধাবিত হয় । তার চর্তুপার্শ্বে ভক্তদের ভীড় জমতে থাকে । তারা ইমাম বাকের (আ.)- এর কাছে হাদীস ও ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে ।[৭২] ইতিমধ্যে হিজরী প্রথম শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই প্রশাসনের ক'জন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ইরানের কোম শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাকে শীয়া প্রধান শহরে রূপান্তরিত করেন ।[৭৩] তথাপি শীয়াদেরকে সে যুগে তাদের ইমামগণের (আ.) নির্দেশে 'তাকিয়া' পালন করে অর্থাৎ নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস গোপন করে থাকতে হয়েছিল । এরপরও রাসূল (সা.)- এর বংশের সাইয়্যেদগণ ইতিহাসে বহু বার ক্ষমতাসীন শ্বাসক গোষ্ঠির অন্যায়- অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন । কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে । অবশেষে নিজেদের প্রাণও তারা এ পথে উৎসর্গ করেছেন । তদানিন্তন স্পর্ধাপূর্ণ শ্বাসকগোষ্ঠি তাদের পবিত্র দেহ পদদলিত করতেও কন্ঠা বোধ করেনি । যায়েদীপন্থী শীয়াদের নেতা জনাব যায়েদের মৃত্যু দেহকে কবর খুড়ে বের করে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয় । অতঃপর ঐ মৃত্যু দেহকে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ ঐ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয় । এরপর ঐ মৃত্যু দেহ ফাসিঁ কাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার ভষ্মীভূত ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়![৭৪] শীয়াদের বিশ্বাস অনুসারে তাদের চতুর্থ (হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) ও পঞ্চম (হযরত ইমাম বাকের (আ.) ইমামকেও উমাইয়া খলিফারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে ।[৭৫] দ্বিতীয় ইমাম হাসান (আ.) ও তৃতীয় ইমাম হুসাইন (আ.)- ও তাদের হাতেই শাহাদত বরণ করে ছিলেন । উমাইয়া খলিফাদের প্রকাশ্যে নীতিহীন কার্যকলাপ এতই জঘণ্য পর্যায়ে গিয়ে পৌছে ছিল যে আহলে- সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীরা যারা সাধারণত খলিফাদের আনুগত্যকে ফরয বলে বিশ্বাস করে, তারাও খলিফাদেরকে দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করতে বাধ্য হয় । ঐ দু'শ্রেণী হল 'খুলাফায়ে রাশেদীন' এবং 'খুলাফায়ে রাশেদীনদের পরবর্তী যুগ' । রাসূল (সা.)- এর মৃত্যু পরবর্তী ইসলামের প্রথম চার খলিফা [আবু বকর, ওমর, ওসমান ও হযরত আলী (আ.) ] প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । আর মুয়াবিয়া থেকে শুরু করে বাকী সব খলিফাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । শাসন ক্ষমতায় থাকা কালীন উমাইয়া খলিফা তাদের নিপীড়ন

মুলক নীতির কারণে জনগণের চরম ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল । এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন । নিহত হবার পর তার দু'পুত্র সহ খলিফা পরিবারের বেশ কিছু সদস্য রাজ প্রাসাদ থেকে পলায়ন করে । কিন্তু পালানোর পর যেখানেই তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছে ব্যর্থ হয়েছে । কোথাও আশ্রয় না পেয়ে নওবা, ইথিওপিয়া এবং বেজাওয়ার ও মরুভূমিতে লক্ষ্যহীনভাবে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়েছে । এর ফলে তাদের অধিকাংশই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ হারায় । অবশিষ্টরা ইয়ামানের দক্ষিণ অঞ্চলে এসে পৌছে । সেখানে ভিক্ষার মাধ্যমে পথ খরচ যোগাড় করে এবং কুলিদের ছদ্মবেশে মক্কার দিকে রওনা হয় । কিন্তু সেখানে মানুষের মাঝে তারা নিখোজ হয়ে যায় ।[৭৬]

## হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশের শেষদিকে উমাইয়া খলিফাদের চরম নির্যাতন ও অসদাচরণের পরিণতিতে সকল ইসলামী দেশ গুলোতে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ, বিপ্লব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে । এর পাশাপাশি ইরানের খোরাসান প্রদেশে একদল লোক জনগণকে 'আহলে- বাইতের' অধিকার আদায়ের আন্দোলনের আহবান জানাতে থাকে । জনাব 'আবু মুসলিম মারওয়াযি' নামক জনৈক ইরানী সর্দার ছিলেন ঐ আন্দোলনের নেতা । তারা উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ক্রমেই তাদের আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করতে থাকে । অবশেষে তারা উমাইয়াদেরক ক্ষমতাচ্যুত করতে সমর্থ হয় ।[৭৭] ঐ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে পক্ষে শীয়াদের সুগভীর প্রচার অভিযান থেকেই উৎসরিত হয়েছিল । আহলে- বাইতের শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের নামেই ঐ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল । এমন কি জনগণ নবীবংশের জনৈক জনপ্রিয় ব্যক্তির হাতে গোপনে 'বাইয়াত' (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল । কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে শীয়া ইমামগণের (আ.) সরাসরি কোন নির্দেশ বা ইংগিত ছিল না । এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন জনাব আবু মুসলিম

মদিনায় ইমামিয়াপন্থী শীয়াদের ৬ষ্ঠ ইমামের (হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.)) কাছে খেলাফতের জন্যে গৃহীত 'বাইয়াত' সম্পূর্ণ করতে চান ।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তৎক্ষনাৎ ঐ প্রস্তাব পত্যাখ্যান করেন । তিনি বলেনঃ "তুমি আমার লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও । আর সময়ও এখনও আসেনি" ।[৭৮] অবশেষে আব্বাসীয় বংশের লোকেরা আহলে- বাইতের নাম ভাংগিয়ে খেলাফতের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় ।[৭৯] তারা শাসন ক্ষমতা লাভের পর প্রথম দিকে জনগণ ও হযরত আলী (আ.)- এর অনুসারী শীয়াদের সাথে সদাচরণ করতে থাকে । এমন কি 'আলাভীদের' ( শীয়াদের) শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের নামে তারা উমাইয়া বংশীয় লোকদের গণহত্যা চালায় । তারা উমাইয়া খলিফাদের কবর খুড়ে তাদের দেহাবশেষে যা কিছু পেত অগ্নিদগ্ধ করত ।[৮০] কিছুদিন কাটতে না কাটতেই তারা উমাইয়া খলিফাদের মতই নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে । অন্যায় অত্যাচার মূলক ও নীতিহীন কার্যকলাপ ঘটাতে তাদের এতটকু কন্ঠাবোধও হল না । আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের দ্বারাই আহলে সুন্নাতের ইমাম আবু হানিফা জেল বন্দী হন ।[৮১] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালও জনৈক আব্বাসীয় খলিফার দ্বারা চাবুকে প্রহৃত হন ।[৮২] শীয়াদের ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও আব্বাসীয় খলিফার দ্বারা নির্যাতিত হন এবং বিষ প্রয়োগে নিহত হন ।[৮৩] আব্বাসীয় খলিফারা শীয়াদের দলে দলে হত্যা করে । অনেক শীয়াকেই জীবন্ত কবর দিয়ে তারা হত্যা করেছে । অসংখ্য শীয়াকে হত্যা করে তাদের উপর দেয়াল এবং বিভিন্ন সরকারী ভবন তৈরী করা হয় । আব্বাসীয় খলিফা হারুনের শাসন আমলে ইসলামী সমাজ, ক্ষমতা ও পরিধি ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করে । খলিফা মাঝে মাঝে সূযের দিকে লক্ষ্য করে বলতেন : 'হে সূর্য ! যেথায় খুশি জাতি ছড়িয়ে যা কিন্তু তা যেন আমার সাম্রাজ্যের বাইরে না হয়!' খলিফার সেনা বাহিনী মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বিশ্বে সর্বত্র বিজয়ী বেশে এগিয়ে যাচ্ছিলো । অথচ খলিফার রাজ প্রাসাদের মাত্র কয়েক কদম দূরে বাগদাদ সেতুর উপর খলিফার অজান্তে এবং বিনা অনুমতিতে কিছু লোক পথচারীদের কাছ থেকে টোল আদায় করতে থাকে । এমনকি একদিন স্বয়ং খলিফা ঐ সেতু অতিক্রম করার সময় টোল আদায়ের জন্য তার পথরোধ করা হয়েছিল ।[৮৪] জনৈকা গায়িকার

যৌন আবেদনময়ী গানের মাত্র দু'টি চরণ শুনেই আব্বাসীয় খলিফা আমিন উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং সাথে সাথেই ঐ গায়িকাকে ৩০ লক্ষ দিরহাম উপহার দেন । গায়িকা ঐ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আবেগ আপ্লুত হয়ে খলিফা আমিনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে : এতোগুলো অর্থ সবই কি আমাকে দান করলেন? খলিফা উত্তরে বলে: "এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় । এ টাকা পুনরায় সাম্রাজ্যের অচেনা অন্য আরেক অঞ্চল থেকে আদায় করে নেব![৮৫] 'বাইতুল মালে'র (রাজকোষ) নামে পাহাড় পরিমাণ অর্থ সম্পদ সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে খলিফাদের কাছে নিয়মিত এসে জমত । আর খলিফারা ঐ অর্থ তাদের বিলাসিতা, লাম্পট্য ও সত্য নিধনের কাজে ব্যয় করতেন । হাজার হাজার রূপসী ক্রীতদাসী ও সুন্দর চেহারার তরুণ- তরুণীতে আব্বাসীয় খলিফাদের দরবার ছিল পরিপূর্ণ !!

উমাইয়া বংশের পতন ও আব্বাসীয় বংশের শাসনক্ষমতা লাভের মাধ্যমে অত্যাচারী শ্বাসকগোষ্ঠির নাম পাল্টানো ছাড়া শীয়াদের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি ঘটেনি ।

## হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে শীয়ারা সর্বপ্রথম কিছুটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায় । কারণ

**প্রথমতঃ** ইতিমধ্যে সুরিয়ানী ও গ্রীক ভাষার প্রচুর বিজ্ঞান ও দর্শনের বই আরবীতে অনুদিত হয়েছিল । জনগণের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক (দার্শনিক) ও প্রমাণ্য জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল । এ ছাড়াও আব্বাসীয় খলিফা মামুন (১৯৫- ২১৮ হিজরী) 'মু'তাযিলা' মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তিনি যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ্য মাযহাবের প্রতি অনুরাগী ছিলেন । এ কারণেই তিনি যুক্তিযুক্ত প্রমাণভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম ও মাযহাব চর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ছিলেন । শীয়া আলেম ও দার্শনিকগণও এ সুযোগটি লুফে নেয় । জ্ঞান চর্চাসহ আহলে- বাইতের মাযহাব প্রচারের সার্বিক কর্মসূচী পূর্ণদ্দোমে চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তারা এ ২ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যাবহার করেন ।[৮৬]

**দ্বিতীয়তঃ** এ ছাড়াও আব্বাসীয় খলিফা মামুন তার নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে শীয়াদের অষ্টম ইমাম, হযরত ইমাম রেজা (আ.) কে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রদানের অংগীকার করেছিলেন ।[৮৭] এফেলে আহলে- বাইতের অনুসারী ও ভক্তরা শ্বাসকগোষ্ঠির অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল । সেদিন কিছুটা রাজনৈতিক স্বাধীনতাও তাদের ভাগ্যে জুটে ছিল । কিন্তু না, সে ভাগ্য আর বেশী দিন দীর্ঘায়িত হয়নি । তলোয়ারের ধারালো অগ্রভাগ আবারও তাদের দিকেই ফেরানো হল । পাক্তন শ্বাসকগোষ্ঠির বিসৃত প্রায় শোষণ ও নির্যাতন নীতি আবার তাদের উপর চালানো হয় । বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২ হিঃ - ২৪৭ হিঃ) আলী (আ.) ও তার শীয়াদের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিলেন । এমন কি তার নির্দেশেই কারবালা প্রান্তরে অবস্থিত হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পবিত্র মাযার সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে- গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় ।[৮৮]

## হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে এমন বেশ কিছু কারণের উদ্ভব ঘটে, যা শীয়াদেরকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করে । আব্বাসীয় খেলাফতের রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক দূর্বলতা ও 'বুইয়া' বংশীয় বাদশাহের অভ্যুদয় ছিল ঐসব কারণের মধ্যে অন্যতম ।

'বুইয়া' বংশীয় বাদশারা ছিলেন শীয়া মাযহাবের অনুসারী । রাজধানী বাগদাদের খেলাফত প্রশাসনের কেন্দ্র এবং স্বয়ং খলিফার উপর তাদের প্রচন্ড প্রভাব ছিল । ঐ দৃষ্টিগ্রাহ্য রাজনৈতিক শক্তির ছত্রছায়ায় শীয়ারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় মতাদর্শ প্রচারের সুযোগ পায়, যা ইতোপূর্বে ক্ষমতাসীন খলিফাদের উৎপীড়নের কারণে কখনও বাস্তবতার মুখ দেখতে পায়নি । ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে ঐ (৪র্থ শতাব্দীতে) বড় শহরগুলো ছাড়া আরবের অধিকাংশ অঞ্চল শীয়া অধ্যুষিত ছিল । এ ছাড়াও হাজার, ওমান ও সা'য়াদাসহ বেশ কিছু শহরও ছিল শীয়া অধ্যুষিত । ইরাকের বসরা শহর যুগের পর যুগ সুন্নীদের এবং কুফা শহর শীয়াদের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হত । এ দু'শহরের মাঝে সব সময়ই মাজহাবগত প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত ।

এভাবে তারাবলুস, নাবলস, তাবারীয়া, হালাব, হেরাত, আহওয়ায, ও ইরানের পারস্য উপসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চল সমূহ ছিল শীয়া অধ্যুষিত ।[৮৯] হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনাব নাসের আতরুশ নামক জনৈক ব্যক্তি বহু বছর যাবৎ ইরানের উত্তরাঞ্চলে (শীয়া মতাদর্শ) প্রচার অভিযান চালায় । পরবর্তীতে 'তাবারিস্থান' নামক অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা তিনি লাভ করেন এবং ঐ শাসন ক্ষমতা তার বংশের বেশ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । অবশ্য জনাব আতরুশের পূর্বে ও হাসান বিন যায়েদ আলাভী (শীয়া) বহু বছর তাবারিস্থানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ।[৯০] হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতেই ফাতেমী বংশীয় ইসমাঈলীপন্থী শীয়ারা মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং বেশ কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের রাজত্ব অব্যাহত (২৯২-৫২৭ হিজরী বর্ষ) থাকে ।[৯১] ইতিহাসে বহুবার বাগদাদ, বসরা, নিশাপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরে শীয়া-সুন্নী সাম্প্রদায়িক বিতর্ক ও সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল, যার অনেক গুলোতেই শীয়ারা বিজয়ী হয়েছিল ।

## হিজরী নবম শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মতই হিজরী পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও শীয়ারা তাদের বিস্তার লাভের গতি অব্যাহত রাখে । ঐ যুগে ক্ষমতাসীন বাদশারা ছিলেন শীয়া মতাদর্শের অনুসারী । ফলে তারাও শীয়া মতাদর্শের বিস্তৃতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন । হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে 'কিলাউল মাউত' নামক স্থানে 'ইসমাঈলীপন্থী' শীয়া মতাদর্শ প্রচারের অভ্যুদয় ঘটে । ইসমাঈলীরা প্রায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত ইরানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে ।[৯২] 'মারআ'শী' বংশীয় সাইয়্যেদগণ (রাসূল (সা.)-এর বংশের লোক) বহু বছর যাবৎ ইরানের মাযেন্দারানে রাজত্ব করেন ।[৯৩] শাহ্ খোদা বান্দেহ নামক জনৈক মোগল সম্রাট শীয়া মাযহাব গ্রহণ করেন এবং তারপরও বহু বছর যাবৎ তার উত্তরাধিকারীরা (শীয়া) ইরানের রাজত্ব করেন এবং শীয়া মাযহাবের উন্নতি ও সম্প্রসারণে সাহায্য করেন । একইভাবে ইরানের তাব্রিজ 'অকে কুইউ নালু' ও 'কোররে কুইউ নালু' বংশীয় শীয়া সম্রাটরাও বহু বছর ঐ অঞ্চলে শাসন

করে ।[৯৪] যাদের রাজ্যসীমা ইরানের (তাব্রিজ থেকে) ফার্স প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । ঐ একই সময় মিসরে ফাতেমীয়রা বহু বছর যাবৎ শাসন করে । অবশ্য মাযহাবগত শক্তি বিভিন্ন বাদশাহদের যুগে বিভিন্ন রকম ছিল । যেমন মিসরে ফাতেমীয়দেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে 'আইয়ূবীয়' বংশ যখন শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন, মিশরের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রাল্টে যায় । মিশর ও সিরিয়ার শীয়ারা সম্পূর্ণ রূপে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে । ফলে তলোয়ারের সম্মুখে অসংখ্য শীয়াদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় ।[৯৫] বিখ্যাত শহীদলু আওয়াল (প্রথম শহীদ) জনাব মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মাক্কীর শাহাদতের ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি ইতিহাসের এক অসাধারণ মেধাসম্পন্ন শীয়া ফকীহ্ (ইসলামী আইন বিশারদ) ছিলেন । শুধুমাত্র শীয়া মাযহাবের অনুসারী হওয়ার অপরাধে হিজরী ৭৮৬ সনে দামেস্কে তাকে হত্যা করা হয়েছিল![৯৬] একইভাবে সিরিয়ার 'হালাব' শহরে জনাব শেইখ এশরাক শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি নামক জনৈক বিখ্যাত দার্শনিককে শীয়া হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হয়!![৯৭]

মোটকথা, এই পাঁচ শতাব্দী যাবৎ ক্ষমতাসীন মৈত্রী শ্বাসকগোষ্ঠি কতৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগ করায় শীয়া মতাদর্শের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় । আবার কখনও বা তারা বৈরী শ্বাসক গোষ্ঠির কোনপানলেও প্রতিত হয় । কিন্তু ঐ দীর্ঘ সময়ে কোন ইসলামী দেশে শীয়া মাযহাব কখনও রাষ্ট্রিয় মাযহাব হিসেবে ঘোষিত হয়নি ।

## হিজরী দশম ও একাদশ শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

জনাব শেখ সাফী আর্দেবিলী (মৃত্যু হিজরী ৭৩৫ সনে) নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন শীয়া মাযহাবের অনুসারী তরিকতপন্থী সুফী সাধাক । হিজরী ৯০৬ সনে ঐ পরিবারের জনৈক ১৩ বছর বয়সী এক তরুণ তার বাবার ভক্ত মুরীদদের মধ্য থেকে ৩০০ জন দরবেশের সহযোগীতায় একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন শীয়ারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে'আর্দেবীলে' বিদ্রোহ করেন । এরপর তারা একের পর এক দেশ দখল করতে থাকে এবং ইরানের গোত্রীয় প্রশাসন পদ্ধতি ধ্বংস করে চলে । এভাবে স্থানীয় রাজা-বাদশাহ্ এবং বিশেষ করে ওসমানী সাম্রাজ্যের অধীন ওসমান

বংশীয় বাদশাদেরকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে খণ্ড- বিখণ্ড ইরানকে পূর্ণাঙ্গ একটি দেশে রূপ দেয় । তিনি স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলে শীয়া মাযহাবকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদা প্রদান করেন ।[৯৮] বাদশাহ্ ইসমাইল সাফাভীর মৃত্যুর পর দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সাফাভী বংশীয় বাদশাগণ একের পর এক রাজত্ব চালিয়ে যান । তারা প্রত্যেকেই বংশানুক্রমে ইমামিয়া শীয়া মাযহাবকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদা প্রদান করেন এবং তা সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান । এ অবস্থা মহাসম্রাট 'শাহ আব্বাস কবীর' পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যখন সাফাভী বংশীয় রাজত্ব ক্ষমতার চুড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং তাদের রাজ্যসীমা বর্তমান ইরানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে (হিজরী ১৩৮৪ সন) পৌছে ছিল ।

## হিজরী দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে শীয়াদের অবস্থা

পূর্ববর্তী তিন শতাব্দী যাবৎ শীয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্নতি প্রাকৃতিক গতিতে অব্যাহত ছিল । অবশেষে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে শীয়া মাযহাব আনুষ্ঠানিক ভাবে গণপরিচিতি লাভ করে । ইয়ামান ও ইরাকের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ শীয়া মাযহাবের অনুসারী । এ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই কমবেশী শীয়াদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় । বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে শীয়া জনসংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে ।[৯৯]

## প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ

# শীয়া মাযহাবের গোত্রসমূহ

**দল বিভক্তির মূলকারণ :**

প্রত্যেক মাযহাবেই কম বেশী এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা ঐ মাযহাবের মূলভিত্তি রচনা করে । ঐ বিষয়গুলোর পরে অন্যসব বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত । তাই মাযহাবের মূলনীতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে দ্বিতীয় শ্রেণীর খুঁটি- নাটি বিষয়ের মত পার্থক্যের ভিত্তিতে অন্য যেসব দল গঠিত, সেসব দল ঐ মূল মাযহাবের উপদল হিসেবে পরিচিত । পৃথিবীর সকল ঐশী ধর্মেই (ইহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী ও ইসলাম) এ ধরণের দল ও উপদলের উপস্থিতি বিদ্যমান । প্রথম তিন ইমামের { হযরত ইমাম আলী (আ.), হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)} যুগে শীয়া মাযহাবের কোন উপদলের সৃষ্টি হয়নি । হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর শাহাদতের পর অধিকাংশ শীয়াই ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পুত্র হযরত ইমাম সাজ্জাদ (জয়নুল আবেদীন) (আ.)- কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে । কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক, যারা 'কিসানিয়া' নামে পরিচিত ছিল, ইমাম আলী (আ.)- এর তৃতীয় পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে তাদের ৪র্থ ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে । তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াই ছিলেন সেই প্রতীক্ষিত মাহদী (আ.) । যিনি 'রোযাভী' নামক পাহাড়ে অদৃশ্য হয়েছিলেন এবং কোন একদিন আত্মপ্রকাশ করবেন! হযরত ইমাম সাজ্জাদ (জয়নুল আবেদীন) (আ.)- এর শাহাদতের পর অধিকাংশ শীয়ারাই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম বাকের (আ.)- এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে । কিন্তু কিছু সংখ্যক শীয়া হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)- এর শাহাদত প্রাপ্ত অন্য এক পুত্র যাইদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন । যারা পরবর্তীতে 'যাইদিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে ।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আ.)- এর শাহাদতের পর তার অনুসারী শীয়ারা তদীয় পুত্র হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর

শাহাদতের পর অধিকাংশ শীয়ারাই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম মুসা কাজেম (আ.)- কে তাদের সপ্তম ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেন । তবে কিছু সংখ্যক শীয়া হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর প্রথম পুত্র ইসমাঈলকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে । যদিও হযরত ইসমাঈল তার পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করে ছিলেন । এভাবে হযরত ইসমাঈলকে ইমাম হিসাবে গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে বৃহত্তর শীয়া জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং পরবর্তীতে 'ইসমাঈলীয়া' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । আবার শীয়াদের কেউ কেউ হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর অন্য পুত্র হযরত আবদুল্লাহ আফতাহকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে । শীয়াদের অন্য একটি অংশ ৬ষ্ঠ ইমামের অন্য এক পুত্র মুহাম্মদকে তাদের ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে । শীয়াদের আরেকটি অংশ ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- ই তাদের সর্বশেষ ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করে । হযরত ইমাম মুসা কাজিমের শাহাদতের পর অধিকাংশ শীয়াই তদীয় পুত্র হযরত ইমাম রেজা (আ.)- কে তাদের অষ্টম ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে । শীয়াদের একটি অংশ সপ্তম ইমাম হযরত ইমাম মুসা কাজেম (আ.)- কেই তাদের সর্বশেষ ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে । আর পরবর্তীতে তারা 'ওয়াকিফিয়াহ' নামে পরিচিতি লাভ করে । কিন্তু অষ্টম ইমাম হযরত ইমাম রেজা (আ.) থেকে দ্বাদশ ইমাম হযরত মাহদী (আ.) পর্যন্ত শীয়াদের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপদলের সৃষ্টি হয়নি । যদিও এসময়ে উপদল সৃষ্টির মত বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু খুব বেশীদিন তা টিকে থাকেনি । বরং এমনিতেই সে সমস্যা মিটে গিয়েছিল । যেমনঃ দশম ইমাম হযরত নাকী (আ.)- এর পুত্র জাফর একাদশ ইমাম হযরত ইমাম আসকারী (আ.)- এর শাহাদতের পর ইমামতের দাবী করেন । ফলে শীয়াদের একটি অংশ তার অনুসারীও হয়ে পড়ে । কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ওদিকে জাফরও ইমামতের দাবী নিয়ে আর তেমন একটা উচ্চবাচ্য করেনি । ফলে ব্যাপারটা ওখানেই ধামা চাপা পড়ে । এ ছাড়াও ইসলামী আইন (ফিকাহ) ও মৌলিক বিশ্বাস সমূহে শীয়া পন্ডিতদের মধ্যে জ্ঞানগত খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে, যেগুলোকে সঠিক অর্থে শীয়াদের উপদল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না । উপরোল্লিখিত অধিকাংশ শীয়া উপদলগুলো বেশ অল্পদিনের মধ্যেই

বিলুপ্ত হয়ে যায় । পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুল শীয়া জনগোষ্ঠীর মোকাবিলায় মুলতঃ মাত্র দু'টি দলই টিকে থাকে । এরা হচ্ছে 'যাইদিয়াহ' ও 'ইসমাঈলীয়াহ' দল । এদের অস্তিত্ব বর্তমানে ইয়ামান, ভারত এবং লেবাননসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয় । এ কারণেই 'দ্বাদশ ইমামপন্থী' শীয়াদের পাশাপাশি শুধুমাত্র 'যাইদিয়াহ' ও ইসমাঈলীয়াহ্' শীয়াদের আলোচনাই যথেষ্ট বলে মনে করছি ।

## যাইদিয়াহ্ শীয়া উপদল

চতুর্থ ইমাম হযরত ইমাম সাজ্জাদ (জয়নুল আবেদীন) (আ.)- এর শাহাদত প্রাপ্ত পুত্র হযরত যাইদের অনুসারীরাই 'যাইদিয়াহ' নামে পরিচিত । হিজরী ১২১ সনে হযরত যাইদ, উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন । একদল লোক তার হাতে এ উপলক্ষ্যে বাইয়াতও করে । ইরাকের কুফা শহরে খলিফার বাহিনীর সাথে যুদ্ধের সময়ে হযরত যাইদ শাহাদত বরণ করেন । হযরত যাইদের অনুসারীরা তাকে পবিত্র আহ্‌লে বাইতের পঞ্চম ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে । হযরত যাইদের পর তদীয় পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া বিন যাইদ তার স্থলাভিষিক্ত ´ হন । তিনিও উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শহীদ হন । এর পর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আব্বাসীয় খলিফা মানসুর দাওয়ানিকির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শহীদ হন । ইয়াহইয়া বিন যাইদের শাহাদতের পর উপরোক্ত দু'জনকেও যাইদিয়াহগণ্ ইমাম হিসেবে বিশ্বাস করেন । কিন্তু এর পর বেশ কিছু যুগ পর্যন্ত যাইদিয়াদের কার্যক্রমে বিশৃংখলা বিরাজ করে । অতঃপর নাসের অতরুশ নামে হযরত যাইদের ভ্রাতৃবংশীয় জনৈক ব্যক্তি 'খোরাসানে' আত্মপ্রকাশ করেন । কিন্তু স্থানীয় শ্বাসকগোষ্ঠির উৎপীড়নের কারণে সেখান থেকে পালিয়ে 'মাযেন্দারান' গিয়ে আশ্রয় নেন । মাযেন্দারানবাসী তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি । জনাব নাসের অতরুশ দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ মাযেন্দারান ইসলামের প্রচার কার্যচালান এবং প্রচুর সংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং এরা সবাই 'যাইদিয়াহ' পন্থী

শীয়ায় পরিণত হয় । এর পর তাদের সহযোগীতায় ‘তাবারিস্থানের’ একটি অংশ দখল করে জনগণের ইমাম হিসাবে সেখানে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন । তার পর বহুযুগ ধরে তার বংশের উত্তরাধিকারীরা একের পর এক ঐ অঞ্চলে ইমাম হিসেবে রাজ্য শ্বাসনের কাজ চালিয়ে যান । ‘যাইদিয়া’দের বিশ্বাস অনুসারে হযরত ফাতেমা (আ.)- এর বংশের যে কোন আলেম, বীর, উদার ও সাধুপুরুষ যদি সত্যের পক্ষে রাজনৈতিক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন তাহলে, তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী হবেন । যাইদিয়ারা তাদের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামের প্রথম দু’খলিফা আবু বকর ও ওমরকেও তাদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করত । কিন্তু পরবর্তীতে ‘যাইদিয়া’দের কিছু লোক প্রথম দু’খলিফাকে তাদের ইমামের লিষ্ট থেকে বাদ দেন এবং হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে তাদের সর্বপ্রথম ইমাম হিসেবে ঘোষণা করেন । মৌলিক বিশ্বাসের দিক থেকে ‘যাইদিয়’রা মু’তাযিলাদের সদৃশ্য । কিন্তু ফিকহের ব্যাপারে তারা আহলে সুন্নাতের (চার মাজহাবের একটি) হানাফি মাযহাবের অনুসারী, যার নেতা হল ইমাম আবু হানিফা । অবশ্য জ্ঞানগত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মত পর্থক্যও রয়েছে।[১০০]

## ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায় ও তার গোত্র সমূহ

বাতেনী দল: ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর প্রথম পুত্রের নাম ছিল ইসমাঈল ।[১০১] তিনি তার পিতা হযরত জাফর সাদেক (আ.)- এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন । পুত্র ইসমাঈলের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বয়ং হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) নিজে সাক্ষী দেন এবং মদীনার তদানিন্তন শ্বাসকও এ ব্যাপারে সাক্ষী দেন । তথাপি শীয়াদের একটি দল বিশ্বাস করত যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেননি, বরং আত্মগোপন করেছেন এবং তিনি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবেন! আর তিনি হচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) । পুত্র ইসমাঈলের মৃত্যুর ব্যাপারে ৬ষ্ঠ ইমামের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি এক প্রকারের ‘তা’মিদ’ ( পবিত্র পানি দিয়ে অভিসিঞ্চন

করানো) ছিল, যা আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের ভয়ে সম্পন্ন করা হয়েছিল । শীয়াদের একটি অংশ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, ইমামতের অধিকার ইসমাঈলেরই । কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুর কারণে ইমামত তার ভাই মুহাম্মদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে । শীয়াদের অন্য একটি অংশ বিশ্বাস করত যে, ইসমাঈল যদিও পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেছেন, তথাপি সেই ইমাম এবং তার মৃত্যুর পর আপন পুত্র মুহাম্মদ বিন ইসমাঈলই পরবর্তী ইমাম হয়েছেন এবং এভাবে ইমামত ইসমাইল বংশেই সীমিত থাকবে । প্রথম দু'টি উপদল অল্প দিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়ে যায় । তবে তৃতীয় উপদলটি এখনও টিকে আছে এবং তার আরও কিছু উপদল সৃষ্টি হয়েছে । ইসমাঈলীয়াগণ বিশ্বাসগত দিক থেকে একটি বিশেষ দর্শনের অধিকারী তা বেশ কিছুটা নক্ষত্র পুজারীদের মত যা ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের সাথে মিশ্রিত । ইসলামী আইন ও জ্ঞানের ব্যাপারে ইসমাঈলীয়াগণের বিশ্বাস হচ্ছে, প্রতিটি বাহ্যিক বিষয়েরই একটি অর্ন্তদিক রয়েছে এবং কুরআনের প্রতিটি আয়াতেরই 'তা'উইল' ( পরিবর্তনশীল ব্যাখা)রয়েছে ।

এ ছাড়াও তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ বিশ্ব কখনও 'হুজ্জাত' বা ঐশী প্রমাণ বা প্রতিনিধি শূণ্য হতে পারে না । আল্লাহর সেই হুজ্জাত বা প্রমাণ দু'ধরণের : (১) সবাক ও (২) নির্বাক ।

আল্লাহর রাসূল (সা.) তার সবাক প্রমাণ । আর রাসূল (সা.)- এর প্রতিনিধি বা ইমামগণ হচ্ছেন আল্লাহর নির্বাক প্রমাণ । ইমামগণ মহানবী (সা.)- এর উত্তরাধিকারী তথা মহান আল্লাহর সামগ্রিক প্রভূত্বের বহিঃপ্রকাশ ও প্রমাণ স্বরূপ । আল্লাহর এই প্রমাণ বা হুজ্জাতের ভিত্তি সাতটি সংখ্যার মধ্যে আবর্তিত । অর্থাৎ একজন নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হন, যিনি শরীয়ত ও বিলায়াতের (কর্তৃত্ব ) ক্ষমতার অধিকারী । তার পর তার ওসিয়াত (উইল) অনুসারে সাতজন তার উত্তরাধিকারী হবেন, যাদের সবাই সমমর্যাদা সম্পন্ন হবেন । কিন্তু এদের মধ্যে সপ্তমব্যক্তি নবুয়তের অধিকারীও হবেন এবং তিনি তিনটি পদের অধিকারী হবেন । নবুয়ত, ওসিয়ত, বিলায়াত । পুনরায় তার পর তাঁর ওসিয়ত (উইল) অনুযায়ী সাত জন ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারী হবেন । এদের সপ্তম পূর্বের মতই তিনটি পদ বা মর্যাদার অধিকারী হবেন । আর এ ভাবেই এই ধারা অব্যাহত থাকবে । তারা বলে থাকেন : হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম নবুয়ত ও বিলায়াত

সহ আল্লাহর পক্ষথেকে অবতির্ণ হয়েছেন । তার পর, তার সাত জন উত্তরাধিকারী ছিলেন । এদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত নুহ (আ.) । আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)- এর সাতজন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সপ্তম বিশ্বাস হচ্ছেন হযরত মুসা (আ.) । হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুসা (আ.)- এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সপ্তম বিশ্বাস ছিলেন । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত ঈসা (আ.)- এর সাতজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ছিলেন সপ্তম । আর জনাব মুহাম্মদ বিন ইসমাইল ছিলেন রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সপ্তম । নিয়মানুযায়ী যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (আ.), হযরত ইমাম হুসাইন (আ.), হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.), ইমাম মুহাম্মদ বাকের (আ.), হযরত জাফর সাদিক (আ.) এবং ইসমাইল ও মুহাম্মদ বিন ইসমাইল হচ্ছেন ইমাম । { দ্বিতীয় ইমাম হাসান (আ.)- কে তারা ইমাম হিসেবে গণ্য করেন না} জনাব মুহাম্মদ বিন ইসমাঈলের পর তদ্বংশীয় সাতজন উত্তরাধিকারীর নাম আজও গোপন রয়েছে । তারপর সাতজন উত্তরাধিকারী হচ্ছেন মিশরের ফাতেমী বংশীয় বাদশাহগণ । এদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন উবাইদুলাহ্ মাহদী । যিনি সর্বপ্রথম মিশরে ফাতেমী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ।

ইসমাঈলীয়াগণ আরও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ‘হুজ্জাত’ বা ‘প্রমাণ’ ছাড়াও আরও বারজন নেতা রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহর হুজ্জাত বা ঐশী প্রতিনিধির বিশেষ ঘনিষ্ট ব্যক্তি । ইসমাঈলীয়াদের কিছু উপদল যেমন দ্রুযদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঐ বারজন নেতার মধ্যে পবিত্র আহলে বাইতের ছয়জন ইমামও অন্তর্ভুক্ত । বাকী ছয়জন অন্যান্য ব্যক্তি । হিজরী ২৮৮ সনে (মিশরে উবাইদুলাহ্ মাহদীর আবির্ভাবের ক’বছর পূর্বে ) কুফা শহরের নিকটে ইরানের খুজিস্তানেরর অধিবাসী জনৈক ব্যক্তির অভুদ্বয় ঘটে, সে কখনও তার আত্ম পরিচয় দেননি । ঐ ব্যক্তি সারা দিন রোযা রাখত ও সারা রাতব্যাপী ইবাদতে নিমগ্ন থাকত এবং কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করত । আর জনগণের মধ্যে ইসমাঈলীয়া মাযহাব প্রচার করত । এভাবে প্রচুর সংখ্যক লোক তার মাধ্যমে ইসমাঈলীয়া মাযহাবে দীক্ষিত হয় । ঐ ব্যক্তি তার অনুসারীদের মধ্যে বারজনকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করে । এর পর সে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে কুফা ত্যাগ করে । তার

পর থেকে তার কোন সংবাদ আর পাওয়া যায়নি । তারপর আহমাদ ওরফে কিরমিত নামক জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি ইরাকে তার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং 'গুপ্ত বিশ্বাস' শিক্ষার প্রসার ঘটাতে থাকে । ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুসারে ঐ ব্যক্তি ইসলামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে নতুন নামাজের প্রবর্তন করে । 'জানাবাতের গোসলের' আইন সে রহিত করে এবং মদ পানকে হালাল বলে ঘোষণা করে । পাশাপাশি অন্যান্য 'গুপ্তপন্থী' (ইসমাঈলীয়া) গোত্রের নেতাদেরকে বিদ্রোহ করার আহবান জানায় । এ উপলক্ষ্যে একদল লোককে তার চতুর্পাশ্বে সমবেত করে । এরা 'গুপ্তপন্থী' মাযহাবের অনুসারী ছাড়া অন্য কারো জান মালের প্রতি এতটকু সম্মানেও বিশ্বাসী ছিল না । এর ফলে তারা ইরাক, সিরিয়া, বাহরাইন্ ও ইয়ামানে আন্দোলন চালানোর নামে অসংখ্য জনগণকে হত্যা করে এবং তাদের সকল সম্পদ লুন্ঠন করে । তারা বহুবার হজ্জ যাত্রীদের কাফেলায় আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার হাজীকে হত্যা এবং তাদের সর্বস্ব লুন্ঠন করে । 'গুপ্তপন্থীদের' (ইসমাঈলীয়া) জনৈক নেতা আবু তাহের কিরমিত হিজরী ৩১১ সনে বসরা শহর দখল করে সেখানে ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ চালায় । হিজরী ৩১৭ সনে 'গুপ্তপন্থী' দের বিরাট এক বাহিনী সহ হজ্জ মৌসুমে সে মক্কাভিমুখে যাত্রা করে । সে সামান্য চেষ্টাতেই মক্কা নগরীর প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের বুহ্য ভেদ করে মক্কায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয় । আবু তাহের কিরমিতির নেতৃত্বে মক্কায় প্রবেশ করে তার বাহিনী মক্কার অধিবাসী ও নবাগত হাজীদের মধ্যে ব্যাপক গণহত্যা চালায় । এমন কি তারা মসজিদুল হারাম এবং পবিত্র কাবা ঘরের ভেতর রক্তের বন্যা প্রবাহিত করে । এরপর পবিত্র কা'বা ঘরের গিলাফ বা আচ্ছাদনটি টুকরা টুকরা করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয় । এমন কি পবিত্র কা'বা ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক 'হাজরে আসওয়াদ' নামক পবিত্র কালো পাথরটি বের করে 'ইয়ামানে' নিয়ে যায় । প্রায় ২২ বাছর যাবৎ ঐ পবিত্র 'হাজরে আসওয়াদ' পাথরটি 'কিরমিতি' বংশীয় লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল । এ জাতীয় কার্য কলাপের কারণেই বিশ্বে ও মুসলমানরা 'ইসমাঈলীয়া'দের (গুপ্তপন্থী) সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় এবং তাদের ইসলামী মাযহাবসমূহের বহিঃর্ভূত বলে ঘোষণা করে । এমন কি ঐ যুগে উবাইদলাহ মাহদী যখন মিসরে ফাতেমী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

করে নিজেকে ‘মাহদী মাওউদ’ (প্রতিশ্রুত মাহদী) এবং ‘ইসমাঈলীয়া’ দের ইমাম হিসাবে ঘোষণা করেছিল সেও আবু তাহের কিরমিতির এহেন জঘণ্য কার্য কলাপের তীব্র নিন্দা ও অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে । ঐতিহাসিকদের মতানুসারে, ইসমাঈলীয়া (গুপ্তপন্থী) মাযহাবের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের সকল বাহ্যিক আইন- কানুনকেই তাদের তথাকথিত গুপ্ত ও আধ্যাত্মিক পন্থায় ব্যাখার মাধ্যমে ‘তা’উইল’ বা পরিবর্তিত করে । তাদের মতে ইসলামী শরীয়তের এসব বাহ্যিক আইন- কানুন শুধুমাত্র তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট, যারা তুলনা মূলক ভাবে কম প্রজ্ঞার অধিকারী এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত । তাদের বেশ কিছু ধর্মীয় আইন তাদের ইমামের দ্বারা প্রণীত হয়ে থাকে ।

## নাযারিয়া, মুসতাআ’লিয়া, দ্রুযিয়া ও মুকনিয়া উপদল সমুহ

হিজরী ২৯৬ সনে আফ্রিকা মহাদেশে যখন উবাইদুলাহ মাহদীর অভ্যুদয় ঘটে, তখন সে ইসমাঈলীয়াদেরকে তার ইমামত গ্রহণের আহবান জানায় এবং মিশরে তার ফাতেমী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে । তারপর তার বংশের লোকেরা মিশরকে তাদের খেলাফতের রাজধানী হিসেবে পরপর সাত পুরুষ যাবৎ রাজত্ব অব্যাহত রাখে । ফাতেমী বংশের ঐ শাসন আমলে কোন ধরণের উপদলে বিভক্ত না হয়েই তারা ইসমাঈলীয়া ইমামতের পদ ও স্বীয় রাজত্ব সংরক্ষণ করে যেতে সক্ষম হয় । ফাতেমী বংশের সপ্তম পুরুষ বাদশাহ মুসতানসীর বিল্লাহ সাদ বিন আলীর নাযার ও মুসতাআ’লি নামক দু’পুত্র ছিল । খেলাফত ও ইমামতের পদাধিকার দখল নিয়ে দু’ভাবইয়ের মধ্যে চরম বিভেদ শুরু হয় । অতঃপর সুদীর্ঘ সংঘর্ষ ও বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসতাআ’লী, নাযারকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় । এর পর সে নাযারকে বন্দী করে এবং পরিশেষে জেলেই তার মৃত্যু ঘটে । দু’ভাইয়ের এ জাতীয় বিবাদের ফলে ফাতেমীয় অনুসারীদের মধ্যে ‘নাযারিয়া’ এবং ‘মুসতাআ’লী’ নামক দু’টি নতুন দলের সূত্রপাত ঘটে ।

**(ক) নাযারিয়া:** নাযারিয়াগণ মুলত: হাসান সাবাহর অনুসারী ছিল, যে মুসতানসির বিল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন । মুসতানসির বিল্লাহর মৃত্যুর পর সে নাযারকে সমর্থন করে । একারণে মুসতাআ'লী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হাসান সাবাহকে মিশর থেকে বহিস্কার করে । মিশর থেকে বহিস্কৃত হয়ে হাসান সাবাহ্ ইরানের আগমন করে । কিছু কাল পরই সে ইরানের কাজভীন 'আল মউত' প্রাসাদ সহ আ্রশ প্রাশর প্রাসাদ সমূহ দখল করে বসে এবং সেখানে রাজত্ব করা শুরু করে । হিজরী ৫১৮ সনে হাসান সাবাহর মৃত্যুর পর বুযুর্গ উমিদ রুদবারী এবং তার মৃত্যুর পর তদ্বীয় পুত্র কিয়া মুহাম্মদ, হাসান সাবাহর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারেই শাসন কার্য চালিয়ে যায় । তার মৃত্যুর পর চতুর্থ বাদশাহ্ হাসান আলা 'যিকরিহিস্ সালাম পৈত্রিক আদর্শ নাযারিয়া মাযহাব ত্যাগ করে এবং 'গুপ্তপন্থী' ( ইসমাঈলীয়া) মাযহাবের অনুসারী হয় । এরপর হালাকু খান ইরান আক্রমণ করে ইসমাঈলীয়াদের রাজ প্রাসাদ দখল করে তা ধ্বংস করে ধুলিসাৎ করে দেয় এবং ইসমাঈলীয়াদের নির্বিচারে হত্যা করে । এরপর হিজরী ১২৫৫ সনে আগাখান মাহালাতি নামক জনৈক নাযারিয়াপন্থী ইরানের কেরমানশাহ্ অঞ্চলে মুহাম্মদ শাহ্ কাজরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত হয় । অতঃপর সে ভারতের বোম্বাই শহরে পালায়ন করে । এরপর সে বোম্বাইতে 'গুপ্তপন্থী' নাযারিয়া মাযহাবের ইমাম হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করে এবং তার মাযহাবের প্রচার ও প্রসারের কাজ চালাতে থাকে । তাদের ঐ প্রচার কার্য এখনও অব্যাহত আছে । তারা বর্তমানে 'আগাখানী' হিসাবে পরিচিত ।

**(খ) মুসতাআ'লীয়া :** এ মাযহাবের অনুসারীরা সবাই ফাতেমীয় ছিলেন এবং ফাতেমীয় খলিফাদের মধ্যেই এ মাযহাব অব্যাহত ছিল । প্রায় হিজরী ৫৫৭ সন পর্যন্ত এ মাযহাব টিকে ছিল । এর পরই এ মাযহাবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় । কিন্তু কিছু দিন পরই বোহরা নামে এ মাযহাব পুনরায় ভারতে আবির্ভূত হয়, যা আজও সেখানে টিকে আছে ।

**(গ) দ্রুযিয়া :** এ উপদলের অনুসারীরা সিরিয়া সীমান্ত সংলগ্ন 'দ্রুয' পর্বতমালার অধিবাসী । এরা মূলতঃ মিশরে ফাতেমীয় খলিফাদের অনুসারী ছিল । কিন্তু ফাতেমীয় ৬ষ্ঠ খলিফার শাসন আমলে জনৈক 'নেশতেগীন দ্রুযির' আহবানে গুপ্তপন্থী (ইসমাঈলীয়া বা বাতেনী) সম্প্রদায়ের

অন্তর্ভূক্ত হয় । দ্রুযিয়ারা তাদের ইমাম আল হাকিম বিল্লাহ নিহত হওয়ার পর তার ইমামতের প্রতিই স্থির থাকে । তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি মৃত্যু বরণ করেননি বরং আত্মগোপন করে উর্দ্ধাকাশে গমণ করেছেন । তিনি ভবিষ্যতে পুনরায় জনগণের মাঝে ফিরে এসে আত্মপ্রকাশ করবেন ।

**(ঘ) মুকনিয়া :** মূলতঃ জনাব আতা মারউই মুকনিয়ার অনুসারীরাই "মুকনিয়া" নামে পরিচিত । ঐতিহাসিকদের মতানুসারে এরা আবু মুসলিম খোরাসানির অনুসারী ছিল । আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর আতা মারউই দাবী করে যে, আবু মুসলিমের আত্মা তার দেহে প্রবেশ করেছে । এর কিছুদিন পর সে নবুয়তের দাবী করে বসে । তার কিছু কাল পর সে খোদা হওয়ার দাবী করে । অবশেষে হিজরী ১৬২ সনে 'মাওয়ারাইন নাহার' অঞ্চলের 'কিশ' প্রাসাদে তাকে ঘেরাও করা হয় । নিজের গ্রেফতার ও নিহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর সে আগুন জ্বালিয়ে কিছু সংখ্যক ভক্ত অনুরাগী সহ সেই আগুনে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করে । এরপর 'মুকনিয়ার' অনুসারীরা 'ইসমাঈলীয়া' মাযহাব গ্রহণের মাধ্যমে 'গুপ্তপন্থী'দের দলে সামিল হয় ।

## দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং যাইদিয়া ও ইসমাঈলীয়া

শীয়া মাযহাবের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি, যা থেকে উপরোল্লিখিত সংখ্যালঘু উপদল সমুহ সৃষ্টি হয়েছে, তা মূলতঃ 'ইমামিয়া' বা 'দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া' মাযহাব নামে পরিচিত । যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.)- এর পরে তার সাহাবীদের মধ্যে দু'টি বিষয় নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, যা মহানবী (সা.)- এর শিখানো সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব না দেয়ারই প্রতিফল ছিল । সে দু'টি বিষয় ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শ্বাসক' ও ইসলামী জ্ঞানের নেতৃত্ব' এ ব্যাপারে শীয়াদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতগণই (আ.) ঐ দু'টি বিষয়ে নেতৃত্বের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন । শীয়াদের বক্তব্য ছিল, ইসলামী খেলাফত পদের জন্য 'বিলায়াত' ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের যোগ্যতা একান্ত অপরিহার্য শর্ত । আর এ শর্ত একমাত্র

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পবিত্র সন্তানদের মধ্যে বিদ্যমান । কেননা, এ ব্যাপারে স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং তার পবিত্র আহলে বাইতের বারজন ইমামের (আ.) সুস্পষ্ট ব্যাখা রয়েছে । শীয়ারা বলতঃ পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত ও আইন কানুন, এবং একই ভাবে মানুষের পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক জীবন বিধান সম্বলিত, যা মৌলিকত্ব ও একান্ত গুরুত্বের দাবীদার । কেয়ামত পর্যন্ত এই কুরআন ও শরীয়ত কখনও বাতিল হবে না । ইসলামী শরীয়তের এই আইন কানুন একমাত্র রাসূল (সা.)- এর আহল বাইতের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত ।

এখান থেকেই দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়া ও যাইদিয়াদের মূল পর্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । যাইদিয়াগণ মূলত ইমামতের বিষয়টিকে পবিত্র আহলে বাইতের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করে না এবং ইমামদের সংখ্যা বারজনের মধ্যে নির্ধারিত বলেও বিশ্বাস করে না । একই ভাবে তারা পবিত্র আহলে বাইতের ফেকাহর অনুসরণ করে না যা দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের সম্পূর্ণ বিরোধী বিশ্বাস । অপর দিকে যাইদিয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, ইমামত ও নবুয়ত সাতটি সংখ্যার মধ্যে নিয়মিত আবর্তিত হয় এবং নবুয়ত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মধ্যে এসে শেষ হয়নি । ইসলামী শরীয়তের আইন- কানুন পরিবর্তন ও বাতিলের যোগ্য এবং ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মূল দায়িত্ব রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'গুপ্তপন্থী'দের (বাতেনী) দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই! অথচ দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- ই সর্বশেষ নবী এবং বারজন ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর পরে তার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত´ হবেন । শরীয়তের বাহ্যিক কাঠামোই নির্ভরযোগ্য এবং চির অপরিবর্তনশীল । আর তারা কুরআনের বাহ্যিক ও অন্তস্থ রূপ, দুটোতেই বিশ্বাসী । আলোচনার পরিসমাপ্তি: শেইখিয়ে ও কারিম খান গোষ্ঠিদ্বয় গত দু'শতাব্দী থেকে দ্বাদশপন্থী শীয়াদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে । উপরোক্ত উপদল সমূহের সাথে সূত্রগত সামান্য কিছু বিরোধ ছাড়া মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকায় তাদেরকে এখানে একটি স্বতন্ত্র উপদল হিসেবে পরিগণিত করা হয়নি । একই ভাবে দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের আরেকটি উপদল যাদেরকে গুপ্তপন্থী ইসমাঈলীয়া শীয়াদের মত 'গুলাত' বা বিচ্যুত বলা হয়ে থাকে । যারা কেবল মাত্র শরীয়তের অন্তস্থরূপে বিশ্বাসী তাদের এ জাতীয় বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রকারের সুশৃংঙ্খল

যুক্তি উপস্থাপন করতে তারা অক্ষম । তাই তাদেরকেই এখানে একটি স্বতন্ত্র উপদল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি ।

## দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পূর্ববর্তী দুটো অধ্যায়ে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, শীয়াদের বৃহত্তর জন গোষ্ঠিই 'দ্বাদশ ইমামপন্থী' শীয়া মাযহাবের অনুসারী । এরা মূলতঃ হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর একান্ত ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন । মহানবী (সা.)- এর পরলোক গমনের পর রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ও ইসলামী জ্ঞানগত নেতৃত্বের বিষয়ে রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন শ্বাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদ করার মাধ্যমে এরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে পড়ে । খেলাফায়ে রাশেদীনের যুগে (হিজরী ১১- ৩৫ সন) শ্বাসক গোষ্ঠির দ্বারা শীয়ারা প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপের মুখে দিনাতিপাত করে । এরপর উমাইয়া খলিফাদের যুগে (হিজরী ৪০- ১৩২ সন) শীয়ারা জান- মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা সার্বিক ভাবে হারিয়ে ফেলে । কিন্তু অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, তাদের মৌলিক বিশ্বাসও ততই দৃঢ়তর হতে থাকে । বিশেষ করে তাদের ঐ অসহায়ত্ব ও অত্যাচারীত অবস্থা তাদের নিজস্ব মতাদর্শগত উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখতে সমর্থ হয় । এরপর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসিয়রা যখন খেলাফতের মসনদ দখল করে, শীয়ারা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঐ মধ্যবর্তী সুযোগে কিছুটা হলেও স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার প্রয়াস প্রায়। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই তাদের ভাগ্য আবার সংকুচিত হয়ে এলো । আর এ অবস্থা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন শীয়া মতাদর্শের অধিকারী 'আলে- বুইয়া' বংশ শাসন ক্ষমতা দখল করে, শীয়ারা এই প্রথম বারের মত শক্তি অর্জন করার প্রয়াস প্রায় । ঐ সময় তারা ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা ও সুযোগ ভোগ করে । তখন তারা প্রকাশ্যে ভাবে স্বীয় মতাদর্শ

রক্ষার সংগ্রামে অবতির্ণ হয় । এ অবস্থা হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । আর হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগলদের ইসলামী দেশ সমূহ আক্রমন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী ক্রসেডের যুদ্ধ অব্যাহত থাকার কারণে তদানিন্তন ইসলামী শ্বাসকগোষ্ঠি শীয়া বিশ্বের উপর রাজনৈতিক বা সামরিক চাপ প্রয়োগের তেমন একটা সুযোগ পায়নি । এ ছাড়াও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু মোগল সম্রাটের শীয়া মাযহাবে দীক্ষিত হওয়া, মাযেন্দারান শীয়াপন্থী 'মারআশী' বংশীয় রাজত্ব এবং সর্বত্র শীয়া জনগোষ্ঠীর ব্যাপক বিস্তৃতি শীয়া মাযহাবকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করে । যার ফলে ইসলামী বিশ্বের আনাচে কানাচে এবং বিশেষ করে ইরানের লক্ষ লক্ষ শীয়া জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুভুত হতে থাকে । আর এ অবস্থা হিজরী নবম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । এরপর হিজরী দশম শতাব্দীর শুরুতে ইরানের শীয়াপন্থী 'সাফাভী' বংশীয় রাজত্বের উত্থান ঘটে । তারা বৃহত্তর ইরানের শ্বাসনের সুযোগ পায় । এই সময়ে শীয়া মাযহাব রাষ্ট্রিয় ভাবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা এখনও (হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত) অব্যাহত আছে । এ ছাড়াও বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি শীয়া বাস করছে ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## শীয়াদের ধর্মীয় চিন্তাধারা

**ধর্মীয় চিন্তাধারার সংজ্ঞা**

ধর্মীয় চিন্তাধারা বলতে এখানে সেসব বিষয়ের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা, আলোচনা ও অনুসন্ধিসাকে বোঝায়, যা ধর্ম সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত বা ফলাফল প্রদান করে । যেমনি ভাবে গণিত সংক্রান্ত চিন্তাধারা বলতে সেই চিন্তা ধারাকেই বোঝায়, যা গণিত সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করে, অথবা গণিত সংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করে ।

ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল উৎস

অন্য যে কোন বিষয়ক চিন্তা ধারার মত ধর্মীয় চিন্তা ধারারও উৎস থাকা প্রয়োজন, যা থেকে চিন্তাধারা উৎসারিত হবে এবং যার উপর তা হবে নির্ভরশীল । যেমন : গণিত সংক্রান্ত কোন একটি সমস্যা সমাধানের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে গণিত সংক্রান্ত কিছু সূত্র ও জ্ঞান কাজে লাগাতে হয়, যা শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোন কারিগরি বিষয়ে গিয়ে সমাপ্ত হয় । ধর্মীয় চিন্তাধারার ব্যাপারে ঐশী ধর্ম ইসলাম একমাত্র যে জিনিসটিকে নির্ভরযোগ্য ও মূল উৎস হিসেবে ঘোষণা করেছে, তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন । পবিত্র কুরআনই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চিরন্তন নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ । ইসলামের প্রতি আহবানই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু । অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কুরআনকে একমাত্র মূল উৎস বলার অর্থ এটা নয় যে, এ সংক্রান্ত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য উৎসগুলোকে অস্বীকার করা । এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব ।

**কুরআন নির্দেশিত ধর্মীয় চিন্তা ধারার নিয়ম- নীতি**

ধর্মীয় লক্ষ্যে পৌছা এবং ইসলামী জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা তার অনুসারীদেরকে তিনটি পদ্ধতি উপহার দেয় । সেগুলো হচ্ছে: নিষ্ঠা, দাসত্ব বা আনুগত্যের

মাধ্যমে ধর্মের বাহ্যিকরূপ, বুদ্ধিমত্তাগত দলিল, ও আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি । ব্যাখ্যা : আমরা যদি পবিত্র কুরআনের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় যেমনঃ তৌহীদ (একত্ববাদ), নবুয়ত, মা'আদ (কেয়ামত) এবং ব্যবহারিক আইন কানুন সংক্রান্ত বিষয়, যেমনঃ নামায, রোযা..... ইত্যাদি নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলার আহবান জানানো হয়েছে । একইভাবে কিছু কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে । কিন্তু সেখানে মহান আল্লাহ স্বীয় বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেনি । বরং স্বীয় প্রভুত্বের ক্ষমতা সেখানে খাটানো হয়েছে । মহান আল্লাহ যদি পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত তার শাব্দিক বক্তব্যগুলোকে নির্ভরযোগ্যতা (প্রামাণ্য) ও গুরুত্ব প্রদান না করতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি মানুষের কাছ থেকে ঐ ব্যাপারে আনুগত্য কামনা করতেন না । তখন বাধ্য হয়ে তিনি বলতেন যে, কুরআনের এ ধরণের সাধারণ বক্তব্যসমূহ ধর্মীয় লক্ষ্যসমুহ এবং ইসলামী জ্ঞান অনুধাবন করার একটি পদ্ধতি মাত্র । আমরা পবিত্র কুরআনের এ ধরণের শাব্দিক বর্ণনা গুলোকে (ঈমান আনো আল্লাহর এবং তার রাসূলের প্রতি) ও (নামায প্রতিষ্ঠা কর) ইসলামের বাহ্যিক দিক বলে গণ্য করি । অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনে তার প্রচুর আয়াত বুদ্ধিমত্তাগত প্রমাণের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছে । পবিত্র কুরআন মানুষকে আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ এ বিশ্বে ও তাতে বসবাসরত জাতিসমুহ সম্পর্কে সুগভীর চিন্তা ভাবনা করার আহবান্ জানায় । এ ছাড়া স্বয়ং আল্লাহর প্রকৃতপক্ষে সত্য প্রমাণের জন্য বুদ্ধিমত্তাগত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনার আশ্রয় নিয়েছেন । সত্যি বলতে কি, বিশ্বের কোন ঐশী পুস্তকই পবিত্র কুরআনের মত যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না । পবিত্র কুরআন এসব বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তাগত দলিল ও স্বাধীন যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণের বিষয়কে নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত বলে গণ্য করে । কুরআন কখনও প্রথমে ইসলামী জ্ঞানের সত্যতা গ্রহণ করে অতঃপর বুদ্ধিমত্তা প্রসূত যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সেগুলো যাচাই করার আহবান জানায় না । বরঞ্চ, বাস্তবতার প্রতি পূর্ণ আস্থা সহ কুরআন বলেঃ বুদ্ধিবৃত্তিগত যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে যাচাই- বাছাইর মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানমালা অর্জন ও গ্রহণ কর । যখন ইসলামের আহবান্ শুনতে পাবে, তখন

তা যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নেবে। অর্থাৎ যুক্তিভিত্তিক দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানাবলী অর্জন ও গ্রহণ বা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। প্রথমে তার প্রতি ঈমান এনে তারপর স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ আনার চেষ্টা করবে না। এরপর দার্শনিক চিন্তাধারারও পথ আছে, যা পবিত্র কুরআনও সমর্থন করে। অন্য দিকে পবিত্র কুরআন তার চমৎকার বর্ণনার মাধ্যমে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট করেছে যে, সকল সত্য ভিত্তিক জ্ঞানই তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং সর্বস্রষ্টা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়গত জ্ঞান থেকেই উৎসারিত। পরিপূর্ণ খোদা পরিচিতি লাভ একমাত্র তাদের জন্যেই সম্ভব, যাদেরকে মহান প্রভু নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজেই ঐ সকল বিশেষ বিশ্বাস নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। আর তারা হচ্ছেন সেসব ব্যক্তি, যারা সবার থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে ভুলে গেছেন। অতঃপর হৃদয়ের সততা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের সকল শক্তিকে একমাত্র সর্বস্রষ্টা আল্লাহর প্রতি বিনিয়োগ করেছেন। মহাপ্রভু আল্লাহর পবিত্র জ্যোতিচ্ছটায় তারা তাদের দৃষ্টিকে জ্যোতির্ময় করেছেন। তারা তাদের বাস্তব দৃষ্টিতে বস্তু নির্ণয়ের নিগুঢ়তত্ব এবং আকাশ ও পৃথিবীর ঐশী রহস্য আবলোকন করেছেন। কারণঃ আত্মিক নিষ্ঠা ও উপাসনার মাধ্যমে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত হয়েছেন। আর 'দৃঢ় বিশ্বাসের' (ইয়াকীন) স্তরে উন্নতি হওয়ার কারণে এ আকাশ, পৃথিবী ও অনন্ত জীবনের গোপন রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতগুলো এ বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

(ক) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশ দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।[১০২] (সূরা আল্ আম্বিয়া ২৫ নং আয়াত।)

(খ) তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তবে কেবল মাত্র 'সত্যনিষ্ঠ' বান্দারা ব্যতীত।[১০৩] (সূরা আল্ সাফাত ১৫৯ নং আয়াত থেকে ১৬০ নং আয়াত পর্যন্ত।)

(গ) বলুনঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি পত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে,

সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে ।[১০৪] (সূরা আল্ কাহাফ ১১০ নং আয়াত ।) (ঘ) এবং পালনকর্তার ইবাদত কর যে পর্যন্ত তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান না আসে । (সূরা আল্ হিজর ৯৯ নং আয়াত ।)

(ঙ) আমি এ রূপেই ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়ে ছিলাম, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় ।[১০৫] (সূরা আল্ আনয়াম ৭৫ নং আয়াত ।)

(চ) কখনও না, নিশ্চয় সৎ লোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একে প্রত্যক্ষ করে ।[১০৬] (সূরা আল্ মুতাফফিফিন ১৮ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত )

(ছ) কখনও নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের অধীকারী হতে তবে অবশ্যই জাহান্নামকে (এই পৃথিবীতেই) দেখতে পেতে ।[১০৭] (সূরা আত তাকাসুর ৫ ও ৬ নং আয়াত ।)

অতএব এখান থেকে প্রমাণিত হল যে, ঐশী জ্ঞান উপলব্ধির একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে আত্মশুদ্ধি ও উপাসনায় আত্মিক নিষ্ঠা রক্ষা করা ।

পূর্বে উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির পারস্পরিক পার্থক্য পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পবিত্র কুরআন ইসলামী শিক্ষা উপলব্ধির জন্যে তিনটি পদ্ধতি (ইসলামের বাহ্যিকরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি ও উপাসনা) উপস্থাপন করেছে । তবে এটাও জানা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন দিক থেকে এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ।

**প্রথমত :** ইসলামের বাহ্যিক দিক অর্থাৎ শরীয়তি বিধান, যা অত্যন্ত সহজ ভাষায় শাব্দিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যা সর্ব সাধারণের নাগালে রয়েছে । প্রত্যেক ব্যক্তি তার বোধশক্তির মাত্রা অনুযায়ী তা থেকে উপকৃত হয় ।[১০৮] এই প্রথম পদ্ধতিটি অন্য দুটি পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । কারণ অন্য দুটি পদ্ধতি সব সাধারণের জন্যে নয় । বরং তা বিশেষ একটি গোষ্ঠিরজন্য ।

**দ্বিতীয়ত :** প্রথম পদ্ধতিটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক ও গৌণ বা শাখা-প্রশাখাগত অংশের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় । আর এর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বাসগত ও ব্যবহারিক (জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের মূলনীতি) জ্ঞান অর্জন করা যায় । তবে অন্য পদ্ধতি দুটি

(বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মশুদ্ধি) এমন নয় । অবশ্য যদিও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও শিষ্টাচারগত এবং ব্যবহারিক বিষয় (শরীয়তের বিধান) সম্পর্কে সামষ্টিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব । তবে ঐসবের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ও খুঁটি- নাটি ব্যাপারগুলো বুদ্ধিবৃত্তির নাগালের বাইরে । একইভাবে আত্মশুদ্ধির পথ, যার মাধ্যমে সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচন ঘটে, তা হচ্ছে খোদাপ্রদত্ত একটি কাজ । খোদাপ্রদত্ত ঐ বিষয়ের পরিণতিতে বিশ্বের সকল গুপ্তরহস্য মানুষের কাছে উদঘাটিত ও দৃশ্যমান হয়, যার কোন সীমা বা পরিসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । কেননা এ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বিশ্বের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর অন্য সবকিছুকেই সে ভুলে যায় । ঐ অবস্থায় সে সরাসরি এবং স্বয়ং আল্লাহর বিশেষ 'বিলায়াত' ( কর্তৃত্ব ) ও তত্বাবধানে থাকে । তখন আল্লাহ যা কিছু চান (ব্যক্তি ইচ্ছায় নয়), তাই তার কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ।

## প্রথম পদ্ধতি

## ইসলামের বাহ্যিক অংশ ও তার প্রকারভেদ

যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অংশকে এর অধ্যয়ন ও শ্রবণকারীদের জন্যে অনুসরণযোগ্য হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন । আর পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)- এর বাণীকেও মাননীয় দলিল ও প্রমাণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন । তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : "তোমার কাছে কুরআন অবতির্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে, যা তাদের প্রতি অবতির্ণ করা হয়েছিল ।" ( সূরা আন্ নাহল, ৪৪ নং আয়াত ।)

পবিত্র কুরআনে তিনি আরও বলেছেন : "তিনি তাদের মধ্য থেকেই (গোত্রীয়) একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল হিসেবে। যে তাদের কাছে তার আয়াত আবৃতি করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল্ জুমআ, ২ নং আয়াত।)
আল্লাহ আরও বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আল্ আহজাব, ২১ নং আয়াত।)
এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, মহানবী (সা.)- এর বাণী, আচরণ, অনুমোদন এবং নিরবতা যদি পবিত্র কুরআনের মতই আমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ না হত, তাহলে পবিত্র কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াত গুলোর অর্থ আদৌ সঠিক হত না। সুতরাং যে কেউ সরাসরি মহানবী (সা.)- এর কোন বানী শ্রবণ করবে, অথবা নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র থেকে তার কাছে বর্ণিত হবে, তখন তার জন্যে অবশ্য অনুকরণীয় বলে গণ্য হবে। একইভাবে মহানবী (সা.)- এর "মুতাওয়াতের" হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.)- এর আহলে- বাইতের বাণীও রাসূল (সা.)- এর বাণীর মতই নির্ভরযোগ্য ও অবশ্য অনুকরণীয়। এভাবে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত মহানবী (সা.)- এর হাদীস দ্বারা আহলে- বাইতের হাদীসের আনুগত্যের অপরিহার্যতা প্রমাণিত। রাসূল (সা.)- এর আহলে- বাইতগণ ইসলামী জ্ঞান জগতের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন রয়েছেন। ইসলামী জ্ঞান ও বিধান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। তাদের যে কোন মৌখিক বক্তব্যই আমাদের জন্যে নির্ভরযোগ্য দলিল ও প্রমাণ স্বরূপ। উপরোল্লিখিত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ইসলামের বাহ্যিক অংশ, যা একটি মৌলিক সূত্র বা উৎস হিসেবে গণ্য তা দু'ধরণের : (১) পবিত্র কুরআন ও (২) সুন্নাত।
এখানে 'পবিত্র কুরআন' বলতে, কুরআনের সুস্পষ্ট ও বাহ্যিক অর্থ সম্পন্ন আয়াতগুলোকে বোঝান হচ্ছে। আর 'সুন্নাত' বলতে, মহানবী (সা.) এবং তার পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) হাদীসকেই বোঝান হচ্ছে।

**সাহাবীদের হাদীস**

সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসও যদি মহানবী (সা.)- এর বাণী ও কাজের অনুরূপ এবং পবিত্র আহলে বাইত (আ.)- এর হাদীসের বিরোধী না হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে । কিন্তু সাহাবীদের ঐসব হাদীস যদি তাদের নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না । ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সাহাবীরাও অন্য সকল সাধারণ মুসলমানদের মতই । এমনকি স্বয়ং সাহাবীরাও তাদের নিজেদের মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের মতই আচরণ করেছেন ।

## পবিত্র কুরআন ও সুন্নতে 'মুজাদ্দিদ' সংক্রান্ত আলোচনা

পবিত্র কুরআনই ইসলামী চিন্তাধারার একমাত্র মূলভিত্তি ও উৎসস্বরূপ । আর একমাত্র কুরআনই ইসলামের অন্যান্য মূল ভিত্তিগুলোকে নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী । এছাড়া পবিত্র কুরআন নিজেকে জ্যোতি ও অন্যদের জ্যোতির্ময় হিসেবে বর্ণনা করেছে । কুরআন মানব জাতিকে চালেঞ্জ করে আরও বলেছে যে, তারা যদি সুগভীর ভাবে কুরআনকে পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা ঐ কুরআনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী কোন বিষয় খুজে পাবে না। কুরআন মানব জাতিকে চালেঞ্জ করে আরও বলেছে যে, যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে কুরআনের মুকাবেলায় কুরআনের মতই আরেকটি গ্রন্থ রচনা করে নিয়ে আসুক । পবিত্র কুরআন যদি সর্ব সাধারণের জন্যে বোধগম্যই না হত, তাহলে মানবজাতির উদ্দেশ্যে কুরআনের এধরণের বক্তব্য প্রদানই বৃথা বলে গণ্য হত । অবশ্য এটা কারও ভাবাও উচিত নয় যে, কুরআনের এ বিষয়টি (কুরআন নিজেই সকলের জন্যে বোধগম্য) এর পূর্ববর্তী বিষয়ের [মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র আহলে বাইতগণ কুরআনে বর্ণিত ইসলামী জ্ঞান ও তার নিগূঢ়তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আরোহনের মূল উৎস] সাথে অসংগতিপূর্ণ । কারণঃ ইসলামী বিধানের শুধুমাত্র মূল বিষয়গুলোই সংক্ষিপ্ত আকারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে । আর তার বিস্তারিত ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখার জন্যে আমাদেরকে সুন্নাত তথা মহানবী (সা.) ও তার আহলে বাইতগণের হাদীসের

মুখাপেক্ষী হতে হয় । যেমন : নামায, রোযা, ক্রয়- বিক্রয়, বিচার সহ ইবাদত সংক্রান্ত সকল বিষয়েই আমাদেরকে সুন্নাত বা রাসূল (সা.) ও তার আহলে বাইতদের হাদীসের প্রতি নির্ভর করতে হয় । আর মৌলিক বিশ্বাস ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অর্থ ও ব্যাখা যদিও মোটামুটিভাবে সর্ব সাধারণের বোধগম্য, তথাপি এ ব্যাপারে একমাত্র আহলে বাইতগণের (আ.) গৃহীত পদ্ধতিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে । কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াতের দ্বারা ব্যাখা করতে হবে । নিজেদের মনমত তাফসীর বা ব্যাখা করা যাবে না । পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অভ্যস্ত মনের ইচ্ছেমত ব্যাখা করা যাবে না । হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতের ব্যাখা স্বরূপ । কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ ।[১০৯] আর মহানবী (সা.) বলেছেন : কুরআনের কিছু অংশ অন্য কিছু অংশের জন্যে ব্যাখা বা বাস্তব নমুনা স্বরূপ ।[১১০]

মহানবী (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের ব্যাখা করবে, এর মধ্যে সে, নিজেই নিজের জন্যে জাহান্নামে বসবাসের স্থান নির্ধারণ করবে ।[১১১] কুরআনকে কুরআনের মাধ্যমে তাফসীরের একটি সহজ উদাহরণ হল : মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একস্থানে পাপিষ্ট লুত জাতির প্রতি অবতির্ণ ঐশী শাস্তির ব্যাপারে বলেছেন যে, আমি তাদের উপর খারাপ বৃষ্টি বর্ষণ করেছি ।[১১২] একই বিষয়ে কুরআনের অন্যত্র তিনি এ ব্যাপারটি শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমি তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করেছি ।[১১৩] এখানে উল্লেখিত প্রথম আয়াতটিকে দ্বিতীয় আয়াতের সাথে মিলিয়ে নিলেই অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । প্রথম আয়াতে উল্লেখিত খারাপ বৃষ্টি বলতে এখানে ঐশী প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণই বোঝানো হয়েছে । কেউ যদি সুক্ষ্মভাবে গবেষণার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে এবং সাহাবী ও তাবেঈন মুফাসসিরদের (তাফসীর কারক) হাদীস ও পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) হাদীস সমূহ পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, কুরআনকে কুরআনের মাধ্যমে ব্যাখার নীতি একমাত্র পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) অনুসৃত নীতি ছিল ।

# কুরআনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক

ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি যে, পবিত্র কুরআন তার শাব্দিক বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনি উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরে মৌলিক বিশ্বাস ও ব্যবহারিক বিষয়ে জনগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকে । তবে পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কেবল এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । বরং পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত এসব বাহ্যিক শব্দাবলীর কাঠামোতে এবং ঐসব উদ্দেশ্যের অন্তরালে এক সুগভীর ও প্রশস্ততর আধ্যাত্মিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বিরাজমান । কুরআনের ভিতর আপাতঃ লুকায়িত ঐসব গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধিকৃত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদের কাছেই বোধগম্য । পবিত্র কুরআনের ঐশী শিক্ষক মহানবী (সা.) বলেছেন : পবিত্র কুরআনে সুন্দর ও শুভপরিণতি সম্পন্ন একটি বাহ্যিক দিক ও সুগভীর এক আভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে ।[১১৪]

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন : পবিত্র কুরআনের একটি অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে, সেই অভ্যন্তরের ও অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে । এভাবে কুরআন সাতটি অভ্যন্তরীণ দিকের অধিকারী ।[১১৫] পবিত্র আহলে বাইতগণও (আ.) তাদের হাদীসে কুরআনের ঐ আভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ।[১১৬] উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহের মূলভিত্তি হচ্ছে কুরআনের সূরা আর রা'দের ১৭ নম্বর আয়াত , ঐ আয়াতে মহান আল্লাহ ঐশী রহমতর্ক বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন, যা আকাশ থেকে অবতির্ণ হয় । আর ঐ বৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল হল ভূপৃষ্ঠ ও তার অধিবাসীদের জীবন ধারণ শক্তি । ভূপৃষ্ঠের বর্ষিত ঐ বৃষ্টিধারা স্রোতাকারে প্রবাহিত হয় এবং তার প্রবাহ পথের স্থানসমূহ নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঐ জল প্রবাহ থেকে কিছুটা গ্রহণ ও ধারণ করে এবং প্রবাহ সৃষ্টি করে । ঐ জল প্রবাহের উপরিভাগ যদিও প্রচুর ফেনা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তথাপি তার তলদেশে রয়েছে সেই মৃতসঞ্জীবনী পানি, যা মানব জাতির জন্য অত্যন্ত উপকারী । পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত এই উদাহরণটি সেই ঐশী জ্ঞানধারার প্রতি ইংগিত করছে । যা থেকে মানুষ তার নিজ নিজ বোধশক্তি অনুসারে অর্জন ও ধারণ করে উপকৃত হতে পারে । আর ঐ ঐশী জ্ঞান

মানুষের আধ্যাত্মিক মৃতসঞ্জীবনী স্বরূপ, যা গ্রহণ ও ধারণের মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য হয় । এ পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা, সম্পূর্ণ রূপে জড়বাদী । জড়বস্তু এবং পৃথিবীর এ নশ্বর জড়জীবন ছাড়া আর কিছুর মৌলিকত্বেই তারা বিশ্বাস করে না । এ পার্থিব ষড়রিপুর তাড়নার দাসত্ব ছাড়া জীবনে অন্য কিছুতেই তারা মন দেয় না । পার্থিব ক্ষতি ছাড়া তারা আর কিছুকেই ভয় পায় না । অবশ্য এরা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন ধরণের অবস্থার অধিকারী । ঐশী জ্ঞানমালা থেকে এরা খুব বেশী যেটুক উপকৃত হয়, তা হল, মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে এরা মোটামুটি ভাবে একটা ধারণা গ্রহণ বা বিশ্বাস করে । আর ইসলামের ব্যবহারিক আইনগুলোকে অত্যন্ত শুষ্কভাবে এরা পালন করে । অবশেষে এরা এক আল্লাহকে পরকালীন পুরুস্কারের লাভে এবং পরকালীন শাস্তির ভয়ে উপাসনা করে । আবার এমন অনেক লোকও আছে, যারা তাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও খোদাপ্রদত্ত স্বভাবজাত সততার কারণে পার্থিব জীবনের ক্ষণকালীন আরাম আয়েশের প্রতি কখনও আসক্ত হয় না । জীবনের লাভ- ক্ষতি, মিত্রতা ও তিক্ততা তাদের জন্য প্রতারণামূলক কল্পনা বৈ আর কিছুই নয় । প্রাগৈতিহাসিক জাতিসমূহের "স্মরণ, যা অতীতের দুনিয়ালোভীদের ইতিহাস এবং আজকের গল্প স্বরূপ, তা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষা বৈ কিছুই নয় । আর ঐতিহাসিক শিক্ষা তাদের হৃদয়ে সবসময় এক প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে । স্বাভাবিকভাবেই তাদের পবিত্র হৃদয়গুলো সেই অবিনশ্বর জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে । এ নশ্বর পৃথিবীর বৈচিত্রময় সৃষ্টিনিচয়কে তারা সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিদর্শনের দৃষ্টিতেই পর্যবেক্ষণ করে মাত্র । এছাড়া এসব পার্থিব বিষয়কে তারা কখনো মৌলিক ও সার্বভৌম বলে বিশ্বাস করে না । আর তখন এ আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব স্রষ্টার অন্তহীন ও মহত্বের নিদর্শনবাহী নতুন এক ঐশীজগতের রহস্যের দ্বার তাদের প্রানে খুলে যায় । তখনই তারা আত্মিক উপলদ্ধির চক্ষু দিয়ে সর্বস্ব অবলোকন করে । তাদের পবিত্র হৃদয়গুলো এ সৃষ্টিজগতের মূলরহস্য উপলদ্ধির প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যায় । তখন এ পৃথিবীর লালসা আত্মলিপ্সার সংকীর্ণতায় বন্দী না হয়ে তাদের হৃদয়গুলো অন্তহীন ও মুক্ত মহাকাশে পাখা মেলে উড়তে থাকে । যখন তারা ঐশী ওহী মারফৎ শুনতে পায় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মূর্তি পূজাকে

নিষিদ্ধ করেছেন; তখন এ থেকে তারা বুঝতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। কারণঃ দাসত্ব ও মাথানত করাই আনুগত্যের নিগুঢ় অর্থ। এছাড়া তারা এটাও বুঝে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করা যাবে না এবং আর কারো প্রতি আশাও করা যাবে না। এর পর তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হয় যে, প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে না। একইভাবে যখন তারা শুনতে পায় যে, পবিত্র কুরআন নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে, যার বাহ্যিকরূপ হচ্ছে একটি বিশেষ প্রকৃতির উপাসনা; তখন তারা ঐ কুরআনের আদেশের মর্মার্থ স্বরূপ কায়মনো বাক্যে মহান আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনের মাধ্যমে প্রার্থনা করাকেই বোঝায়, শুধু তাই নয়, তারা সত্যের সম্মুখে নিজেকে একেবারেরই হীন ও নগন্য মনে করে এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই নিমগ্ন থাকাকে শ্রেয় বলে বিশ্বাস করে। এটা স্পষ্ট যে, উপরোল্লিখিত আদেশ ও নিষেধের উদাহরণই্ আধ্যাত্মিকতার অর্থ বহন করে না। তবে ঐ আধ্যাত্মিক তত্ব উপলদ্ধি একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব, যারা উদার দৃষ্টি ও চিন্তার অধিকারী এবং বিশ্ব দর্শনকে আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দর্শনের উপর অগ্রাধিকার দেয়। পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআনের নিগুঢ় আত্মিক অর্থ তার বাহ্যিক অর্থকে বাতিল করে না। বরং কুরআনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ কুরআনের আত্মার মত। এটা দেহস্থিত আত্মার ন্যায় যা দেহের সঞ্জীবনী শক্তি স্বরূপ। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও অনন্ত ধর্ম, ইসলাম সমাজ সংশোধনের বিষয়টিকে সবার উপরে অগধিকার দেয়। ইসলামের বাহ্যিক আইনসমূহ যা সমাজ সংস্কারক স্বরূপ। আর এর সহজ মৌলিক বিশ্বাস সমূহ যা এসব বাহ্যিক আইন সমূহের সংরক্ষকও প্রহরী স্বরূপ এগুলো সবই চির অপরিবর্তনশীল। আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের হৃদয় পবিত্র হওয়াই বড় কথা তার কার্যক্রমের প্রকৃতির কোন গুরূত্ব নেই। তাই সে সমাজের লোকেরা এক অরাজকতাপূর্ণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, এ ধরনের বিচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের

মাধ্যমে তারা জীবনে সফল ও সৌভাগ্যবান হবে? কিন্তু অপবিত্র কথন ও অসদাচরণের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করা কি করে সম্ভব ? অপবিত্র ও নোংরা চরিত্র ও কথন থেকে পবিত্র হৃদয়ের পস্ফুটন সম্ভব কি ? তাই মহান আল্লাহ বলেছেন : "উৎকৃষ্ট শহর, তার ফসল তারই প্রতিপালকের নির্দেশে (ভাল পরিমান) উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয় ।" (সূরা আল্ আ'রাফ ৫৮ নং আয়াত) । অর্থাৎ পবিত্র উৎস থেকেই পবিত্রের জন্ম আর অপবিত্রদের উৎস হল অপবিত্র । পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের একটি বাহ্যিক ও একটি আত্মিকরূপ রয়েছে । ঐ আত্মিকরূপেরও আবার বহু স্তর রয়েছে । একইভাবে পবিত্র কুরআনের ব্যাখাকারী হাদীসেরও ঐ একই ধরণের স্তর বিন্যাস রয়েছে ।

## কুরআনের "তা'উইল"

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীদের অধিকাংশের মধ্যে কুরআনের ব্যাপারে একটি বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল । আর তা হল এই যে, কোথাও যদি উপযুক্ত দলিল পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের কোন আয়াতের প্রচলিত বাহ্যিক অর্থকে ত্যাগ করে তার বিরোধী অর্থকেও সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে । এভাবে কুরআনের কোন আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে তার বিরোধী অর্থে রূপান্তরিত করাকেই 'তা' উইল' বলা হয় । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ধর্মীয়গ্রন্থ সমূহ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিতর্কের ঘটনা সম্বলিত গ্রন্থসমূহে এ ঘটনাটি ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয় । যেমন : ধর্মীয় কোন একটি বিষয়ে যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ আলেমগণ একমত হন, আর তা যদি পবিত্র কুরআনের এক বা একাধিক আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থিও হয় তাহলে কুরআনের ঐ আয়াত বা আয়াত সমূহের বাহ্যিক অর্থকে রূপান্তরিত করেন । এভাবে অন্য কোন দলিল দ্বারাও যদি কুরআনের আয়াত বা আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়,

তাহলে কুরআনের ঐ বাহ্যিক অর্থকে প্রয়োজনবোধে রূপান্তরিত করেন । এমনকি অন্য সময় দেখা গেছে যে, পরস্পর বিবাদমান দু'পক্ষ নিজেদের মতামত প্রমাণের স্বার্থে এক বা একাধিক কুরআনের আয়াতর্ক পরস্পর বিরোধী অর্থে রূপান্তরিত (তা'উইল) বা ব্যাখা করেছে । এমনকি দুঃখজনক ভাবে, এধরণের আচরণে শীয়ারাও কম-বেশী কিছুটা আক্রান্ত হয়েছে । যার উদাহরণ শীয়াদের বেশ কিছু 'কালাম' ( মৌলিক বিশ্বাস সংক্রন্ত) শাস্ত্র গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু যে বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও আহলে বাইতগণের (আ.) হাদীস সুগভীর ভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা'হল পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট, বোধগম্য ও সুমধুর বর্ণনা পদ্ধতির মধ্যে কখনও জটিল ও ধাধাঁ সদৃশ্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি । পবিত্র কুরআন তার বিষয়বস্তু শাব্দিক কাঠামোর গণ্ডি ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে তা জনগণের কাছে বর্ণনা করেনি । কিন্তু পবিত্র কুরআনের "তা'উইল" বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা কোন শাব্দিক অর্থের ব্যাপার নয় । বরং তা এমন কিছু নিগুঢ় রহস্য, যা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির উর্দ্ধে । আর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও ব্যবহারিক বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান তা থেকেই উৎসরিত । হা, কুরআনের সর্বত্রই "তা'উইলের" অস্তিত্ব বিদ্যমান । তবে সাধারণ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সরাসরি তা অনুধাবন করা সম্ভব নয় । আর শব্দের মাধ্যমে তা বর্ণনার যোগ্যও নয় । শুধুমাত্র আল্লাহর নবীগণ ও এবং সকল মানবীয় দোষ- ত্রুটি মুক্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত আওলিয়াগণ কুরআনের "তা'উইল" করতে সক্ষম । তারা আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে কুরআনের "তা'উইলের" নিগূঢ়তত্ব অর্জন করেন । কেয়ামতের দিন কুরআনের প্রকৃত "তা'উইলের" বিষয়টি সকল মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । ব্যাখ্যাঃ এটা সবারই জানা যে, মানুষ তার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে ভাষার বিভিন্ন শব্দসমূহ ব্যাবহার করতে বাধ্য হয়েছে । সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বজাতির কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে বাধ্য । এ জন্যেই সে শব্দ ও তার কানের সাহায্য কামনা করতে বাধ্য হয় । কখনও বা কমবেশী চোখের ইশারার সাহায্যও তাকে নিতে হয় । আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, একজন বধির ব্যক্তি কখনও একজন অন্ধব্যক্তির সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না । কারণঃ

একজন অন্ধ যা কিছু বলে, বধির ব্যক্তি তা শুনতে পায় না । আবার বধির ব্যক্তি তার হাতের ইশারায় যা কিছু বুঝাতে চায়, অন্ধব্যক্তি তা দেখতে পায় না । তাই কোন জিনিসের নাম করণ ও ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থই কার্যকর ছিল । বিভিন্ন বস্তু, অবস্থা ও পরিবেশর জন্য শব্দ রচিত হয়, যা আমাদের পঞ্চেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নির্ভরযোগ্য । তাই আমাদের প্রতিপক্ষ যদি পঞ্চেন্দ্রীয়ের কোন একটিরও অভাব ঘটে এবং আমারা যদি ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন একটি শব্দের অর্থ তাকে বোঝাতে চাই, তাহলে তা আমাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাড়ায় । তখন ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টি প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরণের উদাহরণের আশ্রয় গ্রহণ করি । তবুও সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় বিহীন প্রতিপক্ষকে ঐ বিশেষ শব্দ বা বিষয়টি বোঝানো সহজ হয় না । যেমনঃ কোন জন্মান্ধকে যদি আমরা আলো বা রংয়ের ব্যাপারটি বোঝাতে চেষ্টা করি, বা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে যদি যৌন সুখের বিষয়টি বোঝাতে চাই, তাহলে আমাদের বহু তুলনা মূলক উদাহরণের আশ্রয় নিতে হয় । তেমনি এ বিশ্ব জগতের এমন অনেক অজড় বিষয়ের অস্তিত্ব আছে, যা জড় জগতের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত । আর প্রতি যুগেই এই মানবজাতির মধ্যে হাতে গোনা অল্প ক'জন ছাড়া কেউই ঐ অজড় জগত অবলোকন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি । আর ঐ অজড় জগতের বিষয়াদি শব্দাবলীর কাঠামোত বর্ণনা করা বা সাধারণ চিন্তাশক্তি দিয়ে তা অনুধাবন ও উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয় । শুধুমাত্র তুলনামুলক ও সদৃশ্যসম কিছু উদাহরণ উত্থাপণ ছাড়া ঐসব বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা সম্ভব নয় ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আমি একে অবতির্ণ করেছি কুরআনরূপে, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার । নিশ্চয়ই এ কুরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লওহে - মাহফুজে । (সূরা আল্ যুখরূফ, ৩ ও ৪ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন : নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে গোপন কিতাবে, যারা পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না । (সূরা আল্ ওয়াকিয়াহ, ৭৭থেকে ৭৯ নং আয়াত ।)

একইভাবে মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র আহ্‌লে বাইতগণ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ হে আহলে বাইত মহান আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ রূপে পূতপবিত্র করতে। (সূরা আল্ আহযাব, ৩৩ নং আয়াত।)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রকৃত ও গূঢ়অর্থ উপলব্ধি করতে সাধারণ মানুষ অক্ষম। শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা পবিত্র ব্যক্তিগণ ছাড়া রহস্য উপলব্ধি অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। আর আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.)- ও আল্লাহর দ্বারা পবিত্র ব্যক্তিগণ।

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন : "কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যা (তাদের জ্ঞান বহির্ভূত) বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর (তাউইল) বিশ্লেষণ আসেনি। এমনি ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববতীরা অতএব লক্ষ্য করে দেখ যে কেমন হয়েছে পরিণতি।" ( সূরা আল্ ইউনুস ৩৯ নং আয়াত।)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেনঃ তারা কি এখন এর তা' উইলের অপেক্ষায় আছে যে, এর তা'উইল প্রকাশিত হোক? যেদিন এর তা' উইল প্রকাশিত হবে সেদিন পূর্বে যারা ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে : বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। (সূরা আল্ আ'রাফ, ৫৩ নং আয়াত।)

## হাদীস সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি

পবিত্র কুরআন যে হাদীস সংক্রান্ত বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, এ ব্যাপারে শীয়া মাযহাবসহ অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে খলিফাদের দ্বারা যে বাড়াবাড়ীর সূত্রপাত ঘটে এবং হাদীসের প্রসারের ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেঈনরা যে বাড়াবাড়ীর আশ্রয় নেন, ফলে হাদীস শাস্ত্র এক দুঃখজনক পরিণতির স্বীকার হয়। তার একদিকে খলিফা হাদীস লিখন ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং লিপিবদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া মাত্রই তা পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতেন, কখনও বা হাদীস বর্ণনাতেই বাধা প্রদান করতেন, এ কারণেই প্রচুর সংখ্যক হাদীস বিকৃতির স্বীকার হয়েছে।

আবার অন্য দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীগণ যারা মহানবী (সা.) এর উপস্থিতি উপলব্ধি ও তার বক্তব্য শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং সাধারণ মুসলমান ও খলিফাদের সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন তারা হাদীস প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন । এভাবে পরবর্তীতে তাদের কাজের পরিণতি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাড়ায় যে, কুরআনের উপর হাদীসের শাসন ও প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় । এমন কি কখনও কখনও হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের নির্দেশও বাতিল হয়ে যেত ।[১১৭]

অন্য সময় দেখা গেছে শুধুমাত্র একটি হাদীস শ্রবণের জন্য হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রমের মত অসংখ্য ঘটনা সে যুগে ঘটেছে । সে সময় ইসলাম বিরোধী অসংখ্য ব্যক্তি বাহ্যত ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী চেহারার অন্তরালে ইসলামের গৃহশত্রুতে পরিণত হয় । তারা অসংখ্য হাদীসের বিকৃতি সাধান ও জাল হাদীস তৈরীর মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার বিলোপ সাধান করে ।[১১৮] হাদীস শাস্ত্রকে ঐ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ইসলামী পণ্ডিতগণ, 'ইলমে রিজাল' ও 'ইলমে দিরায়াহ' নামক দুটি শাস্ত্রের গোড়া পত্তন করেন । এ দুটো শাস্ত্রের মাধ্যমে সত্য হাদীসকে বিকৃত ও জাল হাদীস থেকে পৃথক করা যেতে পারে । কিন্তু শীয়া সম্প্রদায় হাদীসের সূত্র পরীক্ষার পূর্বে তাকে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করাকে অবশ্য করণীয় বলে বিশ্বাস করে । শীয়া সূত্রে বর্ণিত মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) অসংখ্য হাদীস (যার সূত্র সমূহ অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য) আমাদের কাছে এসে পৌছেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, কুরআন বিরোধী যে কোন হাদীসই মূল্যহীন ।[১১৯] আর যে হাদীস কুরআনের বিষয়বস্তুর অনুকুলে একমাত্র তাই নির্ভরযোগ্য । আর এ ধরণের হাদীসের কারণে যেসব হাদীস কুরআনের পরিপন্থি, শীয়ারা তা মানা থেকে বিরত থাকে ।[১২০] একইভাবে যেসব হাদীস পবিত্র কুরআনের পরিপন্থি বা অনুকুলে হওয়ার বিষয় সুস্পষ্ট নয়, পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) নির্দেশ অনুযায়ী সেসব হাদীস গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে তারা নীরবতা অবলম্বন করে । অবশ্য শীয়াদের মধ্যেও এমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা আহলে সুন্নাতের

অনেকের মতই কোন যাচাই বাচাই ছাড়াই যে কোন হাদীস পাওয়া মাত্রই তার অনুসরণ করে থাকে ।

## হাদীস অনুসরণের ক্ষেত্রে শীয়াদের নীতি

মহানবী (সা.) অথবা পবিত্র আহলে বাইতের যেসব হাদীস কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তাদের কাছ থেকে শোনা হয়ে থাকে, তা কুরআনের নির্দেশের মতই মর্যাদা সম্পন্ন । কিন্তু যেসব হাদীস বিভিন্ন মাধ্যম পেরিয়ে আমাদের হাতে এসেছে, সে সব হাদীস অনুসরণের ক্ষেত্রে শীয়াদের নীতি নিম্নরূপ:

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, 'মুতাওয়াতির' হাদীস (যা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেয়) অথবা যে হাদীস অত্যন্ত বিশ্বস্ত কোন সূত্রে অর্জিত হয়েছে, তাই অনুসরণযোগ্য । উপরোক্ত দু'প্রকার হাদীস ছাড়া অন্য সব হাদীস (যেমন : খাবারে ওয়াহিদ) তেমন একটি নির্ভরযোগ্য নয় । তবে ইসলামী বিধানের কোন আইন প্রণয়ন[১২১] বা প্রমাণের ক্ষেত্রে দলিল হিসাবে 'মুতাওয়াতির' হাদীস ছাড়াও বিশ্বস্ত অ- মুতাওয়াতির (খাবারে ওয়হিদ) হাদীসও গৃহীত হয়ে থাকে । সুতরাং 'মুতাওয়াতির' যা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীস শীয়াদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ্য দলিল স্বরূপ । আর তা অবশ্য অনুসরণীয় । আর অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যদি আস্থাযোগ্য হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র ইসলামী আইনের ক্ষেত্রেই প্রমাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে ।

### ইসলামে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান

জ্ঞান অর্জন ইসলামের একটি ধর্মীয় কর্তব্য । মহানবী (সা.) বলেছেনঃ 'জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নর- নারীর জন্য ফরয' ।[১২২] আর এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত যেসব হাদীস রয়েছে, তা

থেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞান বলতে ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় ও তদসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের কথাই বোঝানো হয়েছে । আর তা' হলঃ

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)

২. নবুয়ত

৩. কেয়ামত (পুনরূত্থান দিবস)

আর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তার প্রয়োজন মাফিক ইসলামী আইন ও তার ব্যখ্যাসহ সে সংক্রান্ত প্রয়াজনীয় বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা তার অবশ্য কর্তব্য । অবশ্য এটা বলা বাহুল্য যে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে দলিল প্রমাণ সহ জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যেই সহজ । কিন্তু অকাট্য দলিল প্রমাণ সহকারে মূল কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামী আইন- কানুন প্রণয়ন ও প্রমাণ করার মত বিস্তারিত ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য সহজবোধ্য ব্যাপার নয় । এটা শুধুমাত্র অল্প কিছুসংখ্যক লোকের ক্ষেত্রেই সম্ভব । আর ইসলাম সাধ্যাতীত কোন কাজই দায়িত্ব হিসেবে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়নি । এ কারণেই দলিল প্রমাণ সহকারে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের বিষয়টিকে ইসলামে 'ওয়াজিবে কিফায়ী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । অর্থাৎ এ ধরণের ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন অল্প কিছুসংখ্যক লোকের জন্যেই এটা দায়িত্ব স্বরূপহ্ আর অন্যান্য লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে এ বিষয়ে তারা প্রয়োজন বোধে ঐসব ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হবে । জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানহীনদের শরণাপন্ন হওয়া' মূলনীতির উপরই উপরোক্ত নীতির মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত । ইসলামী আইন- শাস্ত্রে পারদর্শী বিশেষজ্ঞরা 'মুজতাহীদ' বা 'ফাকীহ' নামে পরিচিত । মুজতাহিদদের কাছে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়ে শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে মুজতাহীদদের অনুসরণকেই 'তাকলীদ' (অনুসরণ) বলা হয় । অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে কারও অনুসরণ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। (সূরা আল ইসরা, ৩৬ নং আয়াত।)

এটা সবার জানা থাকা প্রয়োজন যে, শীয়া মাযহাবে মৃতব্যক্তির তাকলীদের মাধ্যমে তাকলীদের সূচনা করা জায়েয নয়।[১২৩] অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইজতিহাদ সংক্রান্ত জ্ঞানে পারদর্শী নয়, তাকে অবশ্যই ইসলামী আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন না কোন মুজতাহিদের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে অবশ্যই তাকে কোন জীবিত মুজতাহিদের মতামতের শরণাপন্ন হতে হবে। সেক্ষেত্রে কোন মৃত মুজতাহিদের মতামতের অনুসরণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। ঐ মুজতাহিদ জীবিত থাকাকালীন সময়েই যদি ঐ ব্যক্তি কোন বিষয়ে তার মতানুসরণ করে থাকে তাহলে উক্ত মুজতাহিদের মৃত্যুর পরও সে ঐ পূর্বোক্ত মতের অনুসরণ অব্যাহত রাখতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে তাকে সমসাময়িক জীবিত অন্য কোন মুজতাহিদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে। আর এ বিষয়টি শীয়া মাযহাবের ইসলামী ফেকহ্ (আইন) শাস্ত্রের চিরঞ্জীব ও চিরন্তন হিসেবে টিকে থাকার ব্যাপারে একটি অন্যতম কারণ বটে। এ কারণে শীয়া মাযহাবের অসংখ্য ব্যক্তি একের পর এক ইজতিহাদি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ব্যাপারটি ভিন্ন ধরণের। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর দিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের 'ইজমা' (ঐক্যমত) অনুসারে চার জন মুজতাহিদের চার মাযহাবের কোন একটির অনুসরণকে ওয়াজীব হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঐ চার মাযহাব হচ্ছে: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব। তাদের মতে স্বাধীন ইজতিহাদ ও উপরোক্ত চারজন ফকীহ্ বা মুজতাহিদ ছাড়া অন্য কারও তাকলীদ বা অনুসরণ করা তাদের মতে বৈধ নয়। এর ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ফেকাহ্ বা আইন শাস্ত্রের গুণগতমান এখনও প্রায় সেই বারশত বছর পূর্বের অবস্থায় অবস্থান করছে। অবশ্য বর্তমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনেক আলেমই তথাকথিত 'ইজমা'র সিদ্ধান্ত মানেন না। তারা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের পক্ষপাতি এবং তার প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন।

## কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান এবং শীয়া মাযহাব

ইসলামী জ্ঞান মোটামুটি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) বুদ্ধিবৃত্তিগত জ্ঞান এবং (২) বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান। বর্ণনা ভিত্তিক জ্ঞান মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বর্ণিত জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল । যেমন : আরবী ভাষা, হাদীস, ইতিহাস ইত্যাদি । তবে বুদ্ধিগত জ্ঞান অন্য ধরণের । গণিত, দর্শন ইত্যাদি বুদ্ধিগত জ্ঞান বা বিদ্যার উদাহরণ । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআনই ইসলামের 'বর্ণনা' ভিত্তিক বিদ্যার মূল উৎস । অবশ্য এছাড়াও ইতিহাস, বংশ পরিচিতি শাস্ত্র এবং ভাষালংকার শাস্ত্রও এই ঐশী পুস্তকের এক অমূল্য অবদান । মুসলমানরা ইসলামী জ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা মেটানোর লক্ষ্যে এসব শাস্ত্রের চর্চা ও গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হন । ঐসব বিদ্যার মধ্যে মূলতঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং তার ব্যাকারণ, ভাষা অলংকার, অভিধানসহ ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল । এছাড়াও তাজবীদ (কুরআন উচ্চারণ বিধিশাস্ত্র), তাফসীর, হাদীস, রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই শাস্ত্র), দিরায়াহ্ (হাদীসের সত্যতা যাচাই শাস্ত্র), উসুল (ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলনীতি শাস্ত্র), এবং ফিকহ ও (ইসলামী আইন শাস্ত্র) এসবের অন্তর্ভুক্ত । শীয়ারাও ইসলামী জ্ঞানের উপরোক্ত শাখাগুলোর বিকাশ ও উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছে । এমনকি উক্ত জ্ঞানের শাখাসমূহে অনেকগুলোর প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন শীয়া মাযহাবের অনুসারী । যেমন: আরবী ব্যাকারণের 'নাহু' (শব্দের স্বরচিহ্ন নির্ণয়বিদ্যা) শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনাব আবুল আসাদ আদ দোয়ালী । ইনি ছিলেন রাসূল (সা.) এবং ইমাম আলী (আ.)- এর একজন সাহাবী । তিনি হযরত আলী (আ.)- এর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধনে এই শাস্ত্র রচনা করেন । আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'আলে বুইয়া' বংশীয় শীয়া রাজ্যের জনৈক শীয়া মন্ত্রী । তার নাম ছিল সাহেব বিন ই'বাদ ।[১২৪]

জনাব খলির বিন আহমাদ বসরী নামক জনৈক বিখ্যাত শীয়া শিক্ষাবিদ সর্বপ্রথম ‘আল আইন’ নামক আরবী ভাষার অভিধান রচনা করেন ।[১২৫] তিনিই আরবী ভাষায় ‘কাব্যের ছন্দপ্রকরণ শাস্ত্রও’ প্রথম আবিস্কার করেন । এ ছাড়াও আরবী ব্যাকারণের ‘নাহু’ (শব্দের স্বরচিহ্ন নির্ণয়, পদবিন্যাস প্রকরণ) শাস্ত্রের অসাধারণ ও বিখ্যাত পণ্ডিত জনাব ‘সিবাওয়াই’ ছিলেন শীয়া মাযহাবের অনুসারী । পবিত্র কুরআন পঠনের বিখ্যাত ও স্বতঃসিদ্ধ সাতটি পদ্ধতির মধ্যে ‘কিরাআতে আসেম’ অন্যতম যার সূত্রও হযরত আলী (আ.) ।[১২৬] পবিত্র কুরআনের তাফসীর (ব্যাখা) শাস্ত্রের অন্যতম মুফাচ্ছির ও বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস ছিলেন হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর শিষ্য । হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে আহলে বাইতগণ (আ.) ও শীয়াদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শীয়াদের পঞ্চম ইমাম [বাকের (আ.)] ও ষষ্ঠ [ইমাম জাফর সাদিক (আ.)] ইমামের সাথে আহলে সুন্নার মাযহাবের ইমামগণের জ্ঞানগত বিষয়ের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত ব্যাপার । এমনকি ‘উসুলে ফিকহ’ (ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্র) শাস্ত্রে শীয়াদের আশ্চর্য জনক উন্নতিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । জনাব ওয়াহীদ বেহবাহানীর (মৃত্যু - ১২০৫ হিঃ) যুগে এই শাস্ত্রে সাধিত উন্নতি, বিশেষ করে জনাব শেইখ মুরতাদা আনসারীর (মৃত্যু - ১২৮১ হিঃ) অবদান ইসলামী বিশ্বের এক নজির বিহীন ঘটনা, গুণগত মানের দিক থেকে যার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ‘উসুলে ফিকাহ’ শাস্ত্রের আদৌ কোন তুলনা করা চলে না ।

## দ্বিতীয় পদ্ধতি

## বুদ্ধিগত আলোচনা

## বুদ্ধিগত, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রীয় চিন্তা

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে পবিত্র কুরআন বুদ্ধিবৃত্তিগত চিন্তাধারাকে সমর্থন করে এবং একে ধর্মীয় চিন্তাধারার অংশ বলে গণ্যও করে । অবশ্য এর বিপরীতেও বুদ্ধিবৃত্তিগত চিন্তাধারাই মহানবী (সা.)- এর নবুয়ত ও তার সততাকে প্রমাণ করেছে । এছাড়া ঐশীবাণী কুরআনের বাহ্যিকরূপ, মহানবী (সা.) ও তার পবিত্র আহলে বাইতের পবিত্র বাণীকে বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য দলিলের সারিতে স্থান দেয়া হয়েছে । মানুষ খোদাপ্রদত্ত স্বভাব (ফিতরাত) অনুযায়ী যেসব বুদ্ধিবৃত্তিগত অকাট্য দলিলের সাহায্যে নিজস্ব মতামত প্রমাণ করার প্রয়াস পায় তা প্রধানত দু'ধরণের : (১) বুরহান (২) জাদাল বা তর্ক ।

বুরহানঃ এমন এক ধরণের দলিল, যার ভিত্তি বাস্তব সত্যের উপর রচিত । যদিও চাক্ষুষ অথবা দ্বিধাহীন না হয় । আরও সহজ ভাষায়, এমন কোন খবর যা মানবসত্তা তার খোদাপ্রদত্ত অনুভুতির মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য হিসেবে উপলদ্ধি করে । যেমনি ভাবে আমরা জানি তিন সংখ্যাটি পরিমাণ গত দিক থেকে চার হতে ক্ষুদ্র । এ জাতীয় চিন্তা প্রক্রিয়াও বুদ্ধিগত চিন্তার অন্তর্ভুক্ত । আর যদি ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার মাধ্যমে 'সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব ও পরিচালনার' সত্যতা বা বাস্তবতা উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটি হবে দার্শনিক চিন্তা । উদাহরণ স্বরূপ সৃষ্টির আদি, অন্ত ও বিশ্ববাসীর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ।

জাদালঃ তর্ক এমন একটি প্রমাণ পদ্ধতি যার প্রাথমিক ভিত্তির আংশিক বা সমস্তটাই শতঃসিদ্ধ বাস্তবতা থেকে সংগৃহীত হয় । যেভাবে প্রতিটি ধর্ম মাযহাবের মধ্যে প্রচলিত আছে । তারা তাদের অভ্যন্তরীণ মাযহাবী সূত্র প্রমাণে ঐ মাযহাবের শতঃসিদ্ধ মূলসূত্রের সাথে পরস্পর তুলনা করে থাকে । পবিত্র কুরআনও উপরোক্ত পদ্ধতিদ্বয়কে কাজে লাগিয়েছে । তাই পবিত্র কুরআনে ঐ পদ্ধতিদ্বয়ের ভিত্তিতে অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান ।

**প্রথমতঃ** পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বব্রম্ভান্ড ও বিশ্বের নিয়ম শৃংঙ্খলা সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার নির্দেশ দিয়েছে । শুধু তাই নয়, আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ঐশী নিদর্শন সমূহ আসমান,

জমিন, দিন, রাত, বৃক্ষ, প্রাণী, মানুষ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও গভীর চিন্তার নির্দেশ দেয় । এ জাতীয় চিন্তার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান প্রভু স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনাকে সমুন্নত ভাষায় প্রসংশা করেছেন ।

**দ্বিতীয়তঃ** সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক পদ্ধতিকে কালাম শাস্ত্রের একটি মাধ্যম হিসেবে গন্য করা হয় । তবে এই শর্তে যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় উপস্থাপন করা উচিত ।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায় ।" ( সূরা আন্ নাহল ১২৫ নং আয়াত ।)

## ইসলামে দর্শন ও কালামশাস্ত্রীয় চিন্তার বিকাশে শীয়াদের অবদান

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে জন্মলগ্ন থেকেই শীয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয় । ফলে সেদিন থেকেই বিরোধীদের মোকাবিলায় তাদেরকে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় । এ জন্যে তারা তর্কযুদ্ধে নামতে বাধ্য হন । স্বাভাবিক ভাবেই তর্কযুদ্ধের দু'পক্ষই সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করে । কিন্তু এ ক্ষেত্রে শীয়ারা সর্বদাই আক্রমণকারী এবং বিপক্ষীয়রা আত্মরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেছে । তাই এ তর্কযুদ্ধের সাজ- সরঞ্জাম আয়োজনের দায়িত্ব সাধারণত আক্রমণকারীকেই পালন করতে হয় । এভাবে 'কালাম' ( যুক্তি ভিত্তিক মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত শাস্ত্র) শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ঘটে । হিজরী ২য় শতক ও ৩য় শতকের প্রথম দিকে 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায়ের প্রসারের পাশাপাশি উক্ত কালামশাস্ত্র উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে । আর এক্ষেত্রে আহলে বাইতের আদর্শের অনুসারী শীয়া আলেম ও গবেষকগণের স্থান ছিল মুতাকাল্লিমদের ('কালাম' শাস্ত্রের পণ্ডিত) শীর্ষে । এছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের "আশআরিয়া" ও "মু'তাযিলা" সম্প্রদায়সহ কালাম শাস্ত্রের অন্য সকল পৃষ্ঠপোষকরাও সূত্র পরম্পরায় শীয়াদের প্রথম ইমাম হযরত ইমাম আলী

(আ.)- এ গিয়ে মিলিত হয় ।[১২৭] মহানবীর (সা.) সাহাবীদের জ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী ও অবদান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে (প্রায় বার হাজরের মত সাহাবীর মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে) তারা সবাই জানেন যে, এসবের একটিও আদৌ কোন দার্শনিক চিন্তাধারা প্রসূত নয় । এর মধ্যে কেবল মাত্র আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনাযুক্ত সর্বস্রষ্টা আল্লাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলীই সুগভীর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রসূত । সাহাবীগণ তাদের অনুসারী তাবেঈন আলেমগণ ও পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ এবং তদানিন্তন আরবরা মুক্ত দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে আদৌ পরিচিত ছিলেন না । এমনকি হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর ইসলামী পণ্ডিতগণের বক্তব্যেও দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার আদৌ কোন নমুনা খুজে পাওয়া যায় না । একমাত্র শীয়া ইমামদের বক্তব্য, বিশেষ করে প্রথম ও অষ্টম ইমামের বাণী সমূহেই সুগভীর দার্শনিক চিন্তাধারার নিদর্শন খুজে পাওয়া যায় । তাদের সেই মূল্যবান বাণী সমূহই দর্শনের অনন্ত ভান্ডার স্বরূপ । তারা একদল শিষ্যকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকৃতির সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলেছেন । হ্যাঁ, আরবরা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দর্শনের সাথে আদৌ পরিচিত ছিল না । অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক দর্শনের কিছু বই তাদের হাতে আসে । এরপর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষায় রচিত বেশ কিছু দার্শনিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হয়, এর ফলে আরবরা গণভাবে দার্শনিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসে । কিন্তু তদানিন্তন অধিকাংশ ফকিহ্ (ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ) এবং মুতাকাল্লিমগণই (কালাম শাস্ত্রীয় পণ্ডিত) নবাগত ঐ অতিথিকে (দর্শন ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিজাত জ্ঞান বিজ্ঞান) হাসি মুখে বরণ করেননি ।

দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিগত শাস্ত্রের বিরোধীতায় তারা তৎকালীন প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে ছিলেন । কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ বিরোধীতা বাস্তবে তেমন একটা কার্যকর হয়নি । কিছুদিন পরই ইতিহাসের পাতা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল । দর্শনশাস্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পাশাপাশি দর্শন সংক্রান্ত সকল বই পুস্তক সাগরে নিক্ষিপ্ত হল । 'ইখওয়ানুস সাফা' ( বন্ধু বৎসল ভ্রাতৃ সংঘ) নামক একদল অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচনাবলী (রিসাইলু ইখওয়ানুস সাফা) ঐসব ঘটনাবলীর সাক্ষী ও স্মৃতি বাহক ।

ঐসব ঘটনাবলী আমাদেরকে সে যুগের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির কথাই “স্মরণ করিয়ে দেয় । এর বহুদিন পর হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবু নাসের ফারাবীর মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্র পুনরায় জীবন লাভ করে । এরপর হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আবু আলী সীনার আপ্রাণ সাধনায় দর্শনশাস্ত্র সামগ্রিকভাবে প্রসার লাভ করে । হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে জনাব শেইখ সোহরাওয়ার্দী, আবু আলী সীনার অনুসৃত ঐ দার্শনিক মতবাদের সংস্কার ও বিকাশ সাধান করেন । আর এই অপরাধেই তিনি সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী কর্তৃক নিহত হন । এর ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মাঝে 'দর্শনের' যবনিকা পতন ঘটে । এরপর আর উল্লেখযোগ্য কোন দার্শনিকের সৃষ্টি হয়নি । হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামী খেলাফত সীমান্ত 'আন্দালুসে' (বর্তমান স্পেন) ইবনে রূশদ নামক এক ইসলামী দার্শনিকের জন্ম হয় । তিনিও ইসলামী দর্শনের সংস্কার ও বিকাশে আপ্রাণ সাধানা করেন ।[১২৮]

**দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বিকাশে শীয়াদের অন্তহীন প্রচেষ্টা**

দার্শনিক চিন্তাধারার সৃষ্টি ও বিকাশে শীয়া সম্প্রদায়ের অবদান তার উন্নতির ক্ষেত্রে এক বিরাট কারণ হিসেবে কাজ করেছিল । এ ছাড়াও এজাতীয় চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রেও শীয়া সম্প্রদায় ছিল মূলভিত্তি স্বরূপ । তারা এক্ষেত্রে অবিরামভাবে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে । তাই আমরা দেখতে পাই যে, ইবনে রূশদের মৃত্যুর পর যখন আহলে সুন্নাতের মধ্যে দার্শনিক চিন্তাধারার গণবিস্মৃতি ঘটে, তখনও শীয়া সম্প্রদায়ের মাঝে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবল গণজোয়ার পূর্ণোদ্দমে অব্যাহত ছিল । তারপর শীয়াদের মধ্যে খাজা তুসী, মীর দামাদ ও সাদরূল মুতাআল্লিহীন নামক বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিকদের অভ্যুদয় ঘটে । তারা একের পর এক দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন, বিকাশ সাধান ও তার রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । একইভাবে দর্শন ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খাজা তুসী, বীরজান্দিসহ আরও অনেক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটে । এসকল বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে অধিবিদ্যা [Metaphsics] শীয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সুগভীর উন্নতি সাধিত হয় ।

খাজা তুসী, শামসুদ্দীন তুর্কী, মীর দামাদ সাদরুল মুতাআল্লিহীনের রচনাবলীই এর সুস্পষ্ট উদাহরণ ।

### শীয়াদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্র টিকে থাকার কারণ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান চর্চার উদ্ভব ও বিকাশের মূলভিত্তির রচয়িতা ছিল শীয়া সম্প্রদায় । এর কারণ ছিল শীয়াদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডারের উপস্থিতি ।

আর ছিল শীয়াদের ইমামদের রেখে যাওয়া স্মৃতি স্বরূপ অমূল্য জ্ঞানভান্ডার । শীয়ারা আজীবন ঐ অমূল্য জ্ঞানভান্ডারকে অত্যন্ত পবিত্রতা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে । এ বক্তব্য প্রমাণের লক্ষ্যে পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) জ্ঞানভান্ডারকে এযাবৎ রচিত ঐতিহাসিক দার্শনিক গ্রন্থাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত । তাহলে আমরা দেখতে পাব যে ইতিহাসে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশধারা ক্রমেই আহলে বাইতগণের (আ.) জ্ঞানভান্ডারের নিকটবর্তী হয়েছে । এভাবে হিজরী একাদশ শতাব্দীতে এসে বর্ণনাগত সামান্য কিছু মতভেদ ছাড়া এ দু'টো ধারাই প্রায় সম্পূর্ণ রূপে মিলিত হয়ে গেছে ।

## কয়েকজন ক্ষণজন্মা শীয়া ব্যক্তিত্ব

### ক) সিকাতুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব কুলাইনী (মৃত্যু : ৩২৯ হিঃ) :

শেইখ কুলাইনী ছিলেন শীয়াদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি শীয়াদের সংগৃহীত হাদীসগুলোকে 'উসুল' ( মুহাদ্দিসগণ আহলে বাইতগণের (আ.) হাদীস সমূহকে 'আসল' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত করেন । 'আসল' এর বহুবচন 'উসুল') থেকে সংগ্রহ করে সেগুলোকে বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেন । ফিকহ্ (ইসলামী আইন) ও মৌলিক বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের ভিত্তিতে হাদীসগুলোকে সুসজ্জিত করেন । তার সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম 'কাফী' । এ গ্রন্থটি মূলত: তিনভাগে বিভক্ত : উসুল (মৌলিক বিশ্বাস অধ্যায়), ফুরূউ (ইসলামের আইন সংক্রান্ত

অধ্যায়) এবং বিবিধ অধ্যায় । উক্ত গ্রন্থে সংকলিত মোট হাদীস সংখ্যা ষোল হাজার, একশত নিরানব্বইটি ।

উক্ত হাদীস গ্রন্থই শীয়াদের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত । এ ছাড়া আরও তিনটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ রয়েছে যা, 'কাফী'র পরবর্তী পর্যায়ের । 'কাফীর পরবর্তী পর্যায়ে তিনটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

১. 'মান লা ইয়াহযুরুল ফাকীহ'

২. 'আত তাহযীব'

৩. 'আল ইসতিবসার'

'মান লা ইয়াহযুরুল ফাকীহ' নামক হাদীস গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন, জনাব শেইখ সাদুক মুহাম্মদ বিন বাবাওয়াই কুমী । তিনি হিজরী ৩৮১ সনে মৃত্যুবরণ করেন । 'আত তাহযীব' ও 'আল ইসতিবসার' নামক হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের সংকলক ছিলেন জনাব শেইখ তুসী । তিনি হিজরী ৪৬০ সনে মৃত্যু বরণ করেন ।

**খ) জনাব আবুল কাসিম জাফার বিন হাসান বিন ইয়াহইয়া হিল্লী ওরফে মুহাক্কিক :**

তিনি হিজরী ৬৭৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন । তিনি ফিকহ্ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) শাস্ত্রে এক অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন । তিনি ছিলেন শীয়া ফকিহদের কর্ণধার স্বরূপ । তাঁর রচিত ফিকহ্ শাস্ত্রীয় 'মুখতাসারুন নাঈম' ও আশ্ শারায়িঈ' অন্যতম । দীর্ঘ সাত শতাব্দী পার হওয়ার পরও এ দু'টো গ্রন্থ আজও ফকিহদের (ইসলামী আইনবিদ) বিস্ময় ও সম্মানের পাত্র হিসেবে টিকে আছে । জনাব মুহাক্কিকের পরই ফিকহ্ শাস্ত্রের জনাব 'শহীদে আউয়াল' ( ফকীহদের মধ্যে প্রথম শহীদ) শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মাক্কির নাম উল্লেগযোগ্য । হিজরী ৭৮৬ সনে শুধুমাত্র শীয়া মাযহাবের অনুসারী হওয়ার অপরাধে সিরিয়ার দামেস্কে তাকে হত্যা করা হয় । 'ফিকহ' শাস্ত্রে তার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আল্ লুমআতুদ্ দামেস্কীয়া'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি জেলে থাকাকালীন সময়ে মাত্র সাতদিনের মধ্যে এ গ্রন্থটি রচনা করেন । জনাব শেইখ জাফর কাশিফুল গিতা, তিনি হিজরী ১২২৭ সনে মৃত্যুবরণ করেন । তিনি ফেকহ্ শাস্ত্রে

শীয়াদের আরেকজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তার বিখ্যাত ‘ফিকহ’ গ্রন্থের নাম ‘কাশফুল গিতা’ ।

**গ) জনাব শেইখ মুর্তজা আনসারী শুশতারী (মৃত্যু - ১২৮১ হিঃ) :**

তিনি ‘ইলমূল উসুলের’ (ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলনীতি শাস্ত্র) সংস্কার সাধান করেন । ‘ইলমূল উসুলের’ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘ব্যবহারিক বিষয়ক মূলনীতি’ (উসুলুল আ’মালিয়াহ) অংশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধান ও পুস্তক আকারে তা রচনা করেন । তার রচিত ইতিহাস বিখ্যাত ঐ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থটি এক শতাব্দী পর আজও শীয়া ফকীহদের একটি অন্যতম পাঠ্য পুস্তক হিসেবে প্রচলিত ।

**ঘ) জনাব খাজা নাসির উদ্দিন তুসী (মৃত্যু - ৬৫৬ হিঃ) :**

তিনিই সর্বপ্রথম ‘কালাম’ শাস্ত্রকে (মৌলিক বিশ্বাস বিষয়ক শাস্ত্র) একটি পূর্ণাংগ শৈল্পিক রূপ দান করেন । তাজরীদুল কালাম নামক গ্রন্থটি তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর অন্যতম । আজ প্রায় সাত শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও ঐ গ্রন্থটি ‘কালাম’ শাস্ত্রের জগতে এক বিস্ময়কর গ্রন্থ হিসেবে নিজস্বমান বজায় রেখে চলেছে । এমন কি তার রচিত ঐ বিখ্যাত গ্রন্থটির ব্যাখা স্বরূপ বহু শীয়া ও সুন্নী পণ্ডিত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন । কালাম’ শাস্ত্র ছাড়া দর্শন ও গণিতশাস্ত্রে জনাব খাজা তুসী তার সমসাময়িক যুগের এক অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন । বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার রচিত অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থই একথার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য স্বরূপ । ইরানের ‘মারাগে’ অঞ্চলের বিখ্যাত ‘মাণমন্দিরটি’ তারই প্রতিষ্ঠিত ।

**ঙ) জনাব সাদরুদ্দিন মুহাম্মদ সিরাজী (জন্ম - হিঃ ৯৭৯ ও মৃত্যু : হিঃ ১০৫০ সন) :**

তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী দর্শনকে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থা থেকে মুক্তি দেন । তিনি ইসলামী দর্শনের বিষয়গুলোকে গণিতের মত একটি সুশৃংখল শাস্ত্রে রূপায়িত করেন । তার ঐ ঐতিহাসিক অবদানের ফলে ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্রে এক নবযুগ সাধিত হয় ।

**প্রথমতঃ** যেসব বিষয় ইতিপূর্বে দর্শনের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিলনা, তা তারই অবদানে দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ও তার সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

**দ্বিতীয়তঃ** ইসলামের আধ্যাত্মিকতা (ইরফান) সম্পর্কিত কিছু বিষয় যা ইতিপূর্বে সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উপলদ্ধির নাগালের বাইরে বলেই গণ্য হত, তাও খুব সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে ।

**তৃতীয়তঃ** কুরআন ও আহলে বাইতগণের (আ.) অনেক জটিল ও দূর্বোধ্য সুগভীর দার্শনিক বাণীসমূহ যা শতশত বছর যাবৎ সমাধানের অযোগ্য ধাঁধা ও 'মুতাশাবিহাত' (সংশয়যুক্ত দূর্বোধ্য বিষয়) বিষয় হিসেবে গণ্য হত, তারও সহজ সমাধান পাওয়া গেল । যার ফলে ইসলামের বাহ্যিক দিক, আধাত্মিকতা (ইরফান) ও দর্শন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হল এবং একই গতিপথে প্রবাহিত হতে শুরু করল । 'সাদরুল মুতা'আল্লিহীনের পূর্বেও হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'হিকমাতুল ইশরাক' গ্রন্থের লেখক জনাব শেইখ সোহরাওয়ার্দী এবং হিজরী অষ্টম শতাব্দীর দার্শনিক জনাব শামসুদ্দিন মুহাম্মদ তুর্কের মত প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । কিন্তু কেউই এপথে পূর্ণাংগ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি । একমাত্র জনাব 'সাদরুল মুতাআল্লিহীনই' এ ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন । জনাব সাদরুল মুতাআল্লিহীন, সত্তার গতি (হারাকাতে জওহারী) নামক মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন । 'চতুর্থদিক' (বো'দু রাবি'ই) ও 'আপেক্ষিকতা' সংক্রান্ত মতবাদও তিনিই আবিস্কার করেন । এ ছাড়াও তিনি প্রায় পঞ্চাশটির মত গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেন । তার অমূল্য অবদানের মধ্যে চার খণ্ডে সমাপ্ত 'আসফার' নামক বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থটি অন্যতম ।

# তৃতীয় পদ্ধতি

## অর্ন্তদর্শন বা ( ‘কাশফ’)

### মানুষ ও আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই জীবনের বস্তুগত চাহিদা মেটানোর স্বার্থে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে অথচ আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানোর জন্য সামান্য পরিশ্রমও করছেনা । তবুও এর পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই জন্মগত ভাবে ‘সত্য দর্শনের’ প্রবল বাসনা নিহিত রয়েছে । আত্মিক এ বাসনার অনুভুতি অনেক মানুষের মধ্যেই সক্রিয়, যার ফলে তা তাদেরকে এক প্রকারের আত্মিক উপলদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে । প্রতিটি মানুষই বাস্তবতায় বিশ্বাসী এমনকি বাস্তবতা অস্বীকারকারী ‘সুফিষ্ট’ ( যেমতে সত্যকে আপেক্ষিক গণ্য করা হয়) বা সংশয়বাদীরাও প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতায় বিশ্বাসী । মানুষ যখন স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়ে এ সৃষ্টিজগত অবলোকন করে তখন সে এ সৃষ্টিজগতের নশ্বরতা উপলদ্ধি করে । এসময়ে সে এ বিশ্বের সৃষ্টিকূলকে আয়না স্বরূপ দেখতে পায়, যার মধ্যে অবিনশ্বর বাস্তবতার সৌন্দর্য প্রতিফলিত দৃশ্যের অসহ্য সৌন্দর্য, তার দৃষ্টি থেকে অন্য যে কোন সৌন্দর্যকেই নগণ্য ও অম্লান করে দেয় । এ আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি পার্থিব জীবনের অস্থায়ী অথচ আপাত: মধুর বিষয়ের আস্বাদ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত রাখে । এটাই সেই আধ্যাত্মিক (ইরফানি) আকর্ষণ, যার ফলে স্রষ্টার প্রতি অনুরাগী মানুষের মনোযোগ আরও উচ্চতর জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় । তখন তা ঐশী যৌক্তিকতাকে মানুষের হৃদয়ে স্থান দেয় এবং এ ছাড়া অন্যসব কিছুই তখন সে ভুলে যায় । এসময় তার মনের অন্তহীন কামনা- বাসনার বিচ্ছেদ ঘটে । তখন সে দর্শন ও শ্রবণের চেয়েও স্পষ্টতর উপলদ্ধিযোগ্য অথচ বাহ্যতঃ অদৃশ্য স্রষ্টার উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে । অবশ্য এটা মানুষের হৃদয়ে লুকায়িত স্রষ্টাপুজার এক জন্মগত স্বভাব, যা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহর উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করে । সেই প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক পুরুষ, যে মহান আল্লাহকে কোন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা[১২৯] অথবা শাস্তির ভয় ছাড়াই শুধুমাত্র

ভালবাসার কারণেই আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করে । অতএব, এখান থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'ইরফান' বা আধ্যাত্মিকতাকে অবশ্যই ইসলামের বিভিন্ন মাযহাবের মতই অন্য একটি মাযহাব হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না । বরঞ্চ, ইরফান বা আধ্যাত্মিকতাতো আল্লাহর ইবাদতেরই একটি পন্থা । আর এটা (পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় বা শাস্তির ভয়ে নয়, বরঞ্চ ভালবাসার ভিত্তিতে ইবাদতের পন্থা) হচ্ছে ধর্মের বাহ্যিকরূপ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মীয় উপলব্ধির মোকাবিলায় ধর্মের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধির একটি পন্থা । এমনকি প্রতিটি ধর্মেই একটি আত্মিক পদ্ধতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে । যেমন : মূর্তি পুজারী, অগ্নি উপাসক, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও আধ্যাত্মবাদী ও অ- আধ্যাত্মবাদীদের অস্তিত্ব রয়েছে ।

## ইসলামে ইরফান বা আধ্যাত্মিকতার অভ্যুদয়

মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে ('ইলমে রিজালে'র গ্রন্থসমূহে প্রায় বারো হাজার সাহাবীর পরিচিতি লিপিবদ্ধ হয়েছে) একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পাঞ্জল বর্ণনাই 'ইরফানি' বা আধ্যাত্মিক নিগূঢ়তত্ব সম্পন্ন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের স্তরসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ইসলামের এক অমূল্য সম্পদ ভান্ডার । কিন্তু অন্যান্য সাহাবীদের বক্তব্য বা রচনায় এধরণের বিষয়ের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না । এমনকি হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর শিষ্যদের মত মহান শিষ্যও আর কারও ছিল না । যাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত রশিদ হাজারী (রা.), হযরত মাইসাম তাম্মার (রা.) অন্যতম । এযাবৎ পৃথিবীতে যত আরেফ বা আধ্যাত্মিক পুরুষই এসেছেন, সবাই হযরত আলী (আ.) এর পর উপরোক্ত মহান শিষ্যদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক গুরুদের তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছেন । ইসলামে আধ্যাত্মিক পুরুষদের উপরোক্ত স্তরের পরবর্তী স্তর দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে যারা জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের মতে তাউসে ইয়ামানী, মালিক বিন দিনার, ইব্রাহীম আদহাম, এবং শাকিক বালখীর নাম উল্লেখযোগ্য । তবে এরা আরেফ বা সুফী (আধ্যাত্মিক পুরুষ) হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরিবর্তে কৃচ্ছতা সাধানকারী (যাহেদ) হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করেন । এবং জনগণের কাছে ‘ওয়ালি আল্লাহ’ বা সতঃসিদ্ধ পুরুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন । কিন্তু এরা কোনক্রমেই নিজেদের আত্মগঠনের প্রক্রিয়ার বিষয়টিকে তাদের পূর্ববর্তী স্তরের মহান পুরুষদের সাথে কখনও সংশ্লিষ্ট করেননি । এর পরবর্তী স্তরে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে আরেকটি আধ্যাত্মবাদী দলের অভ্যুদয় ঘটে । জনাব বায়েজীদ বোস্তামী, মারূফ কিরখী, জুনাইদ বাগদাদী প্রমূখ এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত এরা সবাই আধ্যাত্মবাদের প্রক্রিয়ার অনুসারী ছিলেন এবং ‘আরেফ’ বা ‘সুফী’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । এরা সবাই ‘কাশফ’ (আত্মঃউপলদ্ধি) এবং শুহুদের’ (অর্ন্তদর্শন) ভিত্তিতে বক্তব্য প্রদান করেছেন । তাদের ঐধরণের কথা ইসলামে বাহ্যিকরূপের সাথে ছিল সাংঘর্ষিক । ফলে তাদের ঐসব কর্মকান্ড সমসাময়িক ‘ফকীহ’ (ইসলামী আইন বিশারদ) ও ‘মুতাকাল্লিমিন’দের (ইসলামী বিশ্বাস শাস্ত্রবিদ) তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে । যার পরিণতিতে তারা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন । তাদের অনেকের জেলে বন্দীজীবন কাটাতে হয় । অনেকেই নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন হন । আবার অনেকেরই ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে । এতকিছুর পরও তারা তাদের আধ্যাত্মবাদী প্রক্রিয়ার স্বপক্ষে বিরোধীদের সাথে লড়াই করে যেতে থাকেন । আর একারণেই তাদের ‘তরীকত’ বা আধ্যাত্মিকপন্থা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে । এভাবে সপ্তম ও অষ্টম হিজরী শতাব্দীতে এসে এই ‘তরীকত’ বা আধ্যাত্মবাদ পূর্ণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ লাভ করে । এরপর তখন থেকে আজ পর্যন্ত আধ্যাত্মবাদ কখনওবা শক্তিমত্তার সাথে আবার কখনও দূর্বলাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে । আর এভাবে আজও সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে ।[১৩০]

ইতিহাসের এই এরফান বা আধ্যাত্মবাদের অধিকাংশ মাশায়েখগণই (সিদ্ধপুরুষ) বাহ্যতঃ আহলে সুন্নাতের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । বর্তমান ‘তরীকত’ পন্থীদের বিশেষ আচরণ বিধি ও সংস্কৃতি সবই তাদের পূর্ব পুরুষদেরই স্মৃতি বাহক, যার সাথে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতির তেমন কোন সংহতি নেই । অবশ্য তাদের বেশ কিছু নিয়মনীতি ও সংস্কৃতি শীয়াদের মধ্যেও কিছুটা সংক্রমিত হয়েছে । একদল লোক এব্যাপারে বলেছেন যে, ইসলামে

আধ্যাত্মবাদের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি । তবে মুসলমানরা নিজেরাই আত্মউপলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া আবিস্কার করেছে, যা আল্লাহর কাছেও গৃহীত হয়েছে । যেমনঃ খৃষ্টানদের মধ্যে চিরকুমার জীবন যাপনের ব্যাপারে হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) কিছুই বলেননি । বরং খৃষ্টানরাই তা আবিস্কার করেছে এবং তা সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে ।[১৩১] এভাবে প্রত্যেক 'তরিকত' পন্থী দলের প্রতিষ্ঠাতা 'মুর্শেদ' যে বিশেষ নিয়মনীতি বা কর্মপদ্ধতিকে উপযোগী বলে নির্ধারণ করেছেন, তাই তার মুরিদগণকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । আর সেটাই পরবর্তীতে একটি ব্যাপক ও স্বকীয় আধ্যাত্মিক পদ্ধতি হিসেবে গড়ে উঠেছে । উদাহরণ স্বরূপ, বিশেষ পদ্ধতিতে যিকিরের অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মমূলক সংগীত চর্চা ও যিকিরকালীন চরম উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এমনকি কোন কোন 'তরিকত' পন্থীদের কার্যকলাপ কখনও কখনও এমন পর্যায়ে গিয়ে দাড়ায় যে, ইসলামী শরীয়ত একদিকে আর তরীকত পদ্ধতি তার বিপরীত দিকে অবস্থান গ্রহণ করে । এসব তরীকত পন্থীরা বাস্তবে 'বাতেনী' বা গুপ্ত পন্থীদেরই দলভুক্ত হয়েছে । কিন্তু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠি অনুসারে শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামের স্বরূপ তথাকথিত তরীকতপন্থীদের বিপরীত । যদি এপথই সঠিক হত, তাহলে ইসলামের নির্দেশাবলীও অবশ্যই মানুষকে এবাস্তব সত্যের দিকেই পরিচালিত করত । এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, ইসলাম তার কিছু কর্মসূচীর ব্যাপারে অবহেলা করবে অথবা হারাম বা ওয়াজিব কোন বিষয় লংঘনের ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করে দেবে ।

## কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিকতার কর্মসূচী

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে বলেছেন যে, মানুষ কুরআনের অর্থ উপলব্ধির জন্য যেন গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে । সে সামান্য কিছু বাহ্যিক অর্থ বোঝার মাধ্যমেই যেন তুষ্ট না হয় । পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ সৃষ্টিজগতকে মহান আল্লাহর অসীম মহিমার নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত ঐসব নিদর্শনাবলীর প্রতি একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেই বোঝা যাবে যে, নিদর্শনগুলো অন্য কিছুর প্রতিই নির্দেশ করছে, নিজের প্রতি নয় । যেমন : লাল বাতি সাধারণতঃ বিপদের সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয় । কোন ব্যক্তি লাল বাতি দেখা মাত্রই বিপদের আশাংকা করে । তখন সে বিপদের আশাংকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না । কারণ: তখন যদি সে ঐ বাতির রং, কাঁচ ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে সেখানে বিপদের কোন চিত্রও খুজে পাবে না । সুতরাং এ সৃষ্টিজগত যদি মহান আল্লাহর নিদর্শন হয়ে থাকে, তাহলে এ সৃষ্টিজগতের কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব থাকে না । তখন যেদিকেই আমরা তাকাই না কেন, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব আমরা খুজে পাব না ।

তাই যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হেদায়েতের দ্বারা আলোকিত হয়ে ঐ দৃষ্টিতে এ সৃষ্টিজগতের দিকে তাকাবে, সেও পবিত্র ও মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই উপলব্ধি করবে না । অন্যরা পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্য অবলোকন করে । কিন্তু সে এই সংকীর্ণ পৃথিবীর জানালা দিয়ে সর্বস্রষ্টা আল্লাহর অনন্ত ও অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করে, যা এ সৃষ্টিজগতের মধ্যে আত্মপ্রকাশিত হয়ে আছে । তখন সে নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর ভালবাসার কাছে স্বীয় হৃদয় সমর্পণ করে । এটা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় যে, এই বিশেষ উপলব্ধি নিঃসন্দেহে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় বা কল্পনা বা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয় । বরঞ্চ এসব মাধ্যম নিজেই আল্লাহর এক বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ । আর ঐসব মাধ্যমের দ্বারা মানুষ প্রকৃত হেদায়েত পেতে সক্ষম নয় ।[১৩২]

আর আল্লাহর এ পথের সন্ধান প্রাপ্তি সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে “স্মরণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয় । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেনঃ হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের আত্মার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা কর । তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই । (সূরা আল মায়েদা, ১০৫ নং আয়াত ।)

অর্থাৎ মানুষ তখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, মহান আল্লাহর হেদায়েত প্রাপ্তির একমাত্র পথই হচ্ছে মানুষের নিজের বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা । আর মহান আল্লাহ ই তার পথ নির্দেশকারী । তার বিবেক ও মহান আল্লাহ মানুষকে তখন তার নিজের প্রকৃতরূপকে ভালভাবে চিনতে ও উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে । যাতে করে অন্যসকল পথত্যাগ করে একমাত্র আত্মউপলব্ধির পথ সে অনুসরণ করে । তখন সে স্বীয় আত্মার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে স্বীয় স্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হয় । আর এভাবেই সে নিজের অস্তিত্বের প্রকৃতপক্ষে রহস্যের সন্ধান প্রায় । এ ব্যাপারে আমাদের মহানবী (সা.) বলেছেন : যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আল্লাহকে- ও চিনতে পেরেছে ।[১৩৩] মহানবী (সা.) আরও বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহকে ভালভাবে জানেন, যে নিজের আত্মাকে ভাল করে চিনেছে ।[১৩৪]

আর এপথ অনুসরণের কর্মসূচীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে । সেখানে মহান আল্লাহ তাকে “স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । বলেছেনঃ “তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব” । (সূরা আল বাকারা, ১৫২ নং আয়াত) ।

এছাড়া পবিত্র কুরআনও সুন্নাহর সর্বত্র বিস্তারিত ভাবে সৎকাজের প্রতি আদেশ করা হয়েছে । অবশেষে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । (সূরা আহজাব, ২১ নং আয়াত ।)

তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, ইসলাম আল্লাহর পথের সন্ধান দিয়েছে অথচ জনসাধারণের কাছে তা বর্ণনা করেনি । অথবা সেই সত্যপথের সন্ধানের বিষয়টি মানুষের কাছে বর্ণনা করার ব্যাপারে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি ও এ ব্যাপারে অবহেলা করেছে?

অথচ, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেছেন যে, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে হতে আমি একজন বর্ণনাকারী দাড় করাব যে তাদের মধ্য থেকেই তাদের বিপক্ষে এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব । আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তাতে প্রত্যেকটি বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ । (সূরা আল নাহল, ৮৯ নং আয়াত ।)

# তৃতীয় অধ্যায়

## দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

### অস্তিত্ব ও বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত

## আল্লাহর অস্তিত্বের আবশ্যকতা

মানুষ তার স্বভাবগত উপলব্ধি ক্ষমতা যা জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত তার মাধ্যমে সর্বপ্রথম যে কাজটি করে, তা হল এ বিশ্ব জগত ও মানব জাতির স্রষ্টার অস্তিত্বকে তার জন্য সুস্পষ্ট করে দেয় । অনেকেই নিজের অস্তিত্ব সহ সবকিছুর প্রতিই সন্দিহান । তারা এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বকে এক ধরণের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না । কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, একজন মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই স্বভাবগত অনুভুতি ও উপলব্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন । তাই জন্মের পর থেকেই সে নিজের এবং এ বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে । অর্থাৎ এ ব্যাপারে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না যে, সে আছে এবং সে ছাড়াও তার চতুর্পাশ্বে আরও অনেক কিছুই আছে । মানুষ যতক্ষণ মানুষ হিসেবে গণ্য হবে, ততক্ষণ এ জ্ঞান ও উপলব্ধি তার মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক ঘটাবে না, অথবা এ ধারণার মধ্যে কোন পরিবর্তনও ঘটবে না । সুফিষ্ট (Sophi st , যে মতে সত্যকে আপেক্ষিক গণ্য করা হয়) ও সংশয়বাদীদের বিপরীতে এ বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব ও তার বাস্তবতা সম্পর্কিত মানুষের এ বিশ্বাস একটি প্রমাণিত ও বাস্তব সত্য । বিষয়টি একটি চিরন্তন বিধি, যা অপরিববর্তনশীল । অর্থাৎ এ সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব কে অস্বীকারকারী ও তার বাস্তবতায় সন্দেহ পোষণকারী সুফিষ্ট বা সংশয়বাদীদের বক্তব্য মোটেই সত্য নয় । বরং এ সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব এক বাস্তব সত্য । কিন্তু আমরা যদি এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিনিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাব যে, আগে হোক আর পরেই হোক, প্রত্যেক সৃষ্টিই এক সময় তার অস্তিত্ব হারাতে বাধ্য হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায় । আর এখান থেকে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমাদের দৃশ্যমান এ সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব ভিন্ন কিছু । বস্তুতঃ ঐ প্রকৃত অস্তিত্বের উপরই এই কৃত্তিম অস্তিত্ব নির্ভরশীল । ফলে অবিনশ্বর ও প্রকৃত অস্তিত্বের মাধ্যমেই এই কৃত্তিম অস্তিত্ব অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় । কৃত্তিম অস্তিত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রকৃত ও অবিনশ্বর অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে । আর যে মূহুর্তে ঐ সম্পর্ক ও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে, সে মূহুর্তেই কৃত্তিম অস্তিত্ব ধ্বংস

হয়ে যাবে ।[১৩৫] আমরা অপরিবর্তনশীল ও অবিনশ্বর অস্তিত্বকেই (অবশ্যম্ভাবী বা অপরিহার্য অস্তিত্ব) 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করি ।

## মানুষ ও এ বিশ্বজগতের সম্পর্ক

### আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিটি সকল মানুষের জন্যেই অত্যন্ত সহজবোধ্য ব্যাপার । আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত উপলদ্ধি ক্ষমতা দিয়েই মানুষ তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় । উক্ত প্রমাণ পদ্ধতিতে কোন প্রকার জটিলতার অস্তিত্ব নেই । কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পার্থিব ও জড়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত থাকার ফলে শুধুমাত্র অনুভবযোগ্য বস্তুগত আনন্দ উপভোগে অভ্যস্ত ও তাতে নিমগ্ন হয়ে আছে । যার পরিণতিতে খোদাপ্রদত্ত সহজ- সরল প্রবৃত্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার দিকে ফিরে তাকানো মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে । ইসলাম স্বীয় পবিত্র আদর্শকে সার্বজনীন বলে জনসমক্ষে পরিচিত করিয়েছে তাই ইসলাম তার পবিত্র লক্ষ্যের কাছে সকল মানুষকেই সমান বলে গণ্য করে । যেসব মানুষ খোদাপ্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্তি থেকে দুরে সরে গিয়েছে, মহান আল্লাহ তখন অন্য পথে তাদেরকে তার অস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়াস পান । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন পন্থায় সাধারণ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় লাভের শিক্ষা দিয়েছেন । ঐসবের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহ এ সৃষ্টিজগত ও তাতে প্রভুত্বশীল নিয়ম- শৃংখলার প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । তিনি মানুষকে এ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে সুগভীর চিন্তা ভাবনা করার আহবান্ জানিয়েছেন । কারণ, মানুষ তার এই নশ্বর জীবনে যে পথেই চলকু বা যে কাজেই নিয়োজিত থাককু না কেন, সে এ সৃষ্টিজগত ও তাতে প্রভুত্ব বিস্তারকারী অবিচল নিয়ম শৃংখলার বাইরে বিরাজ করতে পারবে না । একইভাবে সে এই পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীর বিস্ময়কর দৃশাবলী অবলোকন ও উপলদ্ধি থেকে বিরত থাকতে পারবে না ।

আমাদের সামনে দৃশ্যমান এ বিশাল জগতের[১৩৬] সব কিছুই একের পর এক প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল । প্রতি মূহুর্তে ই নতুন ও অভুতপূর্ব আকারে এ প্রকৃতি আমাদের দৃশ্যপটে মূর্ত হচ্ছে । আর তা ব্যতিক্রমহীন চিরাচরিত নিয়মে বাস্তবতার রূপ লাভ করছে । সুদূর নক্ষত্র মণ্ডল থেকে শুরু করে এ পৃথিবী গঠনকারী ক্ষুদ্রতম অণু- পরমাণু পর্যন্ত সকল কিছুই এক সুশৃংখল নিয়মের অধীন । সকল অস্তিত্বের মধ্যেই এ বিস্ময়কর 'আইন শৃংখলা' স্বীয় ক্ষমতা বলে বলবৎ রয়েছে । যা তার ক্রীয়াশীল রশ্মিকে সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে সর্বোন্নত পর্যায়ের দিকে ধাবিত করে এবং পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্যে নিয়ে পৌছায় । প্রতিটি বিশেষ শৃংখলা ব্যবস্থার উপর উচ্চতর শৃংখলা ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত । আর সবার উপরে বিশ্বব্যবস্থা বিরাজমান । অসংখ্য অণু- পরমাণু কণা সমন্বয়ে বিশ্ব জগত পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে । ক্ষুদ্রতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গুলোকেও ঐ সুক্ষাতিসুক্ষ্ম অংশগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে ।

এক্ষেত্রে আদৌ কোন ব্যতিক্রম নেই এবং তাতে কখনও কোন ধরণের বিশৃংখলা ঘটে না । উদাহরণ স্বরূপ এ সৃষ্টিজগত পৃথিবীর বুকে যদি কোন মানুষকে অস্তিত্ব দান করে, তাহলে এমনভাবে তার দৈহিক গঠনের অস্তিত্ব রচনা করে, যাতে তা পৃথিবীর পরিবেশের জন্য উপযোগী হয় । একইভাবে তার জীবন ধারণের পরিবেশকে এমনভাবে প্রস্তত করে যে, তা যেন দুগ্ধদাত্রী মায়ের মত আদর দিয়ে তাকে লালন করতে পারে । যেমন : সূর্য , চন্দ্র , গ্রহ, তারা, মাটি, পানি, দিন, রাত, ঋতু, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, ভূগর্ভস্থ সম্পদ, মাটির বুকে ছড়ানো সম্পদ..... ইত্যাদি তথা এ বিশ্বজগতের সমুদয় সৃষ্টিকূল একমাত্র এই মানুষের সেবাতেই নিয়োজিত থাকে । এই অপূর্ব সম্পর্ক আমরা সমগ্র সৃষ্টিনিচয়ে বিরাজমান দেখতে পাই । এ ধরণের সুশৃংখল ও নিবিড় সম্পর্ক আমরা বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই খুজে পাই । প্রকৃতি যেমন মানুষকে খাদ্য দিয়েছে, তেমনি তা আনার জন্যে তাকে পা দিয়েছে । খাদ্য গ্রহণ করার জন্য দিয়েছে হাত এবং খাওয়ার জন্যে দিয়েছে মুখ । চিবানোর জন্যে তাকে দিয়েছে দাতঁ আর এই মাধ্যমগুলো একটি শিকলের অংশ সমূহের মত পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা মানুষকে মহান ও পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্যে পৌছার জন্যে পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে । এ ব্যাপারে বিশ্বের

বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ নেই যে, হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এ সৃষ্টিজগতে বিরাজমান সুশৃংখল ও অন্তহীন যে সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়েছে, তা অনন্ত সৃষ্টি রহস্যের এক নগণ্য নমুনা মাত্র । প্রতিটি নব আবিস্কৃত জ্ঞানই মানুষকে তার আরো অসীম অজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । বাহ্যতঃ পৃথক ও সম্পর্কহীন এ সৃষ্টিনিচয়, প্রকৃতপক্ষে এক গোপন সূত্রে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুশৃংখলতার নিয়মের অধীনে আবদ্ধ, যা সত্যিই বিস্ময়কর । এই অপূর্ব সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা এক অসীম জ্ঞান ও শক্তির পরিচায়ক । তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে এত সুন্দর ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এ বিশাল জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই ?

এটা কি বিনা কারণে, বিনা উদ্দেশ্যেএবং দূর্ঘটনা বশতঃ সৃষ্টি হয়েছে? এই ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর তথা এ বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা, যা পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সুদৃঢ়রূপে সম্পর্কিত হয়ে এক বিশাল ব্যবস্থাপনার অবতারণা ঘটিয়েছে এবং ব্যতিক্রমহীন, সুক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট এক নিয়ম শৃংখলা এর সর্বত্র বিরাজমান । এখন এটা কল্পনা করা কি করে সম্ভব যে, কোন ধরণের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এটা কোন দূর্ঘটনার ফসল মাত্র? অথবা, এ সৃষ্টিজগতের ছোট- বড় সকল সৃষ্টিকূলই একটি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখল নিয়মতান্ত্রিকতা অবলম্বনের পূর্বে তারা নিজেরাই ইচ্ছেমত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে এবং ঐ সুশৃংখল নিয়মতান্ত্রিকতার আবির্ভাবের পর তারা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে? অথবা এই সুশৃংখল বিশ্বজগত একাধিক ও বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফলাফল, যা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত হয়? অবশ্য যে বিশ্বাস প্রতিটি ঘটনা বা বিষয়ের কারণ খুজে বেড়ায় এবং কখনো বা কোন একটি অজানা কারণকে জানার জন্য দিনের পর দিন গবেষণার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় সে কোন কিছুকেই কারণবিহীন বলে স্বীকার করতে পারে না । আর যে বিশ্বাস কিছু সুসজ্জিত ইটের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাড়ী দেখে এর গঠনের পেছনে এক গভীর জ্ঞান ও শক্তির ক্রিয়াশীলতাকে উপলব্ধি করে এবং একে আকস্মিক কোন দূর্ঘটনার ফলাফল বলে মনে করে না । বরং ঐ বাড়ীটিকে সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে রচিত পূর্ব পরিকল্পনার ফসল বলেই বিশ্বাস করে । এ ধরণের বিশ্বাস কখনোই মেনে নিতে পারেনা যে, এ সুশৃংখল বিশ্ব জগত কোন কারণ ছাড়াই উদ্দেশ্যহীনভাবে দূর্ঘটনা বশতঃ সৃষ্টি হয়েছে । সুতরাং সুশৃংখল

ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত এ বিশ্বজগত এক মহান স্রষ্টারই সৃষ্টি । যিনি তার অসীম জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন । এই সৃষ্টিজগতকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান । সৃষ্টিজগতের ছোট বড় সকল কারণই ঐ মহান স্রষ্টাতে গিয়ে সমাপ্ত হয় । বিশ্বে সকল কিছুই তার আয়ত্বের মধ্যে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত । এ জগতের সকল অস্তিত্বই তার মুখাপেক্ষী । কিন্তু একমাত্র তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন । তিনি অন্য কোন শর্ত বা কারণের ফলাফল ও নন ।

এ সৃষ্টিজগতের যে কোন কিছুর প্রতিই আমরা লক্ষ্য করি না কেন, তাকে সসীম হিসেবেই দেখতে পাব । কারণ, সবকিছুই কার্য কারণ নিয়মনীতির অধীন । কোন কিছুই এ নীতির বাইরে নয় । অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে সকল অস্তিত্বই সীমাবদ্ধ । নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোন অস্তিত্বই খুজে পাওয়া যাবে না । শুধুমাত্র সর্বস্রষ্টা আল্লাহই এমন এক অস্তিত্বের অধিকারী, যার কোন সীমা বা পরিসীমা কল্পনা করা সম্ভব নয় । কেননা তিনি নিরংকুশ অস্তিত্বের অধিকারী । যেভাবেই কল্পনা করি না কেন, তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য । তার অস্তিত্ব কোন শর্ত বা কারণের সাথেই জড়িত নয় । আর নয় কোন শর্ত বা কারণের মুখাপেক্ষী ।

এটা খুবই স্পষ্ট ব্যাপার যে, অসীম ও অনন্ত অস্তিত্বের জন্যে সংখ্যার কল্পনা করা অসম্ভব । কেননা আমাদের কল্পিত প্রতিটি দ্বিতীয় সংখ্যাই প্রথম সংখ্যার চেয়ে ভিন্ন হবে । যার ফলে দুটো সংখ্যাই সীমিত ও সমাপন রযাগে হবে দু'রটাই তাদের নিজস্ব সীম্রারখায় বন্দী হবে । কারণ কোন একটি অস্তিত্বকে যদি আমরা অনন্ত ও অসীম হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে তার সমান্তরালে অন্য কোন অস্তিত্বের কল্পনা অসম্ভব হয়ে পড়বে । তবুও যদি তা কল্পনা করার চেষ্টা করি, তাহলে একমাত্র প্রথম অস্তিত্বই পুনঃকল্পিত হবে । তাই অসীম অস্তিত্ব সম্পন্ন মহান আল্লাহ এক । তার কোন শরীক বা অংশী নেই ।[১৩৭]

## আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী

একটি মানুষকে যদি আমরা বুদ্ধিবৃত্তিগত ভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মানুষের একটি সত্তা রয়েছে । আর তা তার মনুষ্য- বিশেষত্ব বৈ কিছুই নয় । এর পাশাপাশি তার মধ্যে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী বিদ্যমান, যা তার সত্তার সাথে সম্মিলিতভাবে সনাক্ত হয় । যেমন : অমুকের ছেলে অত্যন্ত জ্ঞানী ও কর্মপটু এবং দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দর, অথবা এর বিপরীত গুণাবলী সম্পন্ন । এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম গুণটি (অমুকের ছেলে) ঐ ব্যক্তির সত্তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, যা তার সত্তা থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় । কিন্তু উপরোক্ত ২য় ও ৩য় গুণটি অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মদক্ষতাকে তার সত্তা থেকে পৃথক করা বা পরিবর্তন সাধন সম্ভব । যাই হোক, উপরোক্ত গুণাবলীই (পৃথক করা সম্ভব হোক বা নাই হোক) ঐ ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা নয় । আর প্রতিটি গুণাবলীই একটি থেকে আরেকটি আলাদা । আর এ বিষয়টিই (মূলসত্তা ও গুণাবলীর ব্যবধান ও গুণাবলীর পারস্পরিক পর্থক্য) সত্তা ও গুণাবলীর সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সর্বোত্তম দলিল ও প্রমাণ । কারণঃ সত্তা যদি অসীম হত, তাহলে গুণাবলীকে অবশ্যই তা পরিবর্তন করত । আর পরিণতিতে সবগুলোই একাকার হয়ে একে রূপান্তরিত হত । সেক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত মানুষের সত্তা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, দীর্ঘাঙ্গীতা এবং সৌন্দর্য সবই একই অর্থে রূপান্তরিত হত । অর্থাৎ সবগুলো অর্থই একই অর্থের পরিচায়ক হত । উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহর সত্তার জন্যে (পূর্বোক্ত অর্থে) পৃথকভাবে গুণাবলী প্রমাণ করা সম্ভব নয় । কারণঃ গুণাবলী তার জন্যে অসীম হতে পারে না । আর তার পবিত্র সত্তা যেকোন ধরণের সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ।

**আল্লাহর গুণাবলীর অর্থ**

এই সৃষ্টিজগতে পূর্ণাঙ্গতা বা উন্নতির চরম উৎকর্ষতার এমন অনেক বিষয়ের কথাই আমাদের জানা আছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন গুণাবলীর ছত্রছায়ায় । এগুলো সবই ইতিবাচক গুণাবলী যার মধ্যেই এসব গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ফলে সে সকল বস্তুকে পূর্ণাঙ্গতর এবং উন্নতরূপ প্রদান করে । একইভাবে ঐসব গুণাবলী প্রকাশিত মাধ্যমের অস্তিত্বগত মূল্য বৃদ্ধিতে

অবদান রেখেছে । আমরা বিষয়টিকে মানুষের সাথে পাথরের মত নিষ্প্রাণবস্তু অস্তিত্বগত মূল্যের পার্থক্য ও তার তুলনা করে স্পষ্ট বুঝতে পারি । এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এসকল পূর্ণত্ব ও উন্নতি মহান আল্লাহ ই সৃষ্টি ও দান করেছেন । তিনি যদি নিজেই ঐসব গুণাবলীর অধিকারী না হতেন, তাহলে অন্যদেরকে তা দান করতে পারতেন না । ফলে অন্যদেরকেও পূর্ণাঙ্গতর করতে পারতেন না । এ কারণেই সকল সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বিশ্বাসই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করবেন যে, এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই মহাজ্ঞান ও শক্তির অধিকারী এবং তিনি সকল প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ তার অধিকারী । যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, জ্ঞান ও শক্তির লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশারই পরিচায়ক । আর এটা সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনাগত নিয়ম শৃংখলার বৈশিষ্ট্য । কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অনন্ত ও অসীম, তাই পূর্ণাঙ্গতার এসব গুণাবলী, যা আমরা তার জন্য প্রমাণ করতে চাচ্ছি, তা মূলতঃ তার সত্তারই স্বরূপ । অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীই তাঁর সত্তা এবং তাঁর সত্তাই তার গুণাবলীর পরিচায়ক ।[১৩৮] তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে এবং গুণসমূহের পাস্পরিক যে পার্থক্য আমরা উপলদ্ধি করি, তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ । এছাড়া সত্তা ও গুণাবলী প্রকৃতপক্ষে একত্রেই পরিচায়ক এবং একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ বৈ অন্য কিছুই নয় । মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী কখনোই পরস্পর বিভাজ্য নয় । ইসলাম এ বিষয়ক মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে তার অনুসারীদেরকে এ ধরণের অনাকাংখিত ভুল[১৩৯] থেকে বেচে থাকার জন্য আল্লাহর গুণাবলীকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপে দু'ভাগে ভাগ করেছে ।[১৪০] তাই এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক বিশ্বাসের স্বরূপ হচ্ছে এ রকম : মহান আল্লাহ জ্ঞানী । কিন্তু তার জ্ঞান অন্যদের জ্ঞানের মত নয় । মহান আল্লাহ শক্তিশালী । কিন্তু তার শক্তি অন্যদের শক্তির মত নয় । তিনি সর্বশ্রোতা । তবে অন্যদের মত কান দিয়ে শুনার প্রয়োজন তার হয় না । তিনি সর্বদ্রষ্টা । কিন্তু, দেখার জন্য অন্যদের মত চোখের প্রয়োজন তার নেই । এভাবে তার অন্য সকল গুণাবলীই সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও তুলনাহীন ।

# ঐশী গুণাবলীর ব্যাখা

গুণাবলী দু’ প্রকার :

১। পূর্ণত্বমূলক গুণাবলী এবং

২। ত্রুটিমূলক গুণাবলী।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ণত্বমূলক গুণাবলী মূলতঃ ইতিবাচক অর্থ প্রদান করে। কারণ : প্রথম শ্রেণীর মাধ্যমে গুণান্বিত বিষয়ের অস্তিত্বের মানগত মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর তা গুণান্বিত বিষয়ের ইতিবাচক অস্তিত্বগত সুফলের প্রাচুর্য্য আনয়ন করে। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞানী, শক্তিশালী ও জীবন্ত অস্তিত্বের সাথে জ্ঞান ও শক্তি বিহীন মৃতু বস্তুর তুলনামূলক পার্থক্যের সুস্পষ্ট ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ‘ত্রুটিমূলক গুণাবলী’ ‘শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলীর’ সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ‘ত্রুটিমূলক গুণাবলী অর্থের দিকে যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব যে, এটা প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। এটা হচ্ছে : পূর্ণাঙ্গতা বা শ্রেষ্ঠত্বের অভাব, যা ঐ গুণে গুণান্বিত বিষয়ের অস্তিত্বের মানগত মূল্যহীনতার পরিচায়ক। যেমন : মুর্খতা, অক্ষমতা, শ্রীহীনতা, অসুস্থতা ইত্যাদি। সুতরাং নেতিবাচক গুণাবলীর অস্বীকতি প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক গুণাবলীরই স্বীকৃতি বটে। যেমন : মুর্খতার অভাবের অর্থই জ্ঞানের অস্তিত্ব। অক্ষমতাহীনতা অর্থ সক্ষমতা। এ কারণেই পবিত্র কুরআন সকল শ্রেষ্ঠত্ব মূলক বা ইতিবাচক গুণাবলীকেই মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রমাণ করে। আর সকল ত্রুটিমূলক বা নেতিবাচক গুণাবলীকেই আল্লাহর ব্যাপারে অস্বীকার করে। যেমন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে “তিনি জীবিত, তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভুত করতে পারবে না। যে বিষয়টি আমাদের সবার দৃষ্টিতে থাকা উচিত, তা হল, মহান আল্লাহ স্বয়ং এক নিরংকুশ অস্তিত্বের অধিকারী, যার কোন সীমা বা শেষ নেই। আর এ কারণেই[১৪১] তার জন্য বিবেচিত শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণাঙ্গতার গুণাবলীও অবশ্যই অসীম হবে। মহান আল্লাহ কোন জড়বস্তু বা দেহের অধিকারী নন

। তিনি স্থান বা সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নন । সবধরণের অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য, যা নিয়ত পরিবর্তনশীল, তা থেকে তিনি মুক্ত । মহান আল্লাহর জন্যে প্রকৃতই যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আরোপিত হয় তা সব ধরণের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত । তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : তিনি কোন কিছুরই সদৃশ্য নন ।[১৪২]

**কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী :**

পূর্বোক্ত শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াও গুণাবলীর আরও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে । যেমন :

১ । সত্তাগত গুণাবলী এবং

২ । কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী :

যেসব গুণাবলী সত্তার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, তাকেই সত্তাগত গুণাবলী বলে । যেমনঃ মানুষের জীবন, জ্ঞান ও শক্তি, আমরা মানুষের সত্তাকে অন্য কিছু কল্পনা না করে শুধুমাত্র উপরোক্ত গুণাবলীর দ্বারাই বিশেষিত করতে পারি । কিন্তু এমন অন্য গুণাবলী রয়েছে, যা বিশেষত্বের সত্তার মধ্যে নিহিত নয় । ঐ ধরণের গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত হতে হলে অন্য কিছুর বাস্তবায়ন প্রয়োজন । এ ধরণের গুণাবলীই কার্যসংক্রান্ত গুণাবলী নামে পরিচিত যেমন : লেখক, বক্তা ইত্যাদি । আমরা তখনই একজন মানুষকে লেখক হিসেবে বিশেষিত করব, যখন তার পাশাপাশি কাগজ, কালি, কলম ও লেখাও কল্পনা করা হবে । তেমনি যখন শ্রোতার অস্তিত্ব কল্পনা করব, তখন একজন মানুষকে বক্তা হিসেবে বিশেষিত করতে পারব । তাই শুধুমাত্র মানুষের সত্তা বা অস্তিত্বের কল্পনা এ ধরণের গুণাবলী বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয় । উপরোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হল যে, মহান আল্লাহর প্রকৃতপক্ষে গুণাবলী এই প্রথম শ্রেণীর (সত্তাগত গুণাবলী) গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণাবলীর অস্তিত্ব অন্য কিছুর বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল । আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোন কিছুই আল্লাহরই সৃষ্টি এবং আল্লাহর পরই তার অস্তিত্ব ।

মহান আল্লাহ তার অস্তিত্ব দিয়েই ঐ সবকিছুকে অস্তিত্বশীল করেছেন । তাই যেসব গুণাবলী অন্য কিছুর অস্তিত্ব অর্জনের উপর নির্ভরশীল, সে সব গুণাবলী অবশ্যই আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী বা

সত্তার স্বরূপ নয় । সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হওয়ার পর যেসব গুণাবলী দ্বারা মহান আল্লাহ্ গুণান্বিত হন, সেসব গুণাবলীকেই আল্লাহর 'কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী' বলা হয় । যেমন : স্রষ্টা, প্রতিপালক, জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারী, জীবিকা দাতা, ইত্যাদি হওয়ার গুণাবলী আল্লাহর সত্তার স্বরূপ নয় । বরং এসব গুণাবলী আল্লাহর সত্তার সাথে সংযুক্ত অতিরিক্ত গুণাবলী । 'কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী' বলতে সেসব গুণাবলীকেই বোঝায়, যা কোন কার্য সম্পাদিত হওয়ায় ঐ সম্পাদিত কার্য থেকে গৃহীত হয় ঐ গুণাবলী সত্তা থেকে গৃহীত হয় না । অর্থাৎ সম্পাদিত কার্যই ঐ গুণাবলীর উৎসস্থল, ঐ কার্যের কর্তা বা ঐ গুণাবলীর উৎস সত্তা নয় । যেমন : সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হওয়ার পরই মহান আল্লাহ ঐ সৃষ্টিকার্যের কারণে 'স্রষ্টা' হিসেবে বিশেষিত হন । 'স্রষ্টা' হওয়ার গুণটি ঐসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যেই নিহিত, আল্লাহর সত্তার মধ্যে নয় । এভাবে বিভিন্ন ধরণের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পরই মহান আল্লাহর সত্তা ঐ কার্য সম্পাদনকারী হওয়ার গুণে ভূষিত হন । আর এসব গুণাবলী তার পবিত্র সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় । কারণ : কাজ সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল এসব গুণাবলী সর্বদাই পরিবর্তনশীল । তাই এসব গুণাবলী যদি আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে আল্লাহর সত্তাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য, যা মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভব নয় । শীয়াদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর 'ইচ্ছা করা' ( ইচ্ছা করা অর্থাৎ কিছু করতে চাওয়া বা কামনা করা) এবং 'কথোপকথন' ( কোন কিছুর অর্থের শাব্দিকরূপ) নামক গুণাবলী দু'টোই তার 'কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী'র অন্তর্ভূক্ত ।[১৪৩] কিন্তু 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' অনুসারীদের অধিকাংশের মতেই মহান এ দু'টি গুণাবলীই তার 'জ্ঞান' নামক গুণেরই অংশ । অর্থাৎ এ দু'টো গুণাবলী তার 'সত্তাগত গুণাবলীরই' অন্তর্ভূক্ত বলে তারা মনে করেন ।

# মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ

কার্যকারণ নীতি সৃষ্টিজগতকে ব্যতিক্রমহীনভাবে শাসন করছে । এ সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই এ নীতি বলবৎ রয়েছে । কার্য- কারণ নীতি অনুসারী এ বিশ্বের সকল কিছুই তার সৃষ্টির ব্যাপারে এক বা একাধিক কারণ বা শর্তের উপর নির্ভরশীল । আর ঐসব কারণ বা শর্ত সমূহ (পূর্ণাঙ্গ কারণ) বাস্তবায়নের পর সংশ্লিষ্ট বস্তুর বাস্তব রূপ লাভ (ফলাফল) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । আর তার প্রয়োজনীয় কারণ বা শর্ত সমূহের সবগুলো বা তার কিছু অংশের অভাব ঘটলে সংশ্লিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে । উপরোক্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দু'টো বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ঃ

১. যদি আমরা কোন একটি সৃষ্টি বস্তুকে (ফলাফল) তার সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ কারণ সমূহের সাথে আনুপাতিক তুলনা করি, তাহলে ঐ সৃষ্ট বস্তুর (ফলাফল) অস্তিত্ব এবং তার কারণ সমূহের (পূর্ণাঙ্গ) অনুপাত হবে অপরিহার্যতা । কিন্তু আমরা যদি ঐ সৃষ্টি বস্তুকে তার সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ কারণের সাথে তুলনা না করে বরং তার আংশিক কারণের সাথে তুলনা করি, তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব (ফলাফল) আর তার আংশিক কারণের অনুপাত হবে সম্ভাব্যতা । কেননা, অসম্পূর্ণ বা আংশিক কারণ তার ফলাফল সংঘটনের ক্ষেত্রে শুধু সম্ভাব্যতাই দান করে মাত্র, অপরিহার্যতা নয় । সুতরাং এ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণঙ্গ কারণের উপর আবশ্যিকভাবে নির্ভরশীল । এই আবশ্যিকতা ও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই ক্ষমতাসীন । আর এর কাঠামো এক ধরণের আনুক্রমিক ও আবশ্যিক গুণক সমূহের (Factors) দ্বারা সুসজ্জিত । তথাপি, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর (যা তার সৃষ্টির আংশিক কারণের সাথে সম্পর্কিত) মধ্যে তার সৃষ্টির সম্ভাব্যতার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকবে । পবিত্র কুরআনে এই আবশ্যিক নীতিকে 'ক্বায' বা 'ঐশী ভাগ্য' হিসেবে নামকরণ করেছে । কেননা, এই আবশ্যিকতা স্বয়ং অস্তিত্ব দানকারী স্রষ্টা থেকেই উৎসারিত । এ কারণেই ভাগ্য এক অবশ্যম্ভাবী ও অপরিবর্তনশীল বিষয় । যার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম বা পক্ষপাত দুষ্টতা কখনোই ঘটার নয় । মহান আল্লাহ পবিত্র

কুরআনে বলেন : (জেনে রাখ) সৃষ্টি ও আদেশ দানের অধিকার তো তারই । (সূরা আল্ আ'রাফ, ৫৪ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ বলেন : "যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন হও, আর তা হয়ে যায়" । (সূরা আল্ বাকারা , ১১৭ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরও বলেন : আর আল্লাহই্ আদেশ করেন যা বাধা দেয়ার (ক্ষমতা) কারো নেই (সূরা আর রা'দ, ৪১ নং আয়াত ।)

২ । পূর্ণাঙ্গ কারণের প্রতিটি অংশই তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ মাত্রা ও প্রকৃতি দান করে। আর এভাবেই সম্মিলিত কারণ সমূহের (পূর্ণাঙ্গ কারণ) প্রদত্ত মাত্রা ও প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কারণ নির্দেশিত পরিমাণ অনুযায়ী কারণ সমূহ (পূর্ণাঙ্গ কারণ) প্রদত্ত মাত্রা ও প্রকৃতির সমষ্টিই এই অনুকুল ফলাফল (সৃষ্টবস্তু) । যেমনঃ যেসব কারণ মানুষের শ্বাসক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা শুধুমাত্র নিরংকুশ শ্বাসক্রিয়ারই সৃষ্টি করে না । বরং তা মুখ ও নাকের পার্শ্বস্থ্ নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুকে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার শাসনালী দিয়ে ফসফুস যন্ত্রে পাঠায় । একইভাবে যেসমস্ত কারণঃ মানুষের দৃষ্টিশক্তি দান করে, তা কোন শর্ত বা কারণবিহীন দৃষ্টিশক্তির জন্ম দেয় না । বরং একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ও পরিমাণে ঐ দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি করে । এ জাতীয় বাস্তবতা সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টিনিচয় ও তাতে সংঘটিত সকল কর্মকান্ডেই বিরাজমান, যার কোন ব্যতিক্রম নেই । পবিত্র কুরআনে এ সত্যটিকে 'কাদর' বা ভাগ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর সকল সৃষ্টির উৎস মহান আল্লাহর প্রতি এ বিষয়টিকে আরোপিত করা হয়েছে । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : আমি প্রতিটি বস্তুকেই তার (নির্দিষ্ট) পরিমাণে সৃষ্টি করেছি । (সূরা আল্ কামার, ৪৯ নং আয়াত ।)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন : আমারই নিকট রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরাবরাহ করে থাকি ।[১৪৪] (সূরা আল্ হাজার, ২১ নং আয়াত ।)

একারণেই মহান আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী যে কোন কাজ বা ঘটনারই উদ্ভব ঘটকু না কেন, তার সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত

ভাগ্য অনুযায়ী যা কিছু সৃষ্টি বা সংঘটিত হোক না কেন, তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিশেষ পরিমাণ ও মাত্রা অনুযায়ীই হবে । এ ব্যাপারে সামান্যতম ব্যতিক্রমও কখনো ঘটবে না ।

## মানুষ ও স্বাধীনতা

মানুষ যে সকল কাজ সম্পাদন করে, এ সৃষ্টি জগতের অন্যসব সৃষ্টির ন্যায় তাও এক সৃষ্টি । তার সংঘটন প্রক্রিয়া ও এজগতের অন্য সকল সৃষ্টির মতই পূর্ণাঙ্গ কারণ সংঘটিত হওয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । কারণ, মানুষও এসৃষ্টি জগতেরই অংশ স্বরূপ । এ জগতের অন্য সকল সৃষ্টির সাথেই তার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । তাই তার সম্পাদিত ক্রিয়ায় সৃষ্টির অন্য সকল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করা যাবে না । যেমন : মানুষের একমুঠো ভাত খাওয়ার কথাই চিন্তা করে দেখা যাক । এ সামান্য কাজের মধ্যে আমাদের হাত, মুখ, দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি, ইচ্ছা সবই ওতপ্রোতাভাবে জড়িত । ভাতের অস্তিত্ব ও তা হাতের নাগালে থাকা, তা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বাধা বিঘ্নের অস্তিত্ব না থাকাসহ স্থান- কাল সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তের উপস্থিতির প্রয়োজন । ঐসব শর্ত বা কারণের একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ কাজ সাধ্যের বাইরে চলে যায় । আর ঐ সকল শর্ত বা (পূর্ণাঙ্গ কারণের উপস্থিতি) কারণ সমূহের উপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট কাজটির সম্পাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে । পূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কারণের উপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে । তেমনি কোন ক্রিয়া মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সময়, মানুষ যেহেতু পূর্ণাঙ্গ কারণের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত, তাই মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সম্পর্ক হচ্ছে 'সম্ভাব্যতার' সম্পর্ক । (কারণ মানুষ একাই পূর্ণাঙ্গ কারণ নয় । বরং মানুষও ঐ ক্রিয়ার অন্যান্য অপূর্ণাঙ্গ কারণগুলোর মতই একটি আংশিক কারণ মাত্র ।) কোন ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে । ঐ ক্রিয়ার সাথে সামগ্রিক (পূর্ণাঙ্গ কারণ) কারণের সম্পর্ক হচ্ছে 'অপরিহার্যতার' ( অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কারণ ঘটলেই এ ক্রিয়ার সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে) সম্পর্ক ।

কিন্তু মানুষ নিজে যেহেতু একটি অপূর্ণাঙ্গ বা আংশিক কারণ, তাই তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক অবশ্যই 'অপরিহার্যতা মূলক' হবে না। মানুষের সহজ- সরল নিষ্পাপ উপলদ্ধিও উপরোক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করবে। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ সাধারণতঃ খাওয়া পান করা, যাওয়া আসা সহ ইত্যাদি কাজের সাথে সুস্থতা, ব্যাধি, সুন্দর হওয়া বা কুশ্রী হওয়া, লম্বা হওয়া বা খাটো হওয়া ইত্যাদির মত বিষয়গুলোকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। প্রথম শ্রেণীর কাজগুলো মানুষের ইচ্ছার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ঐসব কাজ করা বা না করার ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ঐ ধরণের কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষ আদেশ, নিষেধ, প্রশংসা বা তিরস্কারের সম্মুখীন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর (সুন্দর বা কুশ্রী হওয়া, লম্বা বা খাটো হওয়া) কাজ বা বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষের আদৌ কোন দায়িত্ব নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' মধ্যে মানুষের সম্পাদিত কাজের ব্যাপারে দু'টো বিখ্যাত মতাবলম্বি দলের অস্তিত্ব ছিল। তাদের একটি দলের বিশ্বাস অনুসারে মানুষের সম্পাদিত কাজসমূহ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষ তার কাজকর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। তাদের মতে মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার কোন মূল্যই নেই। আর দ্বিতীয় দলটির মতে মানুষ তার কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কাজের সাথে আল্লাহর ইচ্ছার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্য সংক্রান্ত নিয়মনীতি থেকে মুক্ত। কিন্তু আহলে বাইতগণের (আ.) শিক্ষানুযায়ী (যাদের শিক্ষা পবিত্র কুরআনের শিক্ষারই অনুরূপ) মানুষ তার কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। তবে এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। বরং মহান আল্লাহ আপন স্বাধীনতার মাধ্যমে ঐ কাজটি সম্পাদন করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মানুষের কাজ নির্বাচন করার স্বাধীনতা অন্যান্য অপূর্ণাঙ্গ কারণসমূহের মতই একটি আংশিক কারণ মাত্র। তাই কারণের পূর্ণতা অর্জন মাত্রই তা বাস্তবায়নের 'অপরিহার্যতা' আল্লাহই প্রদান করেছেন এবং তা আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন। তাই এর ফলে আল্লাহর এ ধরণের ইচ্ছা, 'অপরিহার্য' ক্রিয়াস্বরূপ আর মানুষও ঐ ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন বটে। অর্থাৎ ঐ ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক (পূর্ণাঙ্গ) কারণ সমূহের মোকাবিলায়

ক্রিয়ার বাস্তবায়ন অপরিহার্য । আর মানুষের কার্যনির্বাচন বা সম্পাদনের স্বাধীনতা তার কার্য সম্পাদনের অসংখ্য অসম্পূর্ণ কারণগুলোর মত একটি আংশিক কারণ মাত্র । তাই তার ঐ স্বাধীনতা (যা পূর্ণাঙ্গ কারণের একটি অংশ মাত্র) প্রেক্ষাপটে ঐ কাজটি ঐচ্ছিক ও সম্ভাব্য (অপরিহার্য নয়) একটি বিষয় মাত্র ।

ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : মানুষ তার কাজে সম্পূর্ণ পরাধীনও নয় আবার সম্পূর্ণ সার্বভৌমও নয় । বরং এ ক্ষেত্রে মানুষ এ দু'য়ের মাঝামাঝিই অবস্থান করছে ।[১৪৫]

**লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য গণ হেদায়েত**

যদি একটি ধানের বীজ উপযুক্ত পরিবেশে মাটির বুকে পোতাঁ হয়, তাহলে তাতে দ্রুত অংকুরোদগম ঘটে ও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন ঐ অংকুরটি প্রতি মূহুর্তেই একেকটি নতুন অবস্থা ধারণ করতে থাকে । এভাবে প্রকৃতি নির্ধারিত একটি সুশৃংখল পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পথ অতিক্রম করে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ধান গাছে রূপান্তরিত হয়, যার মধ্যে নতুন ধানের শীষ শোভা পেতে থাকে । এখন আবার যদি ঐ ধানের শীষ থেকে একটি ধানের বীজ মাটিতে পড়ে, তাহলে তাও পুনরায় পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে অবশেষে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ধান গাছে রূপান্তরিত হবে । একটি ফলের বীজ যদি মাটির বুকে প্রবেশ করে, তাহলে এক সময় তার আবরণ ভেদ করে সবজু ও কচি অংকুর বের হয় । এরপর ঐ কচি অংকুরটিও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ ও ফলবান বৃক্ষে রূপান্তরিত হয় । প্রাণীজ শুক্রানু যদি ডিম্বানু বা মাতৃগর্ভে স্থাপিত হয়, তাহলে তা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে শুরু করে । এরপর তা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তের পর তার পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং তা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় । উক্ত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পথ অতিক্রমের নির্দিষ্ট একটি পরিণতিতে উন্নীত হওয়ার এই নিয়ম নীতি এ সৃষ্টিজগত ও প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান । ধানের বীজ বিকশিত হয়ে কখনোই একটি গরু বা ছাগেল বা ভেড়ায় রূপান্তরিত হয় না । তেমনি প্রাণীর বীর্য সমগোত্রীয় প্রাণীর গর্ভে স্থাপিত হয়ে

কখনোই তা ধান বা ফল গাছে পরিণত হবে না । এমনকি ঐ গাছ বা প্রাণীর গর্ভ ধারণ ক্রিয়ায় যদি ক্রুটিও থেকে থাকে, তাহলে দৈহিক ক্রুটিসম্পন্ন গাছ বা প্রাণীর জন্ম হতে পারে কিন্তু তার ফলে বিষম গোত্রীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্ম লাভ ঘটবে না ।

এ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু, উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যেই একটি সুশৃংখল ও সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়ার নিয়মনীতি নিহিত রয়েছে । এ জগতের প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে সুপ্ত বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়া ও তার নিয়মনীতির অস্তিত্ব এক অনস্বিকার্য ও বাস্তব সত্য । উল্লেখিত সূত্র থেকে দু'টো বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেগুলো নিম্নরূপঃ

১ । জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার জন্মের পর থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভের যে স্তরগুলো অতিক্রম করে, সেগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটি গভীর ও সুশৃংখল সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে । যার ফলে বিকাশ লাভের প্রতিটি স্তর অতিক্রমের পর তা তার পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রগামী হয় ।

২ । বিকাশের এ স্তরগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সংযোগ ও সুশৃংখল সম্পর্কের কারণেই তার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার পর ঐ নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণীর পূর্ণাঙ্গরূপই লাভ করতে দেখা যায় । আর এ নীতির বৈপরীত্য সৃষ্টি জগতে বা প্রকৃতির কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । যেমনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে ধানের বীজ বিকশিত হয়ে কোন প্রাণীতে পরিণত হয় না । তেমনি নির্দিষ্ট কোন প্রাণীর বীর্য্য বিকশিত হয়ে কোন উদ্ভিদ বা অন্য কোন প্রাণীর জন্ম দেয় না । প্রকৃতির সর্বত্রই সকল প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রত্যেকেই তার সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার গোত্রীয় স্বকীয়তা বজায় রাখে ।

পবিত্র কুরআনে, প্রকৃতিতে বিরাজমান এই সুশৃংখল নীতির পরিচালক হিসেবে মহান আল্লাহকেই পরিচিত করানো হয়েছে । তিনি এ প্রকৃতির একমাত্র ও নিরংকুশ প্রতিপালক ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশনা দিয়েছেন । (সূরা আত 'ত্বা'হা' ৫০ নং আয়াত ।)

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে : যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন এবং পথ পদর্শন করেছেন । (সূরা আল আ'লা, ২ ও ৩ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ এর ফলাফল স্বরূপ বলেন : প্রতিটি জিনিসেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, যে (দিকে) লক্ষ্য পানে সে অগ্রসর হয় । (সূরা আল বাকারা, ১৪৮ নং আয়াত ।)

আমরা নভো- মণ্ডল ও ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে (লক্ষ্যহীন ভাবে) সৃষ্টি করিনি; আমরা এ গুলোকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি (প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে) করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না । (সূরা আদ্ দুখান ৩৯ নং আয়াত ।)

**বিশেষ হেদায়েত**

এটা একটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, মানব জাতিও এ সকল সাধারণ ও সার্বজনীন নীতি থেকে মুক্ত নয় । সৃষ্টিগত ঐশী নির্দেশনা নীতি যা সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে, তা মানুষের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করবে । যেমন করে এ বিশ্বের প্রতিটি অস্তিত্ব তার সর্বস্ব দিয়ে পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে অগ্রগামী হয় এবং নির্ধারিত পথও প্রাপ্ত হয় । একইভাবে মানুষও ঐ প্রাকৃতিক ঐশী পথ নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরিচালিত হয় । একই সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সাথে মানুষের যেমন অসংখ্য সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি অসংখ্য বৈসাদৃশ্যও তার রয়েছে । ঐ সব বৈসাদৃশ্য মূলক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষকে অন্য সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পৃথক করা যায় । বুদ্ধিমত্তাই মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা দান করেছে । আর এর মাধ্যমেই মানুষ তার নিজের স্বার্থে মহাশূন্য মহাসাগরের গভীর তলদেশকেও জয় করতে সক্ষম হয়েছে । মানুষ এই ভুপৃষ্ঠের সকল বস্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের উপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাকে নিজ সেবায় নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছে । এমনকি যতদুর সম্ভব, মানুষ তার স্বজাতির কাছ থেকেও কম বেশী লাভবান হয় ।

মানুষ তার প্রাথমিক স্বভাব অনুযায়ী নিরংকুশ স্বাধীনতা অর্জনের মাঝেই তার বিশ্বাসগত সৌভাগ্য এবং পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে বলে মনে করে । কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতিই সামাজিক সংগঠন সদৃশ্য ।

মানব জীবনে অসংখ্য প্রয়োজন রয়েছে । এককভাবে ঐসব প্রয়োজন মেটানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । একমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ভাবেই এই মানব জীবনের ঐসব অভাব মেটানো সম্ভব । অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বজাতীয় স্বাধীনতাকামী ও আত্মঅহংকারী মানুষের সহযোগিতা গ্রহণে বাধ্য । এর ফলে মানুষ তার স্বাধীনতার কিয়দংশ এ পথে হারাতে বাধ্য হয় । এক্ষেত্রে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে যতটকু পরিমাণ লাভবান হয়, তার মোকাবিলায় সমপরিমাণ লাভ তাকে পরিশোধ করতে হয় । অন্যদের কষ্ট থেকে সে যতদুর লাভবান হয়, অন্যদের লাভবান করার জন্য ঐ পরিমাণ কষ্টও তাকে সহ্য করতে হয় । অর্থাৎ পারস্পরিক সামাজিক সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদানে মানুষ বাধ্য । নবজাতক ও শিশুদের আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই এ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে । নবজাতক শিশু শুধুমাত্র কান্না এবং জিদ ছাড়া নিজের চাহিদা পূরণের জন্য আর অন্য কোন পন্থার আশ্রয় নেয় না । কোন নিয়ম- কানুনই তারা মানতে চায় না । কিন্তু শিশুর বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই তার চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে । এর ফলে ক্রমেই সে বুঝতে শেখে যে, শুধুমাত্র জিদ ও অবাধ্যতা এবং গায়ের জোর খাটিয়ে জীবন চালানো সম্ভব নয় । বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমেই সে সমাজের লোকজনের সংস্পর্শে আসে । এরপর ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে পূর্ণাঙ্গ এক সামাজিক বিশ্বাসত্বে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবে সে সামাজিক আইন- কানুনের পরিবেশের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় । পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ মেনে নেয়ার পাশাপাশি মানুষ আইনের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে । যে আইন সমগ্র সমাজকে শাসন করবে, এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিতে দায়িত্বও নির্ধারণ করবে । সেখানে আইন লংঘনকারীর শাস্তিও নির্দিষ্ট থাকবে । উক্ত আইন সমাজে প্রচলিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে । সৎ ব্যক্তি তার প্রাপ্য হিসেবে উপযুক্ত সামাজিক সম্মানের অধিকারী হবে । আর এটাই সেই সার্বজনীন আইন, যা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানব জাতি যার আকাংখী ও অনুরাগী হয়ে আছে । মানব জাতি চিরদিন তার ঐ কাংখিত সামাজিক আইনকে তার হৃদয়ের আশা- আকাংখার শীর্ষে স্থান দিয়ে এসেছে । আর তাই মানুষ সব সময়ই তার ঐ কাংখিত

আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে । তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ঐ কাংখিত আইন প্রতিষ্ঠা যদি অবাস্তব হত, এবং মানব জাতির ভাগ্যে যদি তা লেখা না থাকতো, তাহলে চিরদিন তা মানব জাতির কাংখিত বস্তু হয়ে থাকতো না ।[১৪৬]

মহান আল্লাহ এই পবিত্র কুরআনে মানব সমাজের এই সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ "আমরাই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং এক জনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি, যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে ।"[১৪৭]

মানুষের আত্ম- অহমিকা ও স্বার্থপরতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : মানুষতো অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে সৃষ্টি হয়েছে । যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা- হুতাশকারী । আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতিশয় কৃপণ । (সূরা আল্ মাআ'রিজ, ২১ নং আয়াত ।)

## বুদ্ধিবৃত্তি ও আইন 'ওহী' নামে অভিহিত

আমরা যদি খুব সূক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মানুষের আজন্ম কাংখিত আইন, যার প্রয়োজনীয়তা মানুষ বিশ্বাসগত বা সমষ্টিগতভাবে তার খোদাপ্রদত্ত স্বভাব দ্বারা উপলব্ধি করে, যে আইন মানব জাতির সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে । সেটা একমাত্র সেই আইন, যা এই মনুষ্য জগতকে মনুষ্য হওয়ার কারণে কোন বৈষম্য বা ব্যতিক্রম ছাড়াই সাফল্যের শীর্ষে পৌছায় । এ ছাড়া তা মানব জাতির সার্বজনীন পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে । আর এটাও সর্বজন বিধিত ব্যাপার যে, মানব জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রসূত এমন কোন আদর্শ আইন আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি । মানুষ যদি প্রাকৃতিক ভাবে তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এমন কোন আদর্শ আইন রচনা করতে সক্ষম হত, তাহলে এই সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসে তা অবশ্যই আমাদের সবার গোচরীভূত হত । বরঞ্চ, উচ্চ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যে কোন বিশ্বাস ঐ আদর্শ আইন সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জ্ঞানের অধিকারী হতেন, যেমনটি বুদ্ধিমান

সমাজ তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি করে । আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায় যে, মানব সমাজের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন আইন, যার মাধ্যমে এ সৃষ্টিজগত প্রাকৃতিক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তা প্রণয়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা যদি মানুষের বুদ্ধিমত্তার উপর অর্পিত হত তাহলে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হত । ঠিক যেমন করে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে তার লাভ ক্ষতি এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তেমনি ঐ জাতীয় আইনের উপলব্ধি তার জন্য অতি সহজ ব্যাপারই হত । কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, মানব রচিত এমন কোন আদেশের আইনের সন্ধানই খুজে পাওয়া যায় না । মানব ইতিহাসে একক কোন ব্যক্তির, গোষ্ঠি বা জাতি সমূহের দ্বারা যেসব আইন এ যাবৎ প্রণীত হয়েছে, তা কোন একটি জনসমষ্টির কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত হলেও অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত নয় । অনেকেই ঐ নির্দিষ্ট আইন সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও অনেকেই আবার সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয় । খোদা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং সৃষ্টিগতভাবে সমান মানুষ ঐ ধরণের মানব রচিত আইন সম্পর্কে সমপর্যায়ের সৃষ্টি মানব জাতিও উপলব্ধি পোষণ করে না ।

**'ওহী' নামে অভিহিত রহস্যাবৃত উপলব্ধি**

পূর্বের আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, বুদ্ধিমত্তা, মানব জীবনের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক নীতিমালা উপলব্ধি করতে অক্ষম । অথচ মানব জাতিকে সত্য পথে পরিচালনার লক্ষ্যে এ আদর্শ বিধান উপলব্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিতি মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ঐ ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বাসই মানুষকে জীবনের প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন এবং আপামর জনসাধারণের কাছে সে ধারণা পৌছে দেবেন । আদর্শ বিধান অনুধাবনের ঐ বিশেষ ক্ষমতা, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও সাধারণ অনুভুতির বাইরে, তা ওহী বা ঐশীবাণী উপলব্ধির ক্ষমতা হিসেবে পরিচিত । মানব জাতির মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, একইভাবে অন্য লোকেরাও ঐ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রতিটি মানুষের মধ্যেই

জন্মগতভাবে যৌন ক্ষমতা নিহিত রয়েছে । কিন্তু যৌন তৃপ্তির উপলদ্ধি ও তা উপভোগ করার মত যোগ্যতা শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যাবে, যারা সাবালকত্বের বয়সে উপনীত হয়েছে । নাবালক শিশুর কাছে যৌন তৃপ্তির প্রকৃতি যেমন দূর্বোধ্য এবং রহস্যাবৃত, ওহী বা ঐশীবাণী অনুধাবনে অক্ষম মানুষের কাছে তার মর্ম উপলদ্ধির বিষয়টিও তেমনি রহস্যাবৃত ।

মহান আল্লাহ তার পবিত্র ঐশীবাণী অনুধাবনে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার অক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনে বলেন : "আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেমনটি নুহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম । ..... আমরা সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে ।" ( সূরা আন্ নিসা, ১৬২ নং আয়াত ।)

## নবীগণ ও 'ইসমাত' বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণ

মানবজাতির মাঝে নবীগণের আবির্ভাব পূর্বের আলোচনার সত্যতাই প্রমাণ করে । আল্লাহর নবীগণ এমনসব ব্যক্তি ছিলেন, যারা ওহী বা ঐশীবাণী বহন ও নবুয়তের দাবী করেছেন । তারা তাদের ঐ দাবীর স্বপক্ষে অকাট্য দলিল- প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন । মানবজাতির সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক ঐশী বিধানই মানুষের মাঝে প্রচার ও আপামর জনসাধারণের কাছে তার অমিয়বাণী তারা পৌছে দিয়েছেন । আল্লাহর নবীগণ ওহী বা ঐশীবাণী এবং নবুয়তের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন । তাই যে যুগেই নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে একই যুগে একজন অথবা অল্পসংখ্যক নবীর বেশী একই সাথে আবির্ভূত হননি । মহান আল্লাহ নবীদেরকে তার ঐশী বিধান প্রচারের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে সত্য পথে (হেদায়েত) পরিচালনার দায়িত্বের কাজ পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করেছেন । এ থেকেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ নবীকে অবশ্যই 'ইসমাত' বা 'নিষ্পাপের গুণে গুনান্বিত হতে হবে । অর্থাৎ মহান আল্লাহর ওহী বা ঐশীবাণী গ্রহণ, ধারণ এবং তা জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই যে

কোন ধরণের ভুল বা ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে নিরাপদ থাকতে হবে । তেমনি যেকোন ধরণের পাপ বা অবাধ্যতা (ঐশী বিধানের লঘংন) থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে । যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, মহান ঐশীবাণী গ্রহণ, সংরক্ষণ ও জনগণের কাছে তা প্রচারের বিষয়টি খোদাপ্রদত্ত সৃষ্টিগত হেদায়েতের প্রক্রিয়ার তিনটি মৌলিক ভিত্তি বিশেষ । আর সৃষ্টিগত (প্রাকৃতিক) প্রক্রিয়ায় ভুলের কোন স্থান নেই । আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে পাপ বা অবাধ্যতা (ঐশী বিধান লংঘনমূলক) প্রচারকার্যের বাস্তব বিরোধিতা বটে । শুধু তাই নয়, এর ফলে প্রচারকারী পাপজনিত কারণে প্রচারের ব্যাপারে তার প্রতি জনগণের আস্থা ও স্বীয় বিশ্বস্ততা হারায় । এর মাধ্যমে ঐশী আদর্শ প্রচারের মহতী উদ্দেশ্য ধ্বংস হয়ে যায় । তাই মহান আল্লাহ নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার (ইসমাত) ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি বলেছেন : "তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম । (সূরা আল্ আনআম, ৮৭ নং আয়াত ।)

তিনি আরও বলেছেন : তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী । তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না, শুধুমাত্র তার মনোনীত রাসূল ছাড়া । সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের আগে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন । রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কিনা, তা জানার জন্য । (সূরা জ্বিন, ২৬ থেকে ২৭ নং আয়াত ।)

## নবীগণ ও ঐশীধর্ম

মহান আল্লাহর নবীগণ ওহীর মাধ্যমে যা পেয়েছেন এবং জনগণের মাঝে আল্লাহর পবিত্র ঐশীবাণী হিসেবে প্রচার করেছেন, তাই দ্বীন হিসেবে পরিচিত । অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের সঠিক পদ্ধতি ও জীবনের পালনীয় ঐশী দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, যা মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে, তারই নাম দ্বীন ।

এই ঐশী ‘দ্বীন’ বা ধর্ম বিশ্বাসগত ও ব্যবহারিক এই দু’টি অংশ নিয়ে গঠিত। বিশ্বাসগত অংশটি এক ধরণের মৌলিক বিশ্বাস ও কিছু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে গঠিত, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবনযাপন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এই মৌলিক বিশ্বাসের তিনটি মূল অংশ রয়েছে :

১. একত্ববাদ

২. নবুয়ত

৩. পুনরুত্থান বা কেয়ামত

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের একটিতেও যদি বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, তাহলে ‘দ্বীন’ বা ধর্ম সেখানে অস্তিত্ব লাভ করতে পারবে না। ‘দ্বীনের’ ব্যবহারিক অংশ : এ অংশটিও বেশ কিছু ব্যবহারিক ও আচরণগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমন্বয়ে রচিত। মূলত সর্বস্রষ্টা আল্লাহ ও সমাজের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করেই এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রচিত। এ কারণেই ঐশীবিধান নির্দেশিত মানুষের দায়িত্ব সাধারণতঃ দু’ভাগে বিভক্ত :

১। ব্যবহারিক কিছু কাজের দায়িত্ব এবং

২। শিষ্টাচারগত কর্তব্য

এদু’টি অংশ আবার দু’ভাগে বিভক্ত যেমনঃ বেশ কিছু ব্যবহারিক কাজ ও শিষ্টাচার শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট যথাঃ সচ্চরিত্র, ঈমান, সততা, নিষ্কলুষতা, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন, তার প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ, নামায, রোযা, কুরবানী এবং এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত, আল্লাহর প্রতি ভক্তি পোষণ ইত্যাদি মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত ও অনুগত দাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আবার বেশ কিছু শিষ্টাচার ও কাজ আছে যা সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন মানুষের সদাচারণ, মানুষের কল্যাণ কামনা, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, মানুষের পারস্পরিক মেলামেশা সংক্রান্ত দায়িত্ব, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি। এ অংশটি সাধারণতঃ পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে পরিচিত। ওদিকে মানব জাতি সর্বদাই ক্রম উন্নয়নমুখী। সর্বদাই মানুষ পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বকামী। তাই মানব সমাজ সময়ের আবর্তনে ক্রমশই উন্নততর হয়। তাই ঐশী বিধানের ক্রমোন্নতি বা বিকাশও অপরিহার্য। আর পবিত্র কুরআনও এই

ক্রমোন্নতি ও বিকাশকে (যেমনটি বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে) সমর্থন করে । যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে, এযাবৎ অবতির্ণ প্রতিটি ঐশী বিধানই তার পূর্বের ঐশী বিধানের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নততর ।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আমি আপনার প্রতি সত্যসহ ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) অবতির্ণ করেছি যা এর পূর্বে অবতির্ণ ঐশীগ্রন্থের (যেমন ইঞ্জিল, তৌরাত) সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বরূপ । (সূরা আল্ মায়েদা, ৪৮ নং আয়াত ।)

বিজ্ঞান এবং কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জীবন অমর ও চিরন্তন নয় । তাই তার উন্নয়ন ও বিকাশও অন্তহীন নয় । এ কারণে বিশ্বাস ও কাজের দিক থেকে মানুষের দায়িত্বও একটি বিশেষ স্তরে এসে থেম যেতে বাধ্য । একইভাবে মৌলিক বিশ্বাসের পূর্ণতা ও ব্যবহারিক ঐশী বিধানের বিস্তৃতি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছার কারণে নবুয়ত ও শরীয়তের (ঐশীবিধান) বিকাশ ধারার সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য । এ কারণেই পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সর্বশেষ নবী এবং ইসলামকে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্বম ঐশীধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে । আর একথাও বলেছে যে, এই ঐশীগ্রন্থ (পবিত্র কুরআন) চির অপরিবর্তনীয় ও মহানবী (সা.) নবুয়তের ধারা সমাপণকারী । আর ইসলাম ধর্মকে মানুষের সকল প্রয়োজনীয় দায়িত্বের আধার হিসেবে পরিচিত করিয়েছেন ।

তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : “এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ এর সামনে বা পিছনে কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না ।” ( সূরা ফসুসিলাত, ৪১- ৪২ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরও বলেন : ‘মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী ।’

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে : আমি তোমাদের জন্যে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখা স্বরূপ এই ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) অবতির্ণ করেছি । (সূরা আন্ নাহল, ৮৯ নং আয়াত ।)

নবীগণ ও ‘ওহী’ জনিত প্রমাণ এবং নবুয়ত

বর্তমান পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানী, গবেষক ও পণ্ডিতগণই ওহী (ঐশীবাণী) ও নবুয়ত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলিয়েছেন এবং তাদের গবেষণালদ্ধ ফলাফলকে

সামাজিক মনস্তত্বের ভিত্তিতে ব্যাখাও দিয়েছেন । তাদের ব্যাখা অনুসারে পৃথিবীর ইতিহাসে আগত আল্লাহর নবীগণ ছিলেন পবিত্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি । তারা ছিলেন অত্যন্ত মহতী উদ্দেশ্যের অধিকারী, মানব হিতাকাংখী । তাঁরা মানব জাতির পার্থিব ও আত্মিক উন্নয়ন ও দূর্নীতিপূর্ণ সমাজ সংস্কারের জন্য আদর্শ আইন প্রণয়ন করেন এবং মানুষকে তা গ্রহণের আহবান জানান । যেহেতু সে যুগের মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিগত যুক্তির কাছে আত্মসমর্পন করতো না, তাই বাধ্য হয়ে তাদের আনুগত্য ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই তারা নিজেদেরকে এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে উচ্চতর ও ঐশীজগতের সাথে সম্পর্কিত বলে ঘোষণা করেন । তারা নিজেদের পবিত্র আত্মাকে 'রূহুল কুদুস্' ( পবিত্র আত্মা) এবং তা থেকে নিঃসৃত চিন্তাধারাকে 'ওহী' ও 'নবুয়ত' হিসেবে ঘোষণা করেন । আর তদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সমূহকে 'শরীয়ত' বা ঐশীবিধান এবং যে গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ আছে তাকে 'ঐশীবাণী' হিসেবে অভিহিত করেন ।

কিন্তু ন্যায়বিচারপূর্ণ সুগভীর দৃষ্টিতে ঐ ঐশী গন্থসমূহ, বিশেষ করে পবিত্র কুরআন এবং নবীগণের শরীয়ত (ঐশী বিধানসমূহ) পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্যই এ ব্যাপারে সবাই একমত হতে বাধ্য যে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত মতামতটি সঠিক নয় ।

আল্লাহর নবীগণ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না । বরং তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যের প্রতিভু । কোন ধরণের অতিরঞ্জন ছাড়াই তারা তাদের অনুভুতি ও উপলদ্ধির কথা প্রকাশ করতেন । যা তারা বলতেন, তাই তারা করতেন । 'ওহী' প্রাপ্তির যে দাবীটি তারা করতেন, তা ছিল এক রহস্যাবৃত বিশেষ উপলদ্ধি, যা অদৃশ্য সহযোগীতায় তাদের সাথে যুক্ত হত । এভাবে তারা বিশ্বাসগত ব্যবহারিক কাজের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হতেন এবং তা জনগণের কাছে পৌছে দিতেন । উপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, নবুয়তের দাবী মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট যুক্তি ও দলিল প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে । নবীদের আনীত ঐশীবিধান (শরীয়ত) বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার অনুকুলে হওয়াই নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয় । কারণ নবুয়তের দাবীদার নবী রাসূলগণ নিজেদের আনীত ঐশীবিধানের (শরীয়ত) সত্যতা ও পরিশুদ্ধতার পাশাপাশি উচ্চতর ও ঐশীজগতের সাথে নিজেদের সংযুক্ত (ওহী ও নবুয়ত) দাবী

করেন । তারা দাবী করেন যে,  মানুষকে সৎপথের দিকে আহবান করার জন্যে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত । আর এই দাবী অবশ্যই তার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । আর একারণে প্রতি যুগেই (যেমনটি পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে) মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর ভিত্তি করেই নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এর দাবীকারীদের কাছে নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ বিশেষ অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছে । আর মানুষের এই সহজ সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে,  নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অন্য সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে না । এই বিশেষ পদের জন্যে এমন বিশেষ এক অদৃশ্য ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য,  যা মহান আল্লাহ অলৌকিক ভাবে একমাত্র তার নবীগণকেই দান করেন । আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিশেষ ক্ষমতা বলে নবীগণ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হন এবং দায়িত্ব স্বরূপ জনগণের কাছে তা পৌছে দেন । তাই তাদের দাবী যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে,  তাদের ঐ দাবীর সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর কাছে অলৌকিক কোন কান্ড পদর্শনের আবেদন জানানো উচিত,  যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের দাবীর সত্যতা বিশ্বাস করতে পারে । এ বিষয়টি পরিস্কার যে যুক্তি ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে নবীদের কাছে তাদের নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ অলৌকিক কোন কান্ড (মু'জিযা) প্রদর্শনের দাবী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যৌক্তিকতাপূর্ণ একটি ব্যাপার । তাই নবীদেরকে তাদের সত্যতার প্রমাণের উদ্দেশ্যেপ্রথমেই জনগণের দাবী অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) পদর্শন করা উচিত । এমনকি পবিত্র কুরআনও এই যুক্তিকে জোরালো ভাবে সমর্থন করেছে । তাই পবিত্র কুরআনেও নবীদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে,  তাঁরা তাদের নবুয়ত প্রমাণের স্বার্থে প্রথমেই অথবা জনগণের দাবী অনুযায়ী অলৌকিক কান্ড (মু'যিজা) প্রদর্শন করেছেন । অবশ্য অনেক খুতখুতে লোকই নবীদের ঐসব অলৌকিক কান্ডের (মু'যিজা) অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে । কিন্তু তাদের ঐ অস্বীকৃতির পেছনে শক্তিশালী কোন যুক্তি তারা দাড়ঁ করাতে সক্ষম হয়নি । কোন ঘটনার জন্যে আজ পর্যন্ত যেসব কারণ সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে,  সেগুলোর চিরন্তন ও স্থায়ী হবার পেছনে কোন দলিল বা যুক্তিই নেই । আর কোন

ঘটনাই তার নিজস্ব ও স্বাভাবিক শর্ত ও কারণ সমূহ পূর্ণ হওয়া ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না । যেসব অলৌকিক কান্ড আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত, তা প্রকৃতঅর্থে মৌলিকভাবে অসম্ভব এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞা বিরোধী (যেমন, জোড় সংখ্যা বিজোড় সংখ্যায় রূপান্তরিত হওয়া যা অসম্ভব) ব্যাপার নয় বরং তা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার, যেমনটি বহু সাধু পরুষের ক্ষেত্রেই অতীতে দেখা ও শোনা গিয়েছে ।

## আল্লাহর নবীদের সংখ্যা

ইতিহাসের সাক্ষানুসারে আল্লাহর অসংখ্য নবীই এ পৃথিবীতে এসেছেন । পবিত্র কুরআনও এ বিষয়েরই সাক্ষী দেয় । যাদের মধ্যে অনেকের নাম ও ইতিহাসই পবিত্র কুরআন উল্লেখ করেছে । আবার তাদের অনেকের নামই পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়নি ।

কিন্তু নবীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য কারো কাছেই নেই । এ ব্যাপারে হযরত আবুজার গিফারী (রা.) বর্ণিত রাসূল (সা.)- এর এ সংক্রান্ত হাদীসই আমাদের একমাত্র সম্বল । ঐ হাদীসের তথ্য অনুসারে নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ।

### শরীয়ত প্রবর্তক ‘উলুল আযম’ নবীগণ

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুসারে প্রত্যেক নবীই শরীয়তের (ইসলামী আইন শাস্ত্র) অধিকরী ছিলেন না । নবীদের মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচজনই ছিলেন ‘শরীয়ত’ প্রবর্তক । যারা হচ্ছেন : হযরত নুহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) । অন্যান্য নবীগণ এসব ‘উলুল আযম’ নবীদের আনীত শরীয়তের অনুসারী ছিলেন ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : তিনি তোমাদের জন্যে দীনকে বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তিনি নুহ কে- আর যা আমি ‘ওহী’ (প্রত্যাদেশ) করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে । (সূরা আশ শুরা, ১২ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরো বলেন যে, "স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে, এবং ইব্রাহীম, মুসা ও মারিয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, আর তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আল্ আহযাব, ৭ নং আয়াত।)

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুয়ত

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- ই সর্বশেষ নবী। পবিত্র কুরআন তার উপর অবতির্ণ হয়েছে এবং তিনিই 'শরীয়ত' প্রবর্তক। বিশ্বের সকল মুসলমানই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হিজরী চন্দ্র বর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় তিপ্পান্ন বছর পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশের বনি হাশিম গোত্রের (সম্মানিত বংশ হিসেবে খ্যাত) জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম ছিল আমিনা। শৈশবের পাক্কালেই তিনি তার বাবা ও মাকে হারান। এরপর তাঁর দাদা জনাব আব্দুল মুত্তালিব তাঁর অভিভাবক হন। কিন্তু এর অল্প ক'দিন পর তার স্নেহময় দাদাও পরলোক গমন করেন। তারপর তার চাচা জনাব আবু তালিব দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘরে তাকে নিয়ে যান। তারপর থেকে মহানবী চাচার বাড়িতেই মানুষ হতে লাগলেন। মহানবী (সা.) সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই চাচার সাথে ব্যবসায়িক সফরে দামেস্ক গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) কারো কাছেই লেখাপড়া শেখেননি। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর থেকেই তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, ভদ্র এবং বিশ্বস্ত হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর এই বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার কারণেই মক্কার জনৈকা বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মহিলা তাকে তার ব্যবসা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করেন। ঐ ব্যবসার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আবারও দামেস্ক ভ্রমণ করেন। ঐ ব্যবসায়িক ভ্রমনে নিজের অতুলনীয় যোগ্যতার কারণে মহানবী (সা.) সেবার প্রচুর পরিমাণে লাভবান হন। মহানবী (সা.)- এর ঐ অতুলনীয় যোগ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর অল্প ক'দিন পরই মক্কার ঐ বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মহিলা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মহানবী (সা.)- ও ঐ পস্তাব মেনে নেন। অতঃপর মহানবী (সা.)- এর সাথে ঐ ভদ্র মহিলার বিয়ে হয়। বিয়ের সময়

মহানবী (সা.)- এর বয়স ছিল পচিশ বছর । বিয়ের পর চল্লিশ বছর বয়সে পৌছা পর্যন্ত এভাবেই মহানবী (সা.) তার দাম্পত্য জীবন কাটান । এসময় অসাধারণ বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার জন্যে জনগণের মধ্যে তিনি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন । কিন্তু কখনোই তিনি মূর্তি পুজা করেননি । অথচ মূর্তি পুজোই ছিল সে যুগের আরবদের ধর্ম । তিনি প্রায়ই নির্জনে গিয়ে সর্বস্রষ্টা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও ধ্যান করতেন । এভাবে একবার যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'তাহামা' পাহাড়ের 'হেরা' গুহায় বসে নির্জনে মহান আল্লাহর ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন । তখনই আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন । পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম সূরাটি (সূরা আলাক) তখনই তার প্রতি অবতির্ণ হয় । এ ঘটনার পর তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে যান । বাড়ী ফেরার পথে স্বীয় চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে তার সাক্ষাত হয় । তিনি সব কিছু তাকে খুলে বলেন । হযরত আলী (আ.) সাথে সাথেই তাকে নবী হিসেবে মেনে নেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন । অতঃপর বাড়িতে ফিরে স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)- কেও সব কিছু খুলে বলেন এবং হযরত খাদিজা (রা.)- ও সাথে সাথেই নবী হিসেবে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন । মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম যখন জনগণকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান জানান, তখন তিনি অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন । যার ফলে বাধ্য হয়ে বেশ কিছু দিন যাবৎ তিনি গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান । পুনরায় তিনি নিজ আত্মীয়স্বজনের কাছে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন । কিন্তু তার ঐ প্রচেষ্টা সফল হয়নি । আত্মীয়দের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি । (অবশ্য নির্ভরযোগ্য শীয়া সূত্র অনুযায়ী যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তিনি মহানবী (সা.) এর একমাত্র সহযোগী ছিলেন, তাই ইসলাম জনসমক্ষে শক্তিশালী রূপধারণ করা পর্যন্ত কুরাইশদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জনগণের কাছে নিজের ঈমানের বিষয়টি গোপন রেখে ছিলেন ।) গোপনে ইসলাম প্রচারের কিছুদিন পরই আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা.) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তার বাস্তবায়ন শুরু করেন । আর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের

সাথে সাথেই এর কঠিন ও বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় । মহানবী (সা.) ও নব মুসলিমদের প্রতি মক্কাবাসীদের সমস্ত ধরণের অত্যাচার শুরু হয় । এমনকি মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু মুসলমান তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ করে 'আবিসিনিয়ায়' (ইথিওপিয়া) গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় । আর মহানবী (সা.) তার প্রিয় চাচা হযরত আবু তালিব এবং বনি হাশিম গোত্রের আত্মীয়বর্গসহ মক্কার উপকন্ঠে 'শো'বে আবি তালিব' নামক এক পাহাড়ী উপত্যকায় দীর্ঘ তিনটি বছর বন্দী জীবনের কষ্ট ও দূর্ভোগ সহ্য করেন । মক্কাবাসীরা সব ধরণের লেনদেন ও মেলামেশা ত্যাগ করে এবং একই সাথে মহানবী (সা.) ও তার সমর্থকদেরকে সম্পূর্ণ রূপে এক ঘরে করে রাখে । ঐ অবস্থা থেকে মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীদের বেরিয়ে আসার সুযোগও ছিল না । মক্কার মূর্তি পুজারীরা অত্যাচার অপমান, বিশ্বাসঘাতকতা সহ মহানবী (সা.)- এর উপর যে কোন ধরণের চাপ প্রয়োগেই কুন্ঠিত হয়নি । তথাপি মহানবী (সা.) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কুরাইশরা নম্রতার পথও বেছে নেয় । তারা মহানবী (সা.)- কে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও মক্কার নেতৃত্ব পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয় । কিন্তু কাফেরদের এধরণের হুমকি ও অর্থ লোভ প্রদর্শন, দু'টোই ছিল বিশ্বনবী (সা.)- এর কাছে সমান । তাই হুমকি ও লোভ দেখিয়ে তারা বিশ্বনবী (সা.)- এর মহতী লক্ষ্য ও পবিত্র প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর দৃঢ় করা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম হয়নি । একবার কুরাইশরা বিশ্বনবী (সা.)- কে যখন বিপলু অংকের অর্থ এবং মক্কার নেতৃত্ব পদগ্রহণের প্রস্তাব দেয় । মহানবী (সা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেনঃ তোমরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাম হাতে এনে দাও, তবুও এক আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন থেকে কখনোই বিরত হব না । নবুয়ত প্রাপ্তির পর দশম বছরে শো'বে আলী ইবনে আবি তালিবে'র বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই তাকে সাহায্যকারী একমাত্র চাচাও (হযরত আলী ইবনে আবি তালিব) পরকাল গমন করেন । এ ঘটনার কিছুদিন পরই তার একমাত্র জীবনসংঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.)ও পরলোক গমন করেন । অতঃপর বাহ্যত: মহানবী (সা.)- এর আশ্রয়ের আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না । সুযোগ বুঝে মক্কার মূর্তি উপাসক

কাফেররা গোপনে মহানবী (সা.)- কে হত্যার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আটে । তাদের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোন একরাতে মহানবীর বাড়ী ঘেরাও করে এবং শেষরাতে তারা মহানবী (সা.)- এর বাড়ী আক্রমণ করে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.)- কে শায়িত অবস্থাতেই তার বিছানায় টুকরা টুকরা করে ফেলা । কিন্তু ঐ ঘটনা ঘটার পূর্বেই মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবী (সা.)- কে ঐ চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত করেন এবং মদীনা গমনের নির্দেশ দেন । সে অনুযায়ী মহানবী (সা.)- ও তার বিছানায় হযরত আলী (আ.)- কে শুইয়ে রেখে রাতের আধারে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিরাপত্তার মাধ্যমে শত্রুদলের মাঝ দিয়ে ‘ইয়াসরিবের’ (মদীনা) পথে পাড়ি দেন । মহানবী (সা.) বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেশ ক’মাইল পার হবার পর মক্কার বাইরে এক পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নেন । এদিকে মক্কার কাফের শত্রুরা একটানা তিনদিন যাবৎ ব্যাপক খোজাখুজির পরও মহানবী (সা.)- কে না পেয়ে নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যায় । শত্রুরা ফিরে যাওয়ার পরই মহানবী (সা.) ঐ গুহা থেকে বের হয়ে পুনরায় মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন । মদীনাবাসীরা ইতিপূর্বেই মহানবী (সা.)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার হাতে ‘বায়াত’ (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল । তারা অতিশয় আন্তরিক সংবর্ধনার মাধ্যমে মহানবী (সা.)- কে স্বাগত জানায় । তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ সম্পদ সহ সম্পূর্ণ রূপে মহানবী (সা.)- এর কাছে আত্মসমর্পণ করে । বিশ্বনবী (সা.) তার জীবনে এই প্রথমবারের মত মদীনায় ছোট্ট একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । ইসলামী সমাজ গঠনের পাশাপাশি ইয়াসরেব (মদীনা) ও তার আশেপাশে বসবাসরত ইহুদী ও অন্যান্য শক্তিশালী আরব গোত্রদের সাথে চুক্তি সাক্ষর করেন । অতঃপর তিনি ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হন । রাসূল (সা.)- এর ইয়াসরেবে আগমনের পর থেকে ইয়াসরেব নগরী ‘মদীনাতুর রাসূল (সা.)’ (রাসূলের শহর) তথা মদীনা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে । যার ফলে ইসলাম ক্রমেই বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করতে থাকে । ওদিকে কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত মক্কার মুসলমানরাও একের পর এক বাপদাদার ভিটেমাটি ত্যাগ করে মদীনায় পাড়ি দিতে লাগল । এভাবে অগ্নিমুখ পতঙ্গের মত মুসলমানরা ক্রমেই বিশ্বনবী (সা.)- এর চারপাশে ভীড় জমাতে থাকল । দেশ ত্যাগকারী মক্কার এসব

মুসলনরাই ইতিহাসে মহাজির হিসাবে পরিচিত । আর মক্কা থেকে আগত মহাজিরদেরকে সাহায্য করার কারণে মদীনাবাসী মুসলমানরাও ইতিহাসে ‘আনসার’ (সাহায্যকারী) নামে খ্যাতি লাভ করে । এভাবে ইসলাম তার সর্বোচ্চ গতিতে উন্নতি লাভ করতে থাকে । কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কার মূতি পুজারী কুরাইশ এবং আরবের ইহুদী গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক কার্য-কলাপ চালিয়ে যেতে কোন প্রকারের দ্বিধাবোধ করেনি । এর পাশাপাশি ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান নামধারী মুনাফিকরা ঐসব ইহুদী ও কাফেরদের সহযোগীতায় প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরণের জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকল । অবশেষে ঐসব সমস্যা একসময় যুদ্ধ-বিগ্রহে পর্যবসিত হয় । যার ফলে মূর্তি পুজারী কাফের ও ইহুদীদের সাথে ইসলামের অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তবে সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী বাহিনী বিজয়ী ভূমিকা লাভ করে । মহানবী (সা.)-এর জীবনে ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৮০ টিরও বেশী যুদ্ধ সংঘটিত হয় । যার মধ্যে বদর, ওহুদ, খন্দক ও খাইবারের মত বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর সবগুলোতেই বিশ্বনবী (সা.) স্বয়ং নিজেই অংশ গ্রহণ করেন । ইসলামের সকল বড় বড় এবং বেশ কিছু ছোট যুদ্ধে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর সেনাপতিত্বেই বিজয় অর্জিত হয় । ইসলামের ইতিহাসে একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)-ই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেননি । হিজরতের পরে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মদীনা গমনের পরের দশ বছরে সংঘটিত ঐসব যুদ্ধে সর্বমোট প্রায় দু’শত মুসলমান এবং প্রায় এক হাজার কাফের নিহত হয় । বিশ্বনবী (সা.)-এর অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টা এবং মহাজির ও আনসার মুসলমানদের আত্মত্যাগের ফলে হিজরত পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরবের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে পারস্য, রোম, মিশর ও ইথিওপিয়ার সম্রাটদের কাছেও ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে বিশ্বনবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র পাঠানো হয় । বিশ্বনবী (সা.) আজীবন দরিদ্রদের মধ্যে তাদের মতই জীবনযাপন করেন । তিনি আপন দারিদ্রের জন্যে গর্ববোধ করতেন । তিনি জীবনে কখনোই

সময় নষ্ট করেননি । বরং তিনি তার সময়কে মোট তিন অংশে ভাগ করতেন । একাংশ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য । অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার স্মরণের জন্যে নির্ধারিত রাখতেন ।
আর একাংশ তিনি নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ব্যয় করতেন । আর বাকী অংশ জনগণের জন্যে ব্যয় করতেন । সময়ের এই তৃতীয় অংশকে বিশ্বনবী (সা.) ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও তার প্রচার, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিন বৈদেশিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ সহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতেন । বিশ্বনবী (সা.) পবিত্র মদীনা নগরীতে দশ বছর অবস্থানের পর জনৈকা ইহুদী মহিলার বিষ মিশানো খাদ্য গ্রহণে অসুস্থ হয়ে পড়েন । অতঃপর বেশ ক'দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে তিনি পরলোক গমন করেন । যেমনটি হাদীসে পাওয়া গেছে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে বিশ্বনবী (সা.) ক্রীতদাস ও নারী জাতির সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার জন্যে সমগ্র মুসলিম উম্মার প্রতি বিশেষভাবে 'ওসিয়ত' করে গেছেন ।

## মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআন

অন্যান্য নবীদের মত বিশ্বনবী (সা.)- এর কাছেও নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী জানানো হয় । এক্ষেত্রে বিশ্বনবী (সা.) নিজেও তার পূর্বতন নবীদের মু'জিযা অলৌকিক নিদর্শনের অস্তিত্বের বিষয়টি সমর্থন করেন । যে বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে । বিশ্বনবী (সা.)- এর দ্বারা প্রদর্শিত এধরণের মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের ঘটনার অসংখ্য তথ্যই আমাদের কাছে রয়েছে । ঐ সকল লিপিবদ্ধ ঘটনার অনেকগুলোই নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত । বিশ্বনবী (সা.)- এর প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে নিদর্শনটি আজও জীবন্ত হয়ে আছে, তা হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ 'পবিত্র কুরআন' । এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থে ছোট বড় মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে । যা মোট ৩০টি অংশে বিভক্ত । বিশ্বনবী (সা.) এর ২৩ বছর যাবৎ নবুয়তী জীবনে ইসলাম প্রচারকালীন সময়ে ধীরে ধীরে সমগ্র

কুরআন অবতির্ণ হয় । একটি আয়াতের অংশবিশেষ থেকে শুরু করে কখনও বা পূর্ণ একটি সূরাও একেকবারেরই অবতির্ণ হত । অবস্থানরত অবস্থায় বা ভ্রমণ কালে, যুদ্ধ অবস্থায় বা সন্ধিকালে, দূরযোগপূর্ণ কঠিন দিনগুলোতে বা শান্তিপূর্ণ সময়ে এবং দিন ও রাতে যে কোন সময়েই ঐ পবিত্র ঐশীবাণী বিশ্বনবী (সা.)- এর কাছে অবতির্ণ হত । পবিত্র কুরআন তার আয়াতের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভাষায় নিজেকে এক মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে । ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে, পবিত্র কুরআন অবতির্ণের যুগে আরবরা ভাষাগত উৎকর্ষতার দিক থেকে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল । শুদ্ধ, সুমিষ্ট, আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষা ও বক্তব্যের অধিকারী হিসেবে তারা খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিল । পবিত্র কুরআন ঐক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দিকতায় নামার জন্যে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে । পবিত্র কুরআন তাদেরকে আহবান করে বলেছে, তোমরা কি মনে কর যে, কুরআনের বাণী মানুষের বক্তব্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- ই তা রচনা করেছেন? অথবা কারও কাছে তিনি তা শিখেছেন ? তাহলে তোমরাও পবিত্র কুরআনের মতই একটি কুরআন[১৪৮] বা এর যেকোন দশটি সূরা[১৪৯] বা অন্ততপক্ষে একটি সূরাও যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় রচনা করে নিয়ে এসো । আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরণের পন্থা তোমরা অবলম্বন করতে পার ।[১৫০] কিন্তু সে যুগের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ স্থানীয় কবি- সাহিত্যিকরা পবিত্র কুরআনের ঐ চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দিতে ব্যর্থ হন । বরঞ্চ ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে যা তারা বলেছিল, তা হলঃ কুরআন একটি যাদুর নামান্তর সুতরাং এর সদৃশ্য রচনা আমাদের সাধ্যের বাইরে ।[১৫১] এটাও লক্ষ্যণীয় যে, পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র ভাষাগত উৎকর্ষতার ব্যাপারেই চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহবান ঘোষণা করেনি, বরং এর অন্তর্নিহিত গুঢ় অর্থের ব্যাপারেও মানুষ ও জীন জাতির সামগ্রিক মেধাশক্তি খাটিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশ গ্রহণের জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছে ।

কেননা, এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থে সমগ্র মানব জীবনের কর্মসূচী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বর্ণিত হয়েছে । যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই জীবন বিধান অত্যন্ত ব্যাপক, যা মৌলিক বিশ্বাস, আচরণ বিধি ও কাজকর্ম সহ

মানব জীবনের সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে পরিবৃত করে । আর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে এবং দক্ষতার সাথে কুরআন মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই জীবন পদ্ধতিকেই একমাত্র সঠিকও সত্য ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন । (ইসলাম এমন এক ধর্ম, যার আইন- কানুন সত্য ও প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ থেকে উৎসরিত । যার আইন মানুষের খুশীমত রচিত হয়নি । অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মতামতের উপর ভিত্তি করেও রচিত হয়নি । আর কোন এক শক্তিশালী শাসকের যাচ্ছেতাই সিদ্ধান্ত অনুসারে রচিত হয়নি ।) শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টিকেই বিস্তৃত ঐশী কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । আর এ বিষয়টিই হল এ কর্মসূচীর সর্বোচ্চ সম্মানিত ঐশীবাণী । ইসলামের সকল মৌলিক বিশ্বাস এবং জ্ঞানের উৎসই হচ্ছে আল্লাহর এই একত্ববাদ বা তৌহিদ । আর মানুষের সুন্দর সদাচরণও ঐ মৌলিক বিশ্বাস ও জ্ঞানের ভিত্তিতেই রচিত এবং ঐ ঐশী কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । এরপর মানুষের বিশ্বাসগত বা সামাজিক জীবনের কর্মসূচীর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ বা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ এবং তদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সমূহও আল্লাহর সেই একত্ববাদ বা তৌহিদের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে । ইসলামের মৌলিক ও ব্যবহারিক অংশদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, যদি ব্যবহারিক অংশের অর্থাৎ আইনগত অংশের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তাও আল্লাহর একত্ববাদ থেকেই উৎসারিত । আর আল্লাহর একত্ববাদও ঐসব বিধান সমূহেরই সামষ্টিকরূপ । মহাবিস্তৃত ইসলামী বিধানের এই সুসজ্জিত ও সুশৃংখলিতরূপ ছাড়াও এতে নিহিত পারস্পরিক ঐক্য ও নিবিড় সম্পর্ক সত্যিই এক অলৌকিক বিষয় । এমনকি এর প্রাথমিক সূচীপত্রের বিন্যাসও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বাইরে ।

সুতরাং, বিশ্বাসগত ও সামাজিক জান- মালের নিরাপত্তাহীনতা জনিত সমস্যা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, আভ্যন্তরিণ ও বৈদেশিক বিশ্বাস ঘাতকতাসহ হাজারও সমস্যা সংকুল ও অশান্ত পরিবেশ জীবন যাপন করে এত স্বল্প সময়ে কারো পক্ষে এমন এক ঐশী বিধান রচনা নিঃসন্দেহে এক অসম্ভব

ব্যাপার । আর বিশেষ করে সমগ্র বিশ্ববাসীর মোকাবিলায় আজীবন যাকে একই সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, এমন বিশ্বাসের পক্ষে এ ধরণের কিছু করা সত্যিই অসম্ভব ।

এ ছাড়া বিশ্বনবী (সা.) শুধু যে পৃথিবীর কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেননি তাই নয় । বরং লিখতে বা পড়তেও তিনি শিখেননি । এমনকি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ্বনবী (সা.) এর জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়ই এমন এক জাতির মধ্যে বসবাস করেছেন, যারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল নীচু মানের ।[১৫২] সভ্যতা ও আধুনিকতার এতটকু ছোয়াও তাদের মধ্যে পাওয়া যেত না । গাছপালা ও পানিবিহীন এবং শুষ্ক ও জ্বলাকর বায়ুমণ্ডলপূর্ণ দূর্গম মরু এলাকার কঠিন ও কষ্টপূর্ণ পরিবেশে তারা জীবনযাপন করত । প্রতিনিয়তই তারা কোন না কোন পতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত হত । এছাড়াও পবিত্র কুরআন আরো অন্য পন্থায়ও তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে । আর তা হচ্ছে এই যে, এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থ সূদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ যুদ্ধকাল, সন্ধিকাল, সমস্যাকীর্ণ মূহুর্তে, শান্তি পূর্ণ যুগে, দুর্বল মূহুর্তে এবং ক্ষমতাসীন যুগে তথা বিভিন্ন পরিবেশে ধীরে ধীরে অবতির্ণ হয়েছে । আর এ জন্যেই, এটা যদি একমাত্র আল্লাহর রচিত না হয়ে মানব রচিত গ্রন্থ হত, তাহলে অবশ্যই এই গ্রন্থে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী বিষয় পরিলক্ষিত হত । ঐ অবস্থায় ঐ গ্রন্থের শেষের অংশ অবশ্যই তার প্রথম অংশের চেয়ে উত্তম ও উন্নত হবে । কারণ এটা মানুষের ক্রমোন্নয়ন ধারার অপরিহার্য পরিণতি । অথচ পবিত্র কুরআনের মক্কায় অবতির্ণ আয়াত সমূহ, মদীনায় অবতির্ণ আয়াত সমূহের সাথে একই সুরে গাথা । এই গ্রন্থের প্রথম অংশের সাথে শেষ অংশের মৌলিক কোন ব্যবধান খুজে পাওয়া যায় না । যার প্রতিটি অংশই সুষম, এবং মনোমুগ্ধকর ও আশ্চর্যজনক বর্ণনাশক্তির ভঙ্গীমা একই রূপে বিরাজমান ।[১৫৩]

# পুনরুত্থান বা পরকাল পরিচিতি

## মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি

ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি যাদের জানা আছে, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পবিত্র কুরআন বা হাদীসে প্রায়ই মানুষের দেহ ও আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । সবাই জানেন যে, প্রঞ্চন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবযোগ্য এই দেহ সম্পর্কে ধারণা করা আত্মার তুলনায় অনেক সহজ । আর আত্মা সম্পর্কে ধারণা অর্জন যথেষ্ট জটিল ও দুর্বোধ্য । শীয়া ও সুন্নি , উভয় সম্প্রদায়ের কালাম (মৌলিক বিশ্বাস শাস্ত্র) শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিকদের মধ্যে আত্মা সম্পর্কিত মতামতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতভেদ বিরাজমান । তবে এটা একটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও আত্মা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অস্তিত্ব । মৃত্যুর মাধ্যমে মানবদেহ তার জীবনীশক্তি হারায় এবং ধীরে ধীরে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । কিন্তু আত্মার বিষয়টি মোটেও এমন নয় । বরং জীবনীশক্তি মূলতঃ আত্মা থেকেই উৎসরিত । যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে, দেহও ততক্ষণ ঐ আত্মা থেকে সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করবে । যখনই আত্মা ঐ দেহ থেকে পৃথক হবে এবং (মৃত্যুর মাধ্যমে) দেহের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, তখনই দেহ নির্জীব হয়ে পড়বে । তবে আত্মা তার জীবনীশক্তি নিয়ে আপন জীবনকাল অব্যাহত রাখে । পবিত্র কুরআন এবং ইমামগণের (আ.) হাদীস সমূহের মাধ্যমে যা আমরা বুঝতে পারি, তা হল, আত্মা মহান আল্লাহর এক অসাধারণ ও অভিনব সৃষ্টি । তবে আত্মা ও দেহের অস্তিত্বের মধ্যে এক ধরণের সংগতি ও ঐক্য বিদ্যমান ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর আমরা তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি । এরপর আমরা শুক্রবিন্দুকে জমাটবাধাঁ রক্তে পরিনত করেছি । অতঃপর জমাট বাধাঁ রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি । এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত

করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাড় করিয়েছি । (সূরা আল মু'মিনীন, ১২- ১৪ নং আয়াত ।)

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, উক্ত আয়াতের প্রথম অংশে সৃষ্টির জড়গত ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে । আর উক্ত আয়াতের শেষাংশে আত্মা, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । এভাবে উক্ত আয়াতের শেষাংশে দ্বিতীয় প্রকৃতির সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা প্রথম প্রকৃতির সৃষ্টির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর । পবিত্র কুরআনের অন্যত্র মানুষের পুনরুত্থানের বিষয় অস্বীকারকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে । তাদের পশ্ন ছিল, মৃত্যুর পর মানুষের দেহ যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তাকে প্রথম অবস্থার ন্যায় সৃষ্টি করা সম্ভব ?

এর উত্তরে মহান আল্লাহ বলেছেন : তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি ? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে । বলুন, তোমাদের প্রাণহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণহরণ করবে । অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । (সূরা আস সিজদাহ, ১০- ১১ নং আয়াত ।)

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে আরও বিস্তারিতভাবে আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে । সেখানে আত্মাকে এক অজড় অস্তিত্ব হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন : (হে রাসূল সঃ) তোমাকে তারা আত্মার (রূহ) রহস্য সম্পর্কে পশ্ন করে থাকে । বলে দাও; আত্মা সে আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত । (সূরা আল ইসরা, ৮৫ নং আয়াত ।)

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায় । (সূরা আল্ ইয়াসিন, ৮৩ নং আয়াত।)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে, কোন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে মহান আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন কোন ক্রমধারা বা পর্যায়ক্রমের নীতি অনুসরণ করে না । তার আদেশ বাস্তবায়ন কোন স্থান বা কালের করতলগত নয় । সুতরাং আত্মা যেহেতু মহান আল্লাহর আদেশ বৈ

অন্য কিছু নয়, তাই তা অবশ্যই কোন জড়বস্তু নয় । অতএব যার অস্তিত্বের মাঝে ক্রমধারা, স্থান ও কালের ন্যায় জড় বস্তুবাচক কোন গুণাবলীরই উপস্থিতি নেই ।

**আত্মার রহস্য সম্পর্কে অন্য একটি আলোচনা**

আত্মার রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেও সমর্থিত হয় । পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই তার নিজের মধ্যে এক সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, যাকে সে 'আমি' বলে আখ্যায়িত করে । মানুষের এ উপলব্ধি চিরদিনের । এমনকি মানুষ মাঝে মাঝে তার নিজের হাত, পা, মাথাসহ দেহের সকল অঙ্গকে ভুলে গেলেও যতক্ষণ সে বেচে আছে, তার ঐ আত্মোপলব্ধি (আমি) সে কখনই ভুলে যায় না । যেমনটি সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই সত্তার (আমি) অস্তিত্ব কখনই বিভাজ্য নয় । মানুষের দেহ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল । মানবদেহ সর্বদাই একটি সুনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং সময়ের অগণিত মূহুর্তের স্রোত সর্বদাই তার উপর দিয়ে প্রবাহমাণ । কিন্তু ঐ মূল সত্তার অস্তিত্ব সর্বদাই স্থির । কোন পরিবর্তনশীলতাই তার অস্তিত্বকে কখনোই স্পর্শ করে না । এতে এটাই প্রতীয়মাণ হয় যে, ঐ সত্তার অস্তিত্ব (আমি বা আত্মা) অবশ্যই জড় অস্তিত্ব নয় । তা না হলে অবশ্যই তা স্থান, কাল, বিভাজন ও পরিবর্তনশীলতার মত জড়বস্তুর গুণবাচক বৈশিষ্ট্য সমূহও তাতে পাওয়া যেত । হ্যাঁ, আমাদের সবার দেহই জড়বস্তুর গুণবাচক ঐসব বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ । আর আত্মার সাথে দেহের ওতপ্রোত সম্পর্কের কারণে, ঐসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে আত্মার প্রতিও আরোপ করা হয় । কিন্তু সামান্য একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলেই এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখন ও তখন (সময়), এখানে ও সেখানে (স্থান), এরকম ও সেরকম (আকৃতি ও আয়তন) এবং এদিক ও সেদিক (দিক) এসবই আমাদের এ জড় দেহেরেই বৈশিষ্ট্য । কিন্তু আত্মা ঐ সকল জড়বাচক বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । দেহের মাধ্যমেই ঐসব বৈশিষ্ট্য তাকে স্পর্শ করে । ঠিক একই কথা আত্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । যেমন : অনুভূতি ও উপলব্ধি (জ্ঞান) একমাত্র আত্মারই বৈশিষ্ট্য । সুতরাং এটা চিরসত্য যে, জ্ঞান যদি জড়বস্তু হত, তাহলে স্থান ও কাল বিভাজনের ন্যায় জড়বাচক গুণাবলীও তার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য হত । অবশ্য উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়টি একটি ব্যাপক আলোচনা ও

অসংখ্য প্রশ্ন ও উত্তরের সূত্রপাত ঘটাতে বাধ্য । তাই এই বইয়ের এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার অবতারণা না করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি । এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জ্ঞান আহরণে আগ্রহীদেরকে ইসলামী দর্শনের বইগুলো পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি ।

# ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু

বাহ্যিক এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিতে মৃত্যু মানুষের ধ্বংসেরই নামান্তর । কারণ, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝেই মানুষের জীবনকে সীমাবদ্ধ বলে ধারণা করা হয় । কিন্তু ইসলাম মৃত্যুকে মানবজীবনের একটি পর্যায় থেকে অন্য একটি পর্যায়ে স্থানান্তর বলে আখ্যায়িত করে । ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক অনন্ত জীবনের অধিকারী, যার কোন শেষ নেই । মৃত্যু মানুষের আত্মাকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের অন্য একটি স্তরে স্থানান্তরিত করে । মৃত্যু পরবর্তী এ জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা মানুষের মৃত্যুপূর্ব জীবনের সৎকাজ ও অসৎকাজের উপরই নির্ভরশীল । মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে বলেছেনঃ কখনোই মনে কর না যে, মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে । বরং, মৃত্যুর মাধ্যমে তোমরা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত হবে মাত্র ।[১৫৪]

# বারযাখ (কবরের জীবন)

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যু থেকে নিয়ে কেয়ামত বা পুনরূত্থান দিবসের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের একটি সীমিত ও অস্থায়ী জীবন রয়েছে । কেয়ামত বা পরকাল ও পার্থিব জীবনের মাঝামাঝি মানুষের মৃত্যু পরবর্তী এই জীবনের নামই 'বারযাখ' বা কবরের জীবন ।[১৫৫] পৃথিবীর জীবনে মানুষ তার বিশ্বাস অনুযায়ী যে সব ভাল বা খারাপ কাজ করেছে, মৃত্যু পরবর্তী ঐ 'বারযাখ' জীবনে ঐ সব ভাল বা খারাপ কাজের জন্যে প্রতিটি মানুষকেই ব্যক্তিগত ভাবে জবাবদিহি করতে হবে । অতঃপর ঐ জবাবদিহির ভিত্তিতে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে । আর ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই মানুষ পরকালে এক সুখময় ও মধুর জীবন অথবা এক অশান্তিপূর্ণ ও তিক্ত জীবন যাপনের অধিকারী হবে । আর ঐ ধরণের জীবনযাপন শুরুর মাধ্যমেই মানুষ কেয়ামত বা পুনরুত্থানের জন্যে প্রতীক্ষমান থাকবে ।[১৫৬]

মানুষের এই বারযাখের (কবরের) জীবন অনেকটা বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে আদালত কক্ষে অপেক্ষমান আসামী বা ফরিয়াদীর মত । বিচারকার্য শুরুর পূর্বে তার প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্নের জন্যে আসামী বা ফরিয়াদী সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় নথিপত্র পূর্ণ করা ও তল্লাসী সম্পন্ন করা সহ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে । এরপর সে আদালত কক্ষে গ্রেফতার অবস্থায় বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে । মানুষ এ পৃথিবীতে বসবাসকালীন সময়ে যেভাবে জীবনযাপন করেছে, মৃত্যুর পর বারযাখ বা কবরের জীবনে তার আত্মাও ঠিক সেভাবেই জীবনযাপন করবে । যদি সে পার্থিব জীবনে সৎলোক হয়ে থাকে, তাহলে বারযাখের জীবনেও সে সৌভাগ, ও প্রাচুরযের অধিকারী হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সৎলোকদের নৈকট্য লাভ করবে । আর যদি সে অসৎ ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে, বারযাখের জীবনেও সে কষ্ট ও শাস্তির অধিকারী হবে এবং দুষ্টও পথভ্রষ্ট অসৎলোকদের সংসর্গ লাভ করবে ।

মহান আল্লাহ মৃত্যু পরবর্তী সৌভাগ্যবান লোকদের অবস্থার ব্যাপারে বলেছেন : আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না । বরং তারা তাদের

নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত । আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে । আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে । কারণ, তাদের কোন ভয়- ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই । আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । (সূরা আল ইমরান, ১৬৯- ১৭১ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মৃত্যু পরবর্তী দূর্ভাগা লোকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি (পূর্বে ) করিনি । (সূরা আল মু'মিনুন, ৯৯- ১০০ নং আয়াত ।)

## পুনরূত্থান দিবস

পৃথিবীতে ঐশী গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র পবিত্র কুরআনেই কেয়ামত বা পুনরূত্থান দিবস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । এমন কি ঐশীগ্রন্থ 'তাওরাতে' কেয়ামতের নামটি পর্যন্ত উল্লেখিত হয়নি । আর 'ইঞ্জিল' গ্রন্থে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে কেয়ামতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে মাত্র । পবিত্র কুরআনে শতাধিক স্থানে বিভিন্ন প্রসংগে এবং বিভিন্ন নামে কেয়ামত বা পুনরূত্থান দিবসের কথা উল্লেখিত হয়েছে । এ বিশ্বজগত ও তার অধিবাসীদের অবস্থা কেয়ামতের দিন কেমন হবে, তা কখনও বা সংক্ষেপে আবার কখনও বা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে । পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার "স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পাশাপাশি প্রতিদান (কেয়ামত) দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য । কারণ; প্রতিদান (কেয়ামত) দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইসলামের তিনটি (আল্লাহর একত্ববাদ, নবুয়ত ও কেয়ামত) মূলনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ ।

সুতরাং, প্রতিদান দিবসের অস্বীকারকারী প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত । আর প্রতিদান দিবসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির পরিণতি হচ্ছে নিশ্চিত ধ্বংস, এটা নিশ্চিত সত্য । কারণ; মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জীবনের কৃতকর্মের কোন হিসাব নিকাশ এবং শাস্তি বা পুরুস্কারের কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহলে আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম প্রচার নিষ্ফল হয়ে পড়বে । কেননা, আদেশ নিষেধ সম্বলিত নির্দেশ সমূহের সমষ্টির নামই তো 'দ্বীন' । ঐ অবস্থায় নবীদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং 'দ্বীন' প্রচার উভয়ের ফলাফলই হবে এক । বরং, এমতাবস্থায় নবী ও 'দ্বীন' প্রচারের অনুপস্থিতি তার অস্তিত্বের উপর অগ্রাধিকার পাবে । কারণ; ঐ অবস্থায় 'দ্বীন' গ্রহণ করা ও শরীয়তের আইন-কানুন মেনে চলার মাধ্যমে নিজেকে কষ্ট দেয়া এবং আত্মস্বাধীনতা বিসর্জন দেয়ারই নামান্তর হবে । দ্বীনের অনুসরণের মধ্যে যদি কোন সুফলই লাভ না হয়, তাহলে জনগণ কখোনই দ্বীনের অধীনতা স্বীকার করবে না । আর প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভোগ থেকেও কখনোই তারা বিরত হবে না । এ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রতিদান বা কেয়ামতের দিনকে "স্মরণ করানোর গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে দ্বীন প্রচারের গুরুত্বেরই সমান । আর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রতিদান বা কেয়ামত দিনের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে 'তাকওয়া' (খোদাভীতি) অবলম্বন, অসচ্চরিত্র থেকে বেচে থাকা এবং বড় ধরণের পাপকাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে । একই ভাবে কেয়ামতের বিষয়টি ভুলে যাওয়া বা ঐ দিনের প্রতি অবিশ্বাসই মানুষের যে কোন ধরণের পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ।

মহান আল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল । (সূরা আস্ সোয়াদ, ২৬ নং আয়াত ।)

উপরোক্ত আয়াতে কেয়ামতের বিষয়টি ভুলে যাওয়াকেই মানুষের সবধরণের পথ ভ্রষ্টতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি এবং ঐশী আইনমালার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কে সুগভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই এই প্রতিদান (কেয়ামত) দিবসের অপরিহার্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এমনকি আমরা এ সৃষ্টিজগতের সচরাচর সংঘটিত কার্য

কলাপকে যদি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছাড়া কোন কাজই সম্পন্ন হয় না । কখনও কোন বস্তুর জন্যে তারই স্বয়ংক্রিয় গতি স্বকীয়ভাবে অথবা সত্তাগতভাবে তারই কাঙ্খিত বিষয় বা লক্ষবস্তু হতে পারে না । বরং বিশেষ কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোন কাজ সাধিত হওয়ার ব্যাপারে তার পটভূমি রচনা করে । অতঃপর তা কাঙ্খিত কাজে পরিণত ও সাধিত হয় । এমনকি আপাত দৃষ্টিতে অনেক কাজকেই আমাদের কাছে উদ্দেশ্য বিহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য বিহীন নয় । যেমনঃ শিশু সুলভ খেলা- ধুলা ইত্যাদি । যদি আমরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে এ ধরণের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, বাহ্যতঃ লক্ষ্যহীন ঐসব কাজের পিছনেও তার উপযোগী উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল রয়েছে । এভাবে প্রকৃতিতে যত কাজই সম্পন্ন হয়, সবই কোন না কোন উদ্দেশ্য সম্বলিত । তেমনি শিশু সুলভ খেলা ধুলার উদ্দেশ্যও এক ধরণের নিছক কল্পনা প্রসূত আনন্দ উপভোগ, যা ঐ শিশুর জন্যেই উপযোগী, ঐ লক্ষ্যে পৌছাই তার খেলার উদ্দেশ্য অবশ্য এ বিশ্বজগত ও মানুষ সৃষ্টি আল্লাহরই কাজ । আর মহান আল্লাহর অবশ্যই যে কোন অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন কাজ সম্পাদনের মত বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র । মহান আল্লাহ একের পর এক সৃষ্টিই করে চলেছেন, তাদের জীবিকা দান করেছেন । অতঃপর তাদের মৃত্যু দিচ্ছেন । আবার নতুন করে সৃষ্টি করছেন । আবার তাদের জীবিকা দিচ্ছেন, মৃত্যু দিচ্ছেন । এভাবে সর্বক্ষণ সৃষ্টি করছেন আর ধ্বংস করছেন । এটা আদৌ কল্পনা যোগ্য নয় যে, এ ধরণের সৃষ্টি ও ধ্বংসের পেছনে আল্লাহর নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই ।

অতএব এ বিশ্বজগত ও মানুষের সৃষ্টির পেছনে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের ধারণা একটি অপরিহার্য বিষয় । অবশ্য এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সৃষ্টি কার্যের মাঝে নিহিত লাভ, নিঃসন্দেহে অভাবমুক্ত আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না । এ সৃষ্টি রহস্যের মাঝে লুকায়িত লাভ দ্বারা একমাত্র সৃষ্টিনিচয়ই লাভবান হবে । সুতরাং , বলা যায় যে, এ বিশ্বজগত ও মানুষ এক সুনির্দিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্তিত্ব লাভের প্রতি ধাবমান, যা অবিনশ্বর ও অনন্ত । আমরা যদি দ্বীনি শিক্ষার দৃষ্টিকোন থেকে সূক্ষ্ম ভাবে জনগণের আস্থা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে

পাব যে, খোদায়ী নির্দেশনা ও দ্বীনি প্রশিক্ষণের প্রভাবে মানুষ সৎ ও অসৎ দু'দলে বিভক্ত। অথচ পার্থিব জীবনে এ দু'দলের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর অত্যাচারী ও অসৎ লোকরাই সকল উন্নতি ও সাফল্যের ধারক- বাহক আর সর্ব সাধারণের বঞ্চনা, কষ্টভোগ দূর্দশা ও অসহায়ত্বের কারণ। অথচ পৃথিবীর সৎ লোকেরাই সাধারণত সব ধরণের কষ্টভোগ, বাঞ্চনা, দূর্দশা ও অত্যাচারের শিকার হয়। এমতাবস্থায় ঐশী ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে এমন একটি জগত ও জীবনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যেখানে উপরোক্ত দু'দলের লোকেরাই তাদের স্ব- স্ব কার্য কলাপের উপযুক্ত প্রতিদান পাবে। আর সবাই তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী সেখানে উপযুক্ত জীবন যাপন করবে।

মহান আল্লাহ তাই পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আমরা নভো- মণ্ডল, ভূ- মণ্ডল ও এতদভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেসৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (সূরা আদ্ দুখান, ৩৮- ৩৯ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন যে : যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ! আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ- মণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা আল্ জাসিয়াহ্, ২১- ২২ নং আয়াত।)

**অন্য একটি ব্যাখা**

পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র কুরআনে ইসলামী জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় আলোচিত হয়েছে। আর ঐ সকল পন্থা বাহ্যিক (জাহের) ও আভ্যন্তরীণ বা গোপন (বাতেন) দিক নামে দু'ভাগে বিভক্ত। কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা পদ্ধতি গণমানুষের সাধারণ মেধাশক্তির স্তরের উপযোগী। কিন্তু কুরআনের আধ্যাত্মিক বা বাতেনী বর্ণনা পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পদ্ধতি গণমুখী নয়। বরং বিশেষ এক শ্রেণীর জন্যে এই পদ্ধতি নির্ধারিত। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারীগণ তাদের পরিশুদ্ধ আত্মার

মাধ্যমেই উক্ত পদ্ধতি উপলব্ধি করতে সমর্থ । কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ কে সমগ্র সৃষ্টিজগতের নিরংকুশ অধিপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব জগতে তিনিই একমাত্র সত্বাধিকারী । মহান আল্লাহ তার আদেশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্যে অসংখ্য ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন । তারা এ বিশ্ব জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন । সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের জন্যেই দায়িত্বশীল বিশেষ একদল ফেরেস্তা নিযুক্ত রয়েছে । তারা তাদের ঐ নির্দিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি স্বরূপ । মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তারই দাস স্বরূপ । আল্লাহর সকল আদেশ- নিষেধ মেনে চলা তার একান্ত কর্তব্য । নবীগণ আল্লাহর বাণীবাহক এবং তার পক্ষ থেকে শরীয়ত বা ঐশী আইন আনয়নকারী । তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্যে এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন । মহান আল্লাহ তার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনকারী ও তার অনুগত লোকদের জন্যে পূর্ণ পুরুস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । আর তাকে অস্বীকারকারী পাপীদের জন্যে চরম শাস্তির হুমকি দিয়েছেন । তিনি যা কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার খেলাফ তিনি কখোনই করবেন না । মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক । তাই ন্যায়বিচারের দাবী হচ্ছে, এ জাগতিক জীবনে সৎলোক বা অসৎ লোক তাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান না পাওয়ার কারণে এমন একটি জীবনের অবতারণা প্রয়োজন, যেখানে সৎলোক ও অসৎলোক উভয়েই তাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিদান ভোগ করবে ।

মহান আল্লাহ তার ন্যায়বিচারের প্রমাণ স্বরূপ এ পৃথিবীর সকল মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন । অতঃপর প্রতিটি মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও তার কার্য কর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব- নিকাশ করবেন । তিনি সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষের কৃতকর্মের বিচার করবেন । আর সে অনুযায়ী সবার প্রাপ্য অধিকার তিনি আদায় এবং অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারীতের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করবেন । প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পাবে । মানুষ তার কৃতকর্ম অনুসারে কেউ অনন্ত কালের জন্যে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আবার কেউ বা চিরদিনের জন্যে দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে । এটাই পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা । আর

এটাই সত্য ও সঠিক । এ বিষয়টি মানুষের জন্যে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় রচিত, যাতে এ থেকে সাধারণ গণমানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে ।

অপরদিকে যারা পবিত্র কুরআনে লুকায়িত নিগুঢ় অর্থ ও তার রহস্যময় আধ্যাত্মিক ভাষা সম্পর্কে অবহিত, তারা গণমানুষের দ্বারা লব্ধ সাধারণ অর্থের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের জ্ঞান কুরআন থেকে আহরণ করে থাকেন । পবিত্র কুরআনও তার সহজ সাধারণ বর্ণনার ফাকে ফাকে প্রায়ই ঐ বর্ণনায় লুকায়িত গূঢ় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে । পবিত্র কুরআন অসংখ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে এটাই বুঝাতে চায় যে, মানুষ সহ এ সৃষ্টিজগতের সকল অংশই তার নিজস্ব প্রাকৃতিক গতির (যা অবিরাম গতিতে পূর্ণত্ব আহরণের পথে ধাবমান) মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে মহান আল্লাহর দিকে ধাবমান । এভাবে চলতে চলতে একদিন অবশ্যই তার গতি পরিক্রমা থেমে যাবে । এ সৃষ্টিনিচয় সেদিন সর্বস্রষ্টা আল্লাহর অসীম মহত্বের সম্মুখে নিজের সকল আমিত্ব ও সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলবে । মানুষও সৃষ্টিজগতের একটি অংশ বিশেষ । মানুষের জন্যে নির্ধারিত পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান ও উপলদ্ধি ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয় । আর এ পথেই বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই তার গতি মহান প্রভু আল্লাহর প্রতি ধাবমান । মানুষের এ গতি যখন চুড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে শেষ হবে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে সত্যে উপনীত হবে এবং আল্লাহর একত্ব ও মহত্বকে চাক্ষুষভাবে অবলোকন করবে । তখন সে চাক্ষুষভাবে উপলদ্ধি করবে যে, শক্তি ও মালিকানা সহ শ্রেষ্ঠত্বের সকল গুণাবলীই একমাত্র মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্যে নির্ধারিত । আর তখনই এ জগতের সকল বস্তু ও বিষয়ের প্রকৃতপক্ষে রহস্য ও স্বরূপ তার কাছে উদঘটিত হবে । এটাই অনন্ত ও অসীম জগতে প্রবশের সর্বপ্রথম তোরণ । মানুষ যদি তার ঈমান ও সৎকাজের মাধ্যমে ঐ ঐশী জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং আল্লাহ ও তার নৈকট্য প্রাপ্তদের সাথে আত্মিক বন্ধন ও যোগাযোগকে সুদৃঢ় করতে পারে, তাহলেই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে । যার ফলে সে আল্লাহ ও পবিত্র আত্মাদের সান্নিধ্যে স্বর্গীয় জীবন যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবে । এটা এমন এক সৌভাগ্য যাকে পৃথিবীর কোন বিশেষেণে বিশেষিত করা অসম্ভব । কিন্তু মানুষ যদি তার হৃদয় থেকে এ নশ্বর জগতের মায়া

কাটাতে সক্ষম না হয়, যার ফলে আল্লাহ, পবিত্র আত্মাগণ ও স্বর্গীয় জগতের সাথে তার ঐশী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে অবশ্য তাকে চিরদিনের জন্যে সুকঠিন ও কষ্টময় শাস্তির শিকার হতে হবে। যদিও এ কথা সত্য যে, জাগতিক জীবনে মানুষের কৃত সৎ বা অসৎ কাজ দু'টিই এক সময় বাহ্যত নশ্বর হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের কৃত সৎ বা অসৎ কাজের প্রতিচ্ছিবি তার আত্মায় চিরদিনের জন্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, যা কখনোই মুছে ফেলা যায় না। যেখানেই সে যাক না কেন, তার কৃতকর্মের ঐ স্মৃতি তার সাথে থাকবেই। মানব জীবনের কৃত ঐসব সৎ বা অসৎ কাজই পরকাল তার অনন্ত সুখী জীবন অথবা কষ্টময় জীবনের একমাত্র পুজি স্বরূপ। উপরোক্ত বিষয়টি পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত সমূহে আলোচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (সূরা আল আলাক, ৮ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেছেন : জেনে রাখ! সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা আশ শুরা, ৫৩ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেছেন : সেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব আল্লাহরই। (সূরা আল ইনফিতার, ১৯ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেছেন : হে বিশ্বস্ত আত্মা, তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার উপাসনায় মনোনিবেশ কর এবং আমারই জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আল ফাজর, ২৭- ৩০ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ কেয়ামতের দিন বেশকিছু লোককে উদ্দেশ্য করে বলবেন : (তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা কিছু এখন দেখছো) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার নিকট থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (সূরা আল ক্বাফ, ২২ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 'তাউইল' সম্পর্কে (কুরআনের গূঢ় অর্থ এখান থেকেই উৎসারিত) বলেছেন : যারা কুরআনকে স্বীকার করে না, তারা কি এখনো 'তাউইল' ব্যতীত

অন্য কিছুর অপেক্ষায় আছে, যেদিন এর ‘তাউইল’ প্রকাশিত হবে, পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, সেদিন তারা বলবেঃ বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন । অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে পুণঃ (পৃথিবীতে) প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম । নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে । তারা মনগড়া যা বলত, উধাও হয়ে যাবে । (সূরা আল্ আরাফ, ৫৩ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ বলেন : সেদিন আল্লাহ তাদের শাস্তি পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই্ সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী । (সূরা আন্ নুর, ২৫ নং আয়াত । )

আল্লাহ বলেন : হে মানুষ তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাত ঘটবে । (সূরা আল্ ইনশিকাক, ৬ নং আয়াত ।)

আল্লাহ আরো বলেন : যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে । (সূরা আল্ আনকাবুত, ৫ নং আয়াত ।)

আল্লাহ আরো বলেন : অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার উপাসনায় কাউকে অংশীদার না করে । (সূরা আল্ কাহফ, ১১০ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন : হে বিশ্বস্ত আত্মা, তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর । অতঃপর আমার উপাসনায় মনোনিবেশ কর এবং আমারই জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আল্ ফাজর, ২৭- ৩০ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ বলেন : অতঃপর যখন মহাসংকট (কেয়ামত) এসে যাবে । অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, ( মানুষেরা দু’শ্রেণীতে বিভক্ত হবে) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে

ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত ।” ( সূরা আন্ নাযিআ’ত ৩৪ থেকে ৪১ নং আয়াত ।)

মানুষের কৃতকর্মের প্রতিদানের স্বরূপ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ কোন অজুহাত পেশ করো না । তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে । (সূরা আত তাহরীম, ৭নং আয়াত ।)

**সৃষ্টির অব্যাহত অস্তিত্ব**

আমাদের দৃশ্যমান এ সৃষ্টিজগত অন্তহীন আয়ুর অধিকারী নয় । একদিন অবশ্যই এ সৃষ্টিজগতের আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে । পবিত্র কুরআনেরও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় ।

মহান আল্লাহ বলেন : নভোমণ্ডল, ভূ- মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথ ভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি (একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে) । (সূরা আল্ আহক্বাফ ৩ নং আয়াত ।)

উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট ও সীমিত সময় সীমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু এ পৃথিবী ও মানব জাতির বর্তমান প্রজন্ম সৃষ্টির পূর্বে অন্য কোন পৃথিবী বা প্রজন্ম সৃষ্টি করা হয়েছিল কি? এ বিশ্ব এবং মানব জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির পর (যেমনটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে) পুনরায় অন্য কোন বিশ্ব ও মানবজাতির সৃষ্টি হবে কি ? সামান্য কিছু ইঙ্গিত ছাড়া এসব প্রশ্নের সরাসরি ও সুস্পষ্ট কোন উত্তর পবিত্র কুরআনে খুজে পাওয়া যায় না । তবে আমাদের ইমামগণের (আ.) বর্ণিত হাদীস সমূহে এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক উত্তর দেয়া হয়েছে । (বিহারুল আনোয়ার, ১৪ নং খণ্ড, ৭৯ নং পৃষ্ঠা ।)

# ইমাম পরিচিতি

### ইমাম শব্দের অর্থ

‘ইমাম’ বা নেতা তাকেই বলা হয়, যে একদল লোককে নির্দিষ্ট কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক অথবা ধর্মীয় লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য নেতা তার নেতৃত্বের পরিধির বিস্তৃতি ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে সময় ও পরিবেশগত পরিস্থিতির অনুসারী পবিত্র ইসলাম ধর্ম (যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে) মানব জীবনের সকল দিক পর্যবেক্ষণপূর্বক তার জন্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ।

ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বিশ্লেষণপূর্বক তার জন্যে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দান করেছে। পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন ও তার পরিচালনার ব্যাপারেও ইসলামের হস্তক্ষেপ রয়েছে । ঠিক একইভাবে মানুষের সামাজিক (পার্থিব) জীবন ও তার পরিচালনার (রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা) ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশ রয়েছে ।

উপরে মানব জীবনের যেসব দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি দিকে গুরুত্বের অধিকারী । সেই দিক গুলো হচ্ছে : ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী জ্ঞানমালা ও আইন কানুন বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনে নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশনার দিক। শীয়াদের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজের জন্যে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিকের নেতৃত্ব দানের জন্যে নেতার প্রয়োজন অপরিহার্য । যিনি ইসলামী সমাজের এ তিনটি দিকের উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবেন অবশ্যই তাকে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- এর দ্বারা মনোনীত হতে হবে । অবশ্য মহান আল্লাহর নির্দেশে বিশ্বনবী (সা.) এই মনোনয়ন কার্য সম্পন্নও করে গেছেন ।

## ইমামত এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও মহানবী (সা.)- এর উত্তরাধিকার

মানুষ তার খোদাপ্রদত্ত স্বভাব দিয়ে অতি সহজেই এ বিষয়টি উপলদ্ধি করে যে,  কোন দেশ, শহর গ্রাম বা গোত্র এবং এমনকি গুটি কয়েক লোক সম্বলিত কোন একটি সংসারও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া চলতে পারে না । একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সমাজের চাকা সচল রাখা সম্ভব নয় । একজন নেতার ইচ্ছাই সমাজের অসংখ্য ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করে । এভাবে সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে । সুতরাং একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সমাজের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না । তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নেতাহীন ঐ সমাজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য।

যার ফলে এক ব্যাপক অরাজকতা ঐ সমাজকে ছেয়ে ফেলবে । সুতরাং,  উক্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে,  সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত (সে সমাজ বৃহত্তরই হোক অথবা ক্ষুদ্র তরই হোক) নেতা,  সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি যদি কখনও অস্থায়ীভাবে অথবা স্থায়ীভাবে তার পদ থেকে অনুপস্থিত থাকেন,  তাহলে অবশ্যই তার ঐ অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্যে অন্য কাউকে দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োজিত করে যাবেন । এধরণের দায়িত্বশীল কোন নেতা কোনক্রমেই এমন কাজ করতে প্রস্তুত হবেন না,  যার ফলে নিজের দায়িত্বের পদ থেকে সরে দাড়ানোর কারণে নেতার অভাবে ঐ সমাজের অস্তিত্ব ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়বে । কোন পরিবারের কর্তাব্যক্তিও যদি কিছুদিনের জন্যে অথবা কয়েক মাসের জন্যে পরিবারের সদস্যদের ত্যাগ করে দূরে কোথাও ভ্রমনে যান । তখন অবশ্যই তিনি তার অনুপস্থিতকালীন সময়ে সংসার পরিচালনার জন্যে পরিবারের কাউকে (অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে) দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করে যান । কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা দোকানের মালিক,  যাদের অধীনে বেশ ক'জন কর্মচারী কর্মরত,  তারা যদি অল্প ক'ঘন্টার জন্যেও কোন কারণে কর্মস্থল ত্যাগ করেন,  তাহলে অধীনস্থ কাউকে তার অনুপস্থিতকালীন সময়ে তার দায়িত্ব পালনের জন্যে নিযুক্ত করে যান । আর অন্যদেরকে ঐ নবনিযুক্ত দায়িত্বশীলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন । ইসলাম এমন

এক ধর্ম, যা খোদাপ্রদত্ত মানব প্রকৃতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । ইসলাম একটি সামাজিক আদর্শ যার প্রকৃতি এমন এক দৃষ্টান্ত মূলক যে, পরিচিত ও অপরিচিত সবাই ঐ আদেশের দর্পন থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে । মহান আল্লাহ ও বিশ্বনবী (সা.) এই আদেশের সামাজিকতার ক্ষেত্রে যে মহান অবদান রেখেছেন, তা সবার কাছেই অনস্বীকার্য । এই ঐশী আদর্শ পৃথিবীর অন্য কিছুর সাথেই তুলনাযোগ্য নয় । মহানবী (সা.)- ও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সামাজিক বিষয়ই পরিত্যাগ করতেন না । যখনই কোন শহর বা গ্রাম মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হত, সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ে বিশ্বনবী (সা.) তার পক্ষ থেকে কাউকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা ও স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে পাঠাতেন । এমনকি জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেনাবাহিনীর জন্যে প্রয়োজন বোধে (অত্যাধিক গুরুত্বের কারণে) একাধিক সেনাপতিও তিনি নিযুক্ত করতেন । এমনকি ঐতিহাসিক ‘মুতার’ যুদ্ধে বিশ্বনবী (সা.) চারজন সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন । যাতে প্রথম সেনাপতি শাহাদত বরণ করলে দ্বিতীয় সেনাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । দ্বিতীয়জন শাহাদত বরণ করলে তৃতীয়জন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন । আর এইভাবে এ ধারা বাস্তবায়িত হবে । রাসূল (সা.)- এর এসকল কার্যের মাধ্যমেই নেতা নিয়োগের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় । একইভাবে বিশ্বনবী (সা.) তার স্বীয় উত্তরাধিকারের বিষয়েও সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন । তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারে কখনোই পিছপা হননি । যখনই তিনি প্রয়োজন বোধে মদীনার বাইরে যেতেন, তখনই তিনি কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন । এমন কি যখন তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা নগরী ত্যাগ করে ছিলেন, যখন কেউই সে সংবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিল না তখনও মাত্র অল্প ক'দিনের জন্য স্বীয় ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন ও জনগণের গচ্ছিত আমানত দ্রব্যাদি মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে মক্কায় হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান । এভাবেই বিশ্বনবী (সা.) মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় ঋণ পরিশোধ ও বিশ্বাসগত অসমাপ্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে ইমাম আলী (আ.)- কে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন । তাই শীয়ারা বলে : উপরোক্ত দলিলের ভিত্তিতে এটা আদৌও কল্পনাপ্রসূত নয় যে, বিশ্বনবী

(সা.) মৃত্যুর পূর্বে কাউকে তার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত  হিসেবে নির্বাচিত করে যাননি । মুসলমানদের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা এবং ইসলামী সমাজের চালিকা শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে কাউকেই মহানবী (সা.) মনোনীত করে যাননি,  এটা এক কল্পনাতীত ব্যাপার বটে । এক শ্রেণীর আইন- কানুন ও কিছু সাধারণ আচার অনুষ্ঠান,  যা সমাজের অধিকাংশ জনগণের দ্বারা বাস্তবে স্বীকৃত ও সমর্থিত,  তার উপর ভিত্তি করেই একটি সমাজের সৃষ্টি হয় । আর ঐ সমাজের অস্তিত্ব টিকে থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার ভিত্তিক ও দায়িত্বশীল একটি প্রশসানের অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল । এটা এমন কোন বিষয় নয় যে,  মানব প্রকৃতি এর গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে । কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেও এটা কোন অজ্ঞাত বিষয় নয় এবং এটা ভোলার বিষয়ও নয়,  কারণ,  ইসলামী শরীয়তের (বিধান) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও বিস্তৃতি একটি সন্দেহাতীত ব্যাপার । আর এ ব্যাপারটিও অনস্বীকার্য যে,  বিশ্বনবী (সা.) এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করতেন এবং এপথে তিনি নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন । তার ঐ আত্মত্যাগ,  অসাধারণ চিন্তাশক্তি,  প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব,  সূক্ষ্ম ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার (ওহী ও নবুয়তের সাক্ষ্য ছাড়াও) বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কের উর্ধ্বে । শীয়া ও সুন্নী উভয় দলেরই মত নির্বিশেষে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির'  হাদীস অনুযায়ী ('ফিৎনা'  অধ্যায়ের হাদীস) বিশ্বনবী (সা.) তার অন্তর্ধানের পর ইসলামী সমাজ যেসব দূর্নীতিমূলক সমস্যায় আক্রান্ত হবে,  তার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন । ঐসব সমস্যার মধ্যে যেসব সমস্যাগুলো ইসলামকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ করেছে,  উমাইয়া বংশ সহ আরও অন্যান্যদের খেলাফত লাভের বিষয়টি তার মধ্যে অন্যতম । কারণ : তারা ইসলামের পবিত্র আদর্শকে তাদের বিভিন্ন ধরণের অপবিত্রতা ও অরাজকতামূলক জঘণ্য কাজে ব্যাবহার করেছে । এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) তার হাদীসে বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন । বিশ্বনবী (সা.) তার মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরের ইসলামী সমাজের খুটিনাটি বিষয়াদি ও সমস্যা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎবাণীও করে গেছেন । তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে,  যিনি তার পরবর্তী সুদুর ভবিষ্যতের ব্যাপারে এত সচেতন,  অথচ স্বীয় মৃত্যু পরবর্তী মূহুর্তগুলোতে সংঘটিত ঘটনাবলীর

ব্যাপারে আদৌ সচেতন নন?! বিশ্বনবী (সা.)- এর পরবর্তী উত্তরাধিকারের মত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি তাহলে তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে অবহেলা করেছেন, অথবা এটাকে গুরুত্বহীন একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন? এটা কেমন করে সম্ভব যে, খাওয়া পরা, ঘুমানো এবং যৌন বিষয়াদির মত মানব জীবনের শতশত খুটিনাটি বিষয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ তিনি জারী করেছেন, অথচ ঐ ধরণের একটি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরবতা পালন করেছেন? নিজের উত্তরাধিকারীকে তিনি মনোনীত করে যাননি? ধরে নেয়া যাক (যদিও এটা অসম্ভব একটি ধারণা) যে, মহানবী (সা.) তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের দায়িত্বভার মুসলমানদের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে এ ব্যাপারে অবশ্যই বিশ্বনবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকার কথা । এ ব্যাপারে অবশ্যই জনগণের প্রতি তার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকা উচিত । কারণঃ ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং ইসলামী নিদর্শনাবলীর অস্তিত্ব এ বিষয়টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । তাই এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মতকে সদা সচেতন থাকতে হবে । অথচ, এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না । কারণ যদি এমন সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার অস্তিত্ব থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বনবী (সা.)- এর পরে তার স্থলাভিষিক্তের পদাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারে এত মতভেদের সৃষ্টি হত না । অথচ আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম খলিফা ওসিয়তের (উইল) মাধ্যমে দ্বিতীয় খলিফার কাছে খেলাফত হস্তান্তর করেছিলেন ।

দ্বিতীয় খলিফা তার মৃত্যু পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে একটি 'খলিফা নির্বাচন কমিটি' গঠন করেছিলেন । ছয় সদস্য বিশিষ্ট ঐ কমিটির প্রতিটি সদস্যই দ্বিতীয় খলিফার দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন । ঐ কমিটির খলিফা নির্বাচন সংক্রান্ত মূলনীতিও তিনি নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন । যার ভিত্তিতেই তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন । তৃতীয় খলিফা নিহত হওয়ার পর চতুর্থ খলিফা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন । ইমাম হাসান (পঞ্চম খলিফা) চতুর্থ খলিফার ওসিয়তের (উইল) মাধ্যমে নির্বাচিত হন । এরপর মুয়াবিয়া পঞ্চম খলিফা হযরত ইমাম হাসান (আ.)- কে বলপূর্বক সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করার মাধ্যমে খেলাফতের পদটি ছিনিয়ে নেন । তারপর থেকেই খেলাফত

রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় । আর তখন থেকেই জিহাদ, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ইসলামী দন্ড বিধি প্রয়োগ, ইত্যাদি ইসলামী নির্দেশনাবলী একের পর এক ক্রমান্বয়ে ইসলামী সমাজ থেকে উধাও হতে থাকে । এভাবে বিশ্বনবী (সা.)- এর সারা জীবনের লালিত সাধানা ধুলিসাৎ হয়ে গেল ।[১৫৭] শীয়ারা আল্লাহ প্রদত্ত মানব প্রকৃতি এবং জ্ঞানী ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান চালায় । তারা ফিৎরাত বা মানব প্রকৃতি সঞ্জীবনী ইসলামী আদেশের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত, মহানবী (সা.)- এর অনুসৃত সামাজিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ এবং মহানবী (সা.)- এর মৃত্যু পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনাবলী অধ্যয়ন করে । মহানবী (সা.)- এর মৃত্যুর পর ইসলাম ও মুসলমানরা যেসব দূর্দশা ও জটিল সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিল তারও আদ্যোপান্ত আলোচনা করে । এছাড়াও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইসলামী প্রশাসকদের ইসলামের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত উদাসীনতার বিষয়টিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে । উক্ত গবেষণার মাধ্যমে শীয়ারা একটি সুনিশ্চিত ফলাফলে পৌছুতে সক্ষম হয় । আর তা হচ্ছে এই যে, বিশ্বনবী (সা.)- এর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বর্ণনার অস্তিত্ব ইসলামে বিদ্যমান । এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এবং বিশ্বনবী (সা.)- এর বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত । এ ব্যাপারে 'বিলায়ত' সংক্রান্ত আয়াত এবং গাদীরে খুমের হাদীস, 'সাফিনাতুন নুহ'- এর হাদীস, 'হাদীসে সাকালাইন' 'হাদীসে হাক্ক' 'হাদীসে মানযিলাত' নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত সংক্রান্ত হাদীস সহ আরও অসংখ্য হাদীসের কথা উল্লেখযোগ্য ।[১৫৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহের বক্তব্যে শীয়াদের বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায় । অবশ্য ঐসব হাদীসের যথেষ্ট অপব্যাখা করা হয়েছে । আর এই অপব্যাখার মাধ্যমে ঐগুলোর মূল অর্থকে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ।

**পূর্বোক্ত আলোচনার পক্ষে কিছু কথা**

বিশ্বনবী (সা.) জীবনের শেষ দিনগুলো যখন অসুস্থ অবস্থায় কাটাচ্ছিলেন । তখন একদল সাহাবী রাসূল (সা.)- এর কাছে উপস্থিত ছিলেন । হযরত রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন : আমার জন্যে কাগজ ও কলম নিয়ে এসো । কারণ, আমি এমন কিছু তোমাদের জন্য লিখে রেখে যেতে চাই, যা মেনে চললে তোমারা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না । উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক বললো : 'এ লোক তো অসুস্থতার ফলে প্রলাপ (?) বকছে । কারণ, আল্লাহর কুরআনই তো আমাদের জন্যে যথেষ্ট'! ! এ নিয়ে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল । রাসূল (সা.)- এ অবস্থা দেখে বললেন : তোমারা এখান থেকে উঠে পড় । আমার কাছ থেকে দুর হয়ে যাও । আল্লাহর রাসূলের কাছে হৈ চৈ করা উচিত নয়' ।[১৫৯]

পূর্বোক্ত অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং এ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, যারা রাসূল (সা.)- এর ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সেদিন বাধা প্রদান করেছিল, তারাই রাসূল (সা.)- এর মৃত্যুর পর খেলাফত নির্বাচনের ঘটনা থেকে লাভবান হয়েছিল । বিশেষ করে তারা হযরত আলী (আ.) ও তার অনুসারীদের অজ্ঞাতসারেই খেলাফত নির্বাচনের' পর্বটি সম্পন্ন করে ।

তারা হযরত আলী (আ.) ও তার অনুসারীদের বিপরীতে ঐ কাজটি সম্পন্ন করেছিল । এরপর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনায় মহানবী (সা.) তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত আলী (আ.)- এর নাম ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন । মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধা প্রদানপূর্বক ঐ ধরণের কথা বলার মাধ্যমে কথা কাটা- কাটি বা বিতর্ক সৃষ্টিই ছিল মূল উদ্দেশ্য, যাতে করে এর ফলে মহানবী (সা.) তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে বিরত হতে বাধ্য হন । সুতরাং অসুস্থতাজনিত প্রলাপ বকার কারণে তার নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধা দেয়াই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না । কারণ,

**প্রথমত:** আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর পবিত্র মুখ থেকে অসুস্থ কালীন সময়ে অসংলগ্ন একটি কথাও শানা যায়নি । আর এ যাবৎ এ ধরণের কোন ঘটনাও (অসংলগ্ন কথাবার্তা) কেউই বর্ণনা করেনি । ইসলাম নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী কোন মুসলমানই মহানবী (সা.)- এর প্রতি প্রলাপ বকার

(?) মত অপবাদ আরোপ করতে পারে না । কারণ, আল্লাহর রাসূল (সা.) ছিলেন ঐশী 'ইসমাত' বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণে গুণান্বিত ।

**দ্বিতীয়ত** : যদি তাদের কথা (প্রলাপ বকার মিথ্যা অভিযোগ সত্যই হত, তাহলে এর পরের কথাটি (কুরআনই আমাদের জন্যে যথেষ্ট) বলার কোন প্রয়োজন হত না । কারণঃ তাদের পরবর্তী কথার অর্থ হচ্ছে, কুরআনই তাদের জন্যে যথেষ্ট, এরপর রাসূল (সা.)- এর বক্তব্যের কোন প্রয়োজন নেই । কিন্তু রাসূল (সা.) এর সাহাবীরা ভাল করেই জানতেন যে, পবিত্র কুরআনই মহানবী (সা.) এর অনুসরণকে সবার জন্যে ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছে । রাসূল (সা.)- এর বাণীকে আল্লাহর বাণীরই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল অনুসারে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- এর নির্দেশের মোকাবিলায় মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা বা অধিকার নেই ।

**তৃতীয়ত:** প্রথম খলিফার মৃত্যুর সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল । তখন প্রথম খলিফা তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে দ্বিতীয় খলিফার নামে খেলাফতের ওসিয়ত (উইল) লিখে যান । তৃতীয় খলিফা ওসমান যখন প্রথম খলিফার নির্দেশে উক্ত 'ওসিয়ত' ( উইল) লিখছিলেন, তখন প্রথম খলিফা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন । কিন্তু, তখন বার দ্বিতীয় খলিফা প্রথম খলিফার ব্যাপারে মোটেই প্রতিবাদ করেননি, যে প্রতিবাদটি তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর ব্যাপারে করেছিলেন।[১৬০]

এ ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে[১৬১] দ্বিতীয় খলিফার যে স্বীকারোক্তি উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেনঃ আমি বুঝতে পরে ছিলাম যে আল্লাহর রাসূল (সা.) আলীর খেলাফতের বিষয়টি লিখে দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তা আমি হতে দেইনি । তিনি আরও বলেন যে 'আলীই ছিল খেলাফতের অধিকারী ।[১৬২] কিন্তু সে যদি খেলাফতের আসনে বসত, তাহলে জনগণকে সত্যপথে চলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করত । কিন্তু কুরাইশরা তার আনুগত্য করত না । তাই আমি তাকে খেলাফতের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি' ! ! !

ইসলামের নীতি অনুযায়ী সত্য প্রত্যাখানকারীদের জন্যে সত্যবাদীদেরক পরিত্যাগ না করে বরং সত্য প্রত্যাখানকারীদেরকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করা উচিত । যখন প্রথম খলিফার কাছে সংবাদ পৌছলো যে মুসলমানদের একটি গোত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তৎক্ষণাত তিনি তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ রাসূল (সা.) কে মাথার রূমাল বাধার যে দড়ি দেয়া হত, তা যদি আমাকে না দেয়া হয়, তাহলেও তাদের সাথে আমি যুদ্ধে অবতির্ণ হব ।[১৬৩] অবশ্য এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন, সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে । অথচ, সত্য ভিত্তিক খেলাফতের বিষয়টি মাথার রূমাল বাধার দড়ির চেয়ে অবশ্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ছিল ।

# ইসলামে ইমামত

নবী পরিচিতি অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, গণভাবে পথ নির্দেশনার (হেদায়েত) অপরিহার্য ও ধ্রুব আইন অনুসারে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই প্রাকৃতিক ভাবে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণত্ব ও মহত্ব প্রাপ্তির পথে পরিচালিত ও সদা ধাবমান । মানুষ ও জগতের অন্যান্য সৃষ্টির মতই একটি সৃষ্টি । তাই মানুষও উক্ত আইনের ব্যতিক্রম নয় । সুতরাং মানুষও তার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক চিন্তা- চেতনা দিয়ে তার নিজ জীবনে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে, যার মাধ্যমে সে ইহ ও পরকাল দু'জীবনেই সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে । এক কথায় এমন এক শ্রেণীর বিশ্বাস ও বাস্তব দায়িত্বের ভিত্তিতে মানব জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে মানুষ, জীবনের সাফল্য ও মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয় । মানব জীবন পরিচালনার ঐ কর্মসূচী ও জীবন দর্শনের নামই দ্বীন । এই দ্বীন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত নয় । বরং তা ঐশীবাণী (ওহী) ও নবুয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত, যা মানব জাতির কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ও পবিত্র আত্মাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (নবীগণ) মাধ্যমে অর্জিত হয় । আল্লাহর নবীরাই 'ওহী' বা ঐশী বাণীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সমূহ পৌছে দেন । যাতে করে ঐসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানব জীবন সাফল্য মণ্ডিত হয় । এটা খুবই স্পষ্ট যে, উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে এ ধরণের একটি জীবন বিধানের প্রয়োজনীয়তা মানব জাতির জন্যে প্রমাণিত হয় । একইভাবে এর পাশাপাশি মানব জাতির ঐ মূল্যবান জীবন বিধান সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে সংরক্ষণের প্রয়াজনীয়তাও প্রমাণিত হয় । মহান আল্লাহর অনুগ্রহের মাধ্যমে সেই ঐশী জীবন বিধান মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে যেমন বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন, তেমনি ঐ জীবন বিধান সংরক্ষণের জন্যেও বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন । যাতে করে ঐ জীবন বিধান চিরদিন অবিকৃতরূপে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনে তা মানুষের কাছে উপস্থাপন ও শিক্ষা দেয়া যেতে পারে । অর্থাৎ, সর্বদাই একের পর এক এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর প্রদত্ত ঐ দ্বীনকে সর্বদাই অবিকৃতরূপে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তা প্রচার

করবেন । যে বিশিষ্ট বিশ্বাস ঐ ঐশী দ্বীনকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত, তাকেই 'ইমাম' নামে অভিহিত করা হয় । একইভাবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ওহী' বা ঐশীবাণী ও বিধান গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মার অধিকারী ব্যক্তিকে 'নবী' হিসেবে অবিহিত করা হয় । নবুয়তও ইমামতের সমাহার একই ব্যক্তির মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, আবার পৃথক পৃথকও হতে পারে । পূর্বোক্ত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নবী রাসূলগণের জন্যে 'ইমামত' বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণে গুণানিত হওয়ার অপরিহার্যতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি ইমামের জন্যে 'ইসমাত' বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণে গুণানিত হওয়ার অপরিহার্যতাও প্রমাণিত হয় । কেননা, দ্বীনকে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মাঝে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও প্রচারের যোগ্যতাসম্পন্ন অবস্থায় সংরক্ষণ করা আল্লাহর দায়িত্ব । আর এ উদ্দেশ্য ঐশী 'ইসমাত' ( নিষ্পাপ হওয়ার গুণ) ও ঐশী নিরাপত্তা বিধান ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ।

## নবী ও ইমামের পার্থক্য

পূর্বোক্ত আলোচনায় আনীত যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ওহী' বা ঐশীবাণী প্রাপ্তির মাধ্যমে নবী রাসূলগণের ঐশী বিধান লাভের বিষয়টিই শুধুমাত্র প্রমাণিত হয় । কিন্তু ঐ ঐশী বিধানের অব্যাহতভাবে টিকে থাকা ও অবিকৃতভাবে চিরদিন তা সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি সর্বসম্মত একটি বিষয় হলেও উপরোক্ত যুক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় না । তবে ঐশী বিধানের ঐ অমরত্বের কারণেই পুনঃ পুনঃ নবী আগমনের প্রয়োজনহীনতাও প্রমাণিত হয় না । বরং ঐশী বিধানকে মানব জাতির মাঝে সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে চিরদিন সংরক্ষণের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত ইমামের উপস্থিতির অপরিহার্যতা এখানে প্রমাণিত হয় । এমনকি সমাজের লোকেরা ঐ ঐশী ইমামতকে চিনতে পারুক অথবা নাই পারুক, মানব সমাজ কখনোই ঐশী ইমামের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত থাকবে না ।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা যদি আমাদের হেদায়েতকে অস্বীকার করে তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, (তারা) তার অবিশ্বাসী হবে না । (সূরা আল্ আনআম, ৮৯ নং আয়াত ।)

পূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে যে, নবুয়ত ও ইমামত এ দু'টি পদের সমাহার অন্য সময় একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যেতে পারে । আবার এ দু'টি পদের অস্তিত্ব পৃথক পৃথক ভাবেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হতে পারে । তাই নবীহীন যুগে কোন মূহুর্তই ইমামের অস্তিত্ব বিহীন অবস্থায় কাটবে না । আর স্বাভাবিক ভাবেই নবীদের সংখ্যা সীমিত এবং সবসময় তাদের অস্তিত্ব ছিল না ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তার কিছু সংখ্যক নবীকে ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । যেমনঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেন : যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন : নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব । তিনি বললেনঃ আমার বংশধর থেকেও ? তিনি (প্রভু) বললেন : আমার প্রতিশ্রুতিতে অত্যাচারীরা শামিল হবে না । (সূরা আল্ বাকারা, ১২৪ নং আয়াত ।)

তিনি আরও বলেন : আমি তাদেরকে নেতা মনোনীত করলাম । তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত...... । (সূরা আম্বিয়া, ৭৩ নং আয়াত ।)

## কাজের অন্তরালে ইমামত

'ইমাম' যেমন মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের ব্যাপারে নেতা ও পথ পদর্শক স্বরূপ, তেমনি তিনি মানুষের অন্তরেরও ইমাম বা পথ পদর্শক । তিনিই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি ও যে কাফেলা আধ্যাত্মপথে মহান আল্লাহর প্রতি ধাবমান তাদের কর্ণধার স্বরূপ । উক্ত বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্যে নিম্ন লিখিত ভূমিকাটির প্রতি লক্ষ্য করুন ।

**প্রথমত :** এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম সহ পৃথিবীর একত্ববাদী সকল ঐশী ধর্মের দৃষ্টিতে মানব জীবনের চিরন্তন ও প্রকৃতপক্ষে সাফল্য ও দূর্ভাগ্য তার কৃত সৎ ও অসৎ কর্মের উপর নির্ভরশীল । এটাই সকল ঐশী ধর্মের মূলশিক্ষা । মানুষ তার আপন সত্তায় নিহিত খোদাপ্রদত্ত স্বভাব দিয়ে ঐসব সৎ ও অসৎকর্মের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে । মহান আল্লাহ ওহী ও নবুয়তের মাধ্যমে ঐ সব কাজকর্মকে মানব জাতির চিন্তাশক্তি ও বাধশক্তির উপযোগী সামাজিক ভাষায় আদেশ ও নিষেধ এবং প্রশংসা ও তিরস্কারের আকারে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ নির্দেশিত ঐসব আদেশ নিষেধ আনুগত্যকারীদের জন্যে পরকাল এক সমধুর ও অনন্ত জীবনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে । যেখানে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্বের সকল কামনা- বাসনা বাস্তবায়িত হবে । আর তার অবাধ্যকারী অসৎলোকদের জন্যে সর্ব প্রকার ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যপূর্ণ এক তিক্ত ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেয়া হয়েছে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সর্বস্রষ্টা আল্লাহ সকল দিক থেকেই আমাদের কল্পনা শক্তির উর্ধ্বে । তিনি আমাদের মত সামাজিক চিন্তাধারার অধিকারী নন। কারণ, প্রভুত্ব , দাসত্ব, নেতত্ব , আনুগত্য, আদেশ, নিষেধ, পারিশ্রমিক এবং পুরুস্কার প্রথা আমাদের সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এই বস্তুজগতের বাইরে এ সবের কোন অস্তিত্ব নেই । এ সৃষ্টিজগতের সাথে সর্বস্রষ্টা আল্লাহর সম্পর্ক বাস্তব ও সত্য নির্ভর । যেমনটি পবিত্র কুরআন[১৬৪] ও মহানবীর হাদীস সমূহে যেভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে । সে অনুযায়ী দ্বীন এমন কিছু নিগুঢ় সত্য ও উচ্চতর জ্ঞানমালার সমষ্টি, যা সাধারণ বোধশক্তির উর্ধ্বে । মহান আল্লাহ ঐসব জটিল ও উচ্চতর বিষয় সমূহকে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও বোধশক্তির মাত্রার উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মানব জাতির জন্যে অবতির্ণ করেছেন । উক্ত বর্ণনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সৎ ও অসৎ কাজ এবং পরকালের অনন্ত জীবন ও তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বাস্তব সম্পর্ক বিদ্যমান । ভবিষ্যৎ জীবনের (পরকাল) সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্য আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের ঐসব সৎ ও অসৎ কাজের সৃষ্ট ফলস্বরূপ । আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সৎ ও অসৎ কাজগুলো মানুষের আত্মায় এমন এক প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে, যার উপর তার পরকালীন জীবনের সখ- দুঃখ নির্ভরশীল । মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিশুর মতই । লালন-

পালনকালীন সময়ে একটি শিশু তার অভিভাবকের কাছ থেকে ‘এটা কর’ ‘ওটা কর না’ এমনই সব আদেশ নিষেধই প্রতিনিয়ত শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঐ শিশু ঐসব কাজ করা বা না করার মূলমর্ম আদৌ উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয় না। ঐ শিশু যদি শৈশবে লালিত হওয়াকালীন সময়ে তার প্রশিক্ষক বা অভিভাবকের আদেশ নিষেধের ঠিকমত আনুগত্য করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে ভবিষ্যতে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং ভবিষতে সামাজিক জীবনে সে সখী হবে। কিন্তু কোন শিশু যদি শৈশবে তার অভিভাবক বা প্রশিক্ষকের অবাধ্যতা করে, তাহলে সে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না এবং এর ফলে ভবিষ্যত জীবনে সে হতভাগ্য হবে। ঐসব আদেশ নিষেধের নিগূঢ়তত্ত ঐ শিশু বুঝুক অথবা নাই বুঝুক, ঐসবের আনুগত্যেই তার মঙ্গল নিহিত।

একইভাবে মানবজাতিও সর্বস্রষ্টা আল্লাহর কাছে শিশুর মত। আল্লাহর আদেশ নিষেধের মর্ম সে উপলদ্ধি করুক অথবা নাই করুক, তা মানা বা না মানার উপরই তার পরকালীন জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভরশীল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ঔষধ- পথ্য গ্রহণ ও ব্যয়াম করার দায়িত্ব পালনই রোগীর একমাত্র দায়িত্ব। এভাবে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমেই রোগীর দেহে শৃংখলা নেমে আসে এবং রোগী ক্রমেই রোমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং এটাই তখন তার সুখের কারণ হয়ে দাড়ায়। মোটকথা, মানুষ তার এই বাহ্যিক জীবনের পাশাপাশি একটি আধ্যাত্মিক জীবনেরও অধিকারী। মানুষের ঐ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃতি তার কৃতকর্মের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এবং বিকাশ লাভ করে। আর তার পরকালীন জীবনের সকল সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তার জীবনের ঐসব কৃতকর্মের উপরই নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনও উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিগত যুক্তিকে সমর্থন করে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

কুরআনের ঐসব আয়াতে সৎলোক ও আল্লাহতে বিশ্বাসীদের জন্যে এ পৃথিবীর জীবন ও বর্তমান আত্মার চেয়েও অনেক উন্নত ও উচ্চতর জীবন এবং উন্নত ও জ্যোতির্ময় আত্মার অধিকারী হওয়ার সসংবাদ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মানব জীবনের কৃতকর্ম সমূহের অদৃশ্য ফলাফলকে মানুষের নিত্যসঙ্গী হিসেবে বিশ্বাস করে । মহানবী (সা.)- এর হাদীসগুলোতেও এই অর্থই অসংখ্য বার উচ্চারিত হয়েছে ।[১৬৫]

**দ্বিতীয়ত :** প্রায়ই এমনটি ঘটতে দেখা যায় যে, অনেকেই হয়ত অন্যদেরকে কোন সৎ বা অসৎকাজের নির্দেশ দেয়, অথচ সে নিজে ঐসব কাজ করে না, কিন্তু আল্লাহ্র নবী, রাসূল বা ইমামগণের ক্ষেত্রে এমনটি কখনোই পরিলক্ষিত হবে না । কারণ, তারা সরাসরি আল্লাহ্র দ্বারা নির্দেশিত ও পরিচালিত । তারা মানুষকে যে দ্বীনের পথে পরিচালিত করেন এবং তার পথনির্দেশনা দেন, তারা নিজেরাও তা মেনে চলেন । তারা মানুষকে যে আধ্যাত্মিক জীবনের পথে পরিচালিত করেন, তাঁরা নিজেরাও ঐ আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী । কারণ, মহান আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং কাউকে হেদায়েত না করেন বা সৎপথে পরিচালিত না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের সৎপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব ভার তার উপর অর্পণ করেন না । আল্লাহ্র 'বিশেষ হেদায়েত' কখনই ব্যর্থ হতে পারে না । উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ।

১. বিশ্বের প্রতিটি জাতির মধ্যেই তাদের জন্যে প্রেরিত নবী- রাসূল বা ইমাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী, যে জীবনাদর্শ অনুসরণের প্রতি তারা জনগণকে আহবান্ জানায় । আর ঐ আদেশের কার্যক্ষেত্রে (আমলের ব্যাপারে) তাঁরা অন্য সবার চেয়ে অগ্রগামী । কারণঃ নিজেদের প্রচারিত আদর্শকে অবশ্যই ব্যক্তি জীবনেও বাস্তবায়িত করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হতে হবে ।

২. যেহেতু তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী এবং জনগণের পথ প্রদর্শক ও নেতা, তাই তারা অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহত্ত্বের অধিকারী ।

৩. যিনি মহান আল্লাহ্র নির্দেশে 'উম্মত' বা জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি মানুষের বাহ্যিক কার্যক্রমের বিষয়ে যেমন নেতা ও পথপ্রদর্শক, তেমনি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিরও নেতা ও পথ প্রদর্শক।[১৬৬]

# ইমাম ও ইসলামের নেতৃবৃন্দ

পূর্বোক্ত আলোচনা সমূহের ভিত্তিতে এটাই পত্নীয়মান হয় যে, বিশ্বনবী (সা.)- এর তিরোধণের পর ইসলামী উম্মতের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামের (নেতা) অস্তিত্ব ছিল এবং থাকবে । এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে অসংখ্য হাদীস[১৬৭] বর্ণিত হয়েছে । ঐসব হাদীসে ইমামদের বৈশিষ্ট্য, পরিচিতি, সংখ্যা, ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে ।

এমনকি ইমামরা যে, সবাই কুরাইশ বংশীয় এবং মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের সদস্য হবেন তাও বলা হয়েছে । সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, পতীক্ষিত ইমাম হযরত মাহদী (আ.)- ই হবেন ইমামদের মধ্যে সর্বশেষ ইমাম । একইভাবে হযরত আলী (আ.)- এর প্রথম ইমাম হওয়ার ব্যাপারেও মহানবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ হাদীস[১৬৮] বর্ণিত হয়েছে । দ্বিতীয় ইমামের ইমামতের সমর্থনও মহানবী (সা.) ও হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে । একইভাবে প্রত্যেক ইমাম তার পরবর্তী ইমামের ইমামতের সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ্য দলিল রেখে গেছেন ।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের দলিলের ভিত্তিতে ইমামদের মোট সংখ্যা বারজন । তাদের পবিত্র নামগুলো নিম্নরূপৃষ্ঠা

১. হযরত ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)

২. হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (আ.)

৩. হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলী (আ.)

৪. হযরত ইমাম আলী বিন হুসাইন (আ.) [যয়নুল আবেদীন]

৫. হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী (আ.) [বাকের]

৬. হযরত ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ (আ.) [জাফর সাদিক]

৭. হযরত ইমাম মুসা বিন জাফর (আ.) [মুসা কাযিম]

৮. হযরত ইমাম আলী বিন মুসা (আ.) [রেজা]

৯. হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী (আ.) [তাকী]

১০. হযরত ইমাম আলী বিন মুহাম্মদ (আ.) [নাকী]

১১. হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (আ.) [আসকারী]

১২. হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

## বারজন ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

### প্রথম ইমাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- ই সর্বপ্রথম ইমাম । তিনি মহানবী (সা.) এর চাচা এবং বনি হাশিম গোত্রের নেতা জনাব আবু তালিবের সন্তান ছিলেন । আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর এই চাচাই শৈশবেও তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তিনি নিজের ঘরে মহানবী (সা.)- কে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং লালন পালনের মাধ্যমে তাকে বড় করেছিলেন । মহানবী (সা.)এর নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণার পর থেকে নিয়ে যত দিন তিনি (আবু তালিব) জীবিত ছিলেন, মহানবী (সা.)- কে সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন করেছিলেন । তিনি সবসময়ই মহানবী (সা.)- কে কাফেরদের, বিশেষ করে কুরাইশদের সার্বিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন । হযরত ইমাম আলী (আ.) (প্রশিদ্ধ মতানুযায়ী) মহানবী (সা.)- এর নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণার প্রায় দশ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন । হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর জন্মের প্রায় ছ'বছর পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । মহানবী (সা.)- এর আবেদনক্রমে ঐসময় হযরত আলী (আ.) বাবার বাড়ী থেকে মহানবী (সা.)- এর বাড়িতে স্থানান্তরিত হন । তারপর থেকে হযরত ইমাম আলী (আ.) সরাসরি মহানবী (সা.)- এর অভিভাবকত্ব ও তত্বাবধানে তাঁর কাছে লালিত পালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন ।[১৬৯] মহানবী (সা.) হেরা গুহায় অবস্থানকালে তার কাছে সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ওহী' বা ঐশীবাণী অবতির্ণ হয় । যার ফলে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন । এরপর হেরা গুহা থেকে বের হয়ে

মহানবী (সা.) নিজ গৃহে যাওয়ার পথে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এবং তিনি তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন । হযরত ইমাম আলী (আ.) সাথে সাথেই মহানবী (সা.)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন ।[১৭০] অতঃপর নিকট আত্মীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানোর উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে নিজ বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রন জানিয়ে সমবেত করেন । ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সবার প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, 'আপনাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম আমার আহবানে (ইসলাম গ্রহণে) সাড়া দেবে, সেই হবে আমার খলিফা, উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি । কিন্তু উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একমাত্র যে ব্যক্তিটি সর্বপ্রথম উঠে দাড়িয়ে সেদিন বিশ্বনবী (সা.)- এর আহবানে সাড়া দিয়েছিল এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তিনিই হচ্ছেন হযরত ইমাম আলী (আ.) । আর বিশ্বনবী (সা.) সেদিন (তার প্রতি) হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর ঈমানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং স্বঘোষিত প্রতিশ্রুতিও তিনি তার ব্যাপারে পালন করেছিলেন ।[১৭১] এভাবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম । আর তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কখনই মূর্তি পুজা করেননি । মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন মহানবী (সা.)- এর নিত্যসঙ্গী । মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা গমনের রাতে হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই মহানবী (সা.) এর বিছানায় শুয়ে ছিলেন । ঐ রাতেই কাফেররা মহানবী (সা.) এর বাড়ী ঘেরাও করে শেষরাতের অন্ধকারে মহানবী (সা.)- কে বিছানায় শায়িত অবস্থায় হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল । মহানবী (সা.) কাফেরদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবার পূর্বে ই গৃহত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি দিয়েছিলেন ।[১৭২] এরপর হযরত ইমাম আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী তার কাছে গচ্ছিত জনগণের আমানতের মালা- মাল তাদের মালিকদের কাছে পৌছে দেন । তারপর তিনিও নিজের মা, নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) ও অন্য দু'জন স্ত্রীলাক সহ মদীনার পথে পাড়ি দেন ।[১৭৩] এমনকি মদীনাতেও হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন মহানবী (সা.)- এর নিত্যসঙ্গী । নির্জনে অথবা জনসমক্ষে তথা কোন অবস্থাতেই মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখেননি । তিনি স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- কেও

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর কাছেই বিয়ে দেন । সাহাবীদের উপস্থিতিতে মহানবী (সা.), হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের ঘোষণা দেন ।[১৭৪] একমাত্র 'তাবুকের' যুদ্ধ ছাড়া বিশ্বনবী (সা.) (স্বীয় জীবদ্দশায়) যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, হযরত ইমাম আলী (আ.)- ও সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় বিশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন ।[১৭৫] এ ছাড়াও হযরত ইমাম আলী (আ.) কোন যুদ্ধেই আদৌ পিছপা হননি । জীবনে কোন শত্রুর মোকাবিলায় তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি । তিনি জীবনে কখনোই মহানবী (সা.)- এর আদেশের অবাধ্যতা করেননি । তাই তার সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন যে, আলী কখনই সত্য থেকে অথবা সত্য আলী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না ।[১৭৬] বিশ্বনবী (সা.)- এর মৃত্যুর সময় হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বয়স ছিল প্রায় তেত্রিশ বছর । বিশ্বনবী (সা.)- এর সকল সাহাবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের সকল মহত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনিই । সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইমাম আলী (আ.) বয়সের দিক থেকে ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ । আর ইতিপূর্বে বিশ্বনবী (আ.)- এর পাশাপাশি অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধসমুহে যে রক্তপাত ঘটেছিল, সে কারণে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর প্রতি অনেকেই শত্রুতা পোষণ করত । এসব কারণেই বিশ্বনবী (সা.)- এর পরলোক গমনের পর হযরত আলী (আ.)- কে খেলাফতের পদাধিকার লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । আর এর মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রিয় কাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । তাই বাধ্য হয়ে তখন তিনি নিরালায় জীবন যাপন করতে শুরু করেন এবং ব্যক্তি প্রশিক্ষণের কাজে নিজেকে ব্যপৃত করেন । মহানবী (সা.)- এর মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পর তিনজন খলিফার শাসনামল শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই জীবন যাপন করতে থাকেন । তারপর তৃতীয় খলিফা নিহত হবার পর জনগণ হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর কাছে 'বাইয়াত' ( আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন এবং তাকে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেন ।

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফতকাল ছিল প্রায় ৪ বছর ৯ মাস । তিনি তার এই খেলাফতের শাসন আমলে সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন । তিনি

তার খেলাফতকে আন্দোলনমুখী এক বিপ্লবীরূপ প্রদান করে ছিলেন । তিনি তার শাসন আমলে ব্যাপক সংস্কার সাধান করেন । অবশ্য ইমাম আলী (আ.)- এর ঐসব সংস্কারমূলক কর্মসূচী বেশকিছু সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে ছিল । এ কারণে উম্মুল মু'মিনীন আয়শা, তালহা, যুবাইর ও মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে বেশকিছু সংখ্যক সাহাবী হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন । তৃতীয় খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর শ্লোগানকে তারা হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে । আর তারা ইসলামী রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করার মাধ্যমে এক ব্যাপক রাজনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি করে । যার ফলে উদ্ভুত ফিৎনা ও অরাজকতা দমনের জন্যে বসরার সন্নিকটে ইমাম আলী (আ.) নবীপ্রত্নি আয়শা, তালহা, ও যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতির্ণ হতে বাধ্য হন । ইসলামী ইতিহাসের ঐ যুদ্ধটিই 'জঙ্গে জামাল' নামে পরিচিত । এ ছাড়াও ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তে অনুরূপ কারণে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হযরত ইমাম আলী (আ.) 'সিফফিন' নামক আরও একটি যুদ্ধে অবতির্ণ হতে বাধ্য হন । 'সিফফিন' নামক ঐ যুদ্ধ দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল । ঐ যুদ্ধ শেষ না হতেই 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে 'খাওয়ারেজ' ( ইসলাম থেকে বহিস্কৃত) নামক বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ লিপ্ত হতে হয় । ঐ যুদ্ধিটি ইতিহাসে 'নাহরাওয়ানের' যুদ্ধ নামে পরিচিত । এভাবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সমগ্র খেলাফতকালই আভ্যন্তরীণ মতভেদ জনিত সমস্যা সমাধানের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয় । এর কিছুদিন পরই ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ১৯ তারিখে কুফার মসজিদে ফজরের নামাযের ইমামতি করার সময় জনৈক 'খারেজির' তলোয়ারের আঘাতে তিনি আহত হন । অতঃপর ২০শে রমযান দিবাগত রাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[১৭৭] ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং শত্রু ও মিত্র, উভয়পক্ষের স্বীকারোক্তি অনুসারে মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকে আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) ছিলেন সর্বশেষ্ঠ এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটির অস্তিত্বও তার চরিত্রে ছিল না । আর ইসলামে মহত গুণাবলীর দিক থেকে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী (সা.)- এর আদর্শের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিভু ।

ইমাম আলী (আ.)- এর মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে এবং শীয়া, সুন্নী, জ্ঞানী গুণী ও গবেষকগণ যে পরিমাণ গ্রন্থাবলী তার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত রচনা করেছেন, ইতিহাসে এমনটি আর অন্য কারও ক্ষেত্রেই ঘটেনি । হযরত ইমাম আলী (আ.) ছিলেন সকল মুসলমান এবং বিশ্বনবী (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানীব্যক্তি । ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তার অগাধ জ্ঞানগর্ভ বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন । এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারে দর্শন চর্চার মাত্রা যোগ্য করেন । তিনিই কুরআনের জটিল ও রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাখা করেন । কুরআনের বাহ্যিক শব্দাবলীকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্যে তিনি আরবী ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করেন । (এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়েও এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে) বীরত্বের ক্ষেত্রেও হযরত আলী (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য প্রতীক স্বরূপ । বিশ্বনবী (সা.)- এর জীবদ্দশায় এবং তার পরেও জীবনে যত যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, কখনোই তাকে ভীত- সন্ত্রস্ত হতে বা মানসিক অস্থিরতায় ভূগতে দেখা যায়নি । এমনকি ওহুদ, হুনাইন, খান্দাক এবং খাইবারের মত কঠিন যুদ্ধগুলো যখন মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের অন্তরাত্মা কাপিয়ে দিয়েছিল এবং সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কঠিন মূহুর্তগুলোতেও হযরত ইমাম আলী (আ.) কখনোই শত্রুদের সম্মুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি । ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও খুজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কোন খ্যাতিমান বীর যোদ্ধা ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে । তিনি এমন মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও কখনও কোন দূর্বল লোককে হত্যা করেননি এবং তার নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া (প্রাণ ভয়ে) ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করেননি । তিনি কখনোই রাতের আধারে শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমন চালাননি । শত্রুপক্ষের জন্য পানি সরবরাহ কখনোই তিনি বন্ধ করেননি । এটা ইতিহাসের একটি সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা যে, ইমাম আলী (আ.) খাইবারের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের দূর্গম দূর্গের বিশাল লৌহ তোরণটি তাঁর হাতের সামান্য ধাক্কার মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে উপড়ে ফেলেছিলেন ।[১৭৮]

একইভাবে মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে ইমাম আলী (আ.) কা'বা ঘরের মূর্তি গুলো ধ্বংস করেন । 'আকিক' পাথরের তৈরী 'হাবল' নামক মক্কার সর্ববৃহৎ মূর্তিটি কা'বা ঘরের ছাদে স্থাপিত ছিল । ইমাম আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর কাধে পা রেখে কা'বা ঘরের ছাদে উঠে একাই বৃহাদাকার মূর্তিটির মূলোৎপাটন করে নীচে নিক্ষেপ করেন ।[১৭৯]

খোদাভীতি ও আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম আলী (আ.) ছিলেন অনন্য । জনৈক ব্যক্তির প্রতি ইমাম আলী (আ.)- এর রূঢ় ব্যবহারের অভিযোগের উত্তরে মহানবী (সা.) তাকে বলেছিলেন যে, আলীকে তিরস্কার করো না । কেননা সে তো আল্লাহর প্রেমিক ।[১৮০] একবার রাসূল (সা.)- এর সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা.) কোন এক খেজর বাগানে ইমাম আলী (আ.)- এর দেহকে শুষ্ক ও নিঃষ্প্রাণ কাঠের মত পড়ে থাকতে দেখেন । তাই সাথে সাথে নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কাছে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌছালেন এবং নিজের পক্ষ থেকে শোকও জ্ঞাপন করেন । কিন্তু ঐ সংবাদ শুনে হযরত ফাতিমা (আ.) বললেন : না, আমার স্বামী মৃত্যু বরণ করেননি । বরং ইবাদত করার সময় আল্লাহর ভয়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন । আর এ অবস্থা তার ক্ষেত্রে বহু বারই ঘটেছে । অধীনস্থদের প্রতি দয়াশীলতা, অসহায় ও নিঃস্বদের প্রতি ব্যথিত হওয়া এবং দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি পরম উদারতার ব্যাপার ইমাম আলী (আ.)- এর জীবনে অসংখ্য ঘটনার অস্তিত্ব বিদ্যমান । ইমাম আলী (আ.) যা- ই উপার্জন করতেন, তাই অসহায় ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে আল্লাহর পথে দান করতেন । আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সহজ সরল ও কষ্টপূর্ণ জীবন যাপন করতেন । ইমাম আলী (আ.) কৃষি কাজকে পছন্দ করতেন । তিনি সাধারণতঃ পানির নালা কেটে সেচের ব্যবস্থা করতেন । বৃক্ষ রোপণ করতেন । চাষের মাধ্যমে মৃত জমি আবাদ করতেন । কিন্তু পানি সেচের নালা ও আবাদকৃত সব জমিই তিনি দরিদ্রদের জন্যে 'ওয়াকফ' (দান) করতেন । হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে দরিদ্রদের জন্যে 'ওয়াকফ'কৃত ঐসব সম্পত্তির বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ২৪ হাজার সোনার দিনারের সমতুল্য ছিল । তার ঐসব 'ওয়াকফ্'কৃত সম্পত্তি 'আলী (আ.)- এর সাদকা' নামে খ্যাত ছিল ।[১৮১]

# দ্বিতীয় ইমাম

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) ছিলেন দ্বিতীয় ইমাম । তিনি আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) এবং নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- এর প্রথম সন্তান এবং তৃতীয় ইমাম হযরত হুসাইন (আ.) এর ভাই ছিলেন । মহানবী (সা.) অসংখ্যবার বলেছেন : হাসান ও হুসাইন আমারই সন্তান । এমনকি হযরত ইমাম আলী (আ.) তার সকল সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য করে একই কথার পুনারুক্তি করেছিলেন । তিনি বলেছেনঃ তোমরা আমার সন্তান এবং হাসান ও হুসাইন আল্লাহর নবীর সন্তান ।[১৮২] হযরত ইমাম হাসান (আ.) হিজরী ৩য় সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন ।[১৮৩] তিনি প্রায় সাত বছরেরও কিছু বেশী সময় মহানবী (সা.)- এর সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হন । তিনি বিশ্বনবী (সা.)- এর মৃত্যুর প্রায় তিন বা ছয় মাস পর যখন নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) পরলোক গমন করেন, তখন তিনি তার মহান পিতা হযরত আলী (আ.)- এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে থাকেন । পিতার শাহাদতের পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পিতার 'ওসিয়াত' অনুযায়ী তিনি ইমামতের পদে আসীন হন । অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে খেলাফতের পদাধিকারীও হন । প্রায় ৬মাস যাবৎ তিনি খলিফা হিসেবে মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন । কিন্তু মুয়াবিয়া ছিলেন নবীবংশের চরম ও চিরশত্রু । ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় খেলাফতের মসনদ অধিকারের লাভে ইতিপূর্বে বহু যুদ্ধের সূত্রপাত সে ঘটিয়ে ছিল (প্রথমত : ৩য় খলিফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ছলনাময়ী রাজনৈতিক শ্লোগানের ধোয়া তুলে এবং পরবর্তীতে সরাসরি খলিফা হওয়ার দাবী করে) । তখন ইরাক ছিল হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর খেলাফতের রাজধানী । মুয়াবিয়া হযরত ইমাম হাসান (আ.)- কে কেন্দ্রীয় খেলাফতের পদ থেকে অপসারণের লক্ষ্যে ইরাক সীমান্তে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে । একইসাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে গোপনে ইমাম হাসান (আ.)- এর সেনাবাহিনীর বহু অফিসারকে ক্রয় করে । এমনকি ঘুষ ছাড়াও অসংখ্য প্রতারণামূলক লোভনীয় প্রতিশ্রুতি প্রদানের

মাধ্যমে মুয়াবিয়া, ইমাম হাসান (আ.)- এর সেনাবাহিনীকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয় ।[১৮৪]

যার পরিণামে হযরত ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন । উক্ত চুক্তি অনুসারে হযরত ইমাম হাসান (আ.) প্রকাশ্যে খেলাফতের পদত্যাগ করতে বাধ্য হন । চুক্তির শর্ত অনুসারে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরপরই হযরত ইমাম হাসান (আ.) পুনরায় খলিফা হবেন এবং খেলাফতের পদ নবীবংশের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে । আর এই অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে মুয়াবিয়া শীয়াদের যে কোন প্রকারের রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন থেকে বিরত থাকবে ।[১৮৫] আর এভাবেই মুয়াবিয়া কেন্দ্রীয় খেলাফতের পদ দখল করতে সমর্থ হয় এবং ইরাকে প্রবেশ করে । কিন্তু ইরাকে প্রবেশ করে সে এক জনসভার আযোজন করে । ঐ জনসভায় প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে সে ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করে।[১৮৬] আর তখন থেকেই সে পবিত্র আহলে বাইত (নবীবংশ) ও তাদের অনুসারী শীয়াদের উপর সর্বাত্মক অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে শুরু করে । হযরত ইমাম হাসান (আ.) তার দীর্ঘ দশ বছর সময়কালীন ইমামতের যুগে শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে সৃষ্ট প্রচন্ড চাপের মুখে এক শ্বাসরূদ্ধকর পরিবেশে জীবন যাপন করতে বাধ্য হন । এমনকি নিজের ঘরের মধ্যকার নিরাপত্তাও তিনি হারাতে বাধ্য হন । অবশেষে হিজরী ৫০সনে মুয়াবিয়ার ষড়যন্তে ইমাম হাসান (আ.) জনৈকা স্ত্রীর দ্বারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[১৮৭] মানবীয় গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে হযরত ইমাম হাসান (আ.) ছিলেন স্বীয় পিতা ইমাম আলী (আ.) এর স্মৃতিচিহ্ন এবং স্বীয় মাতামহ মহানবী (সা.)- এর প্রতিভু । মহানবী (সা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) সবসময়ই তাঁর সাথে থাকতেন । এমনকি মহানবী (সা.) প্রায়ই তাদেরকে নিজের কাধেও চড়াতেন ।

শীয়া ও সুন্নী উভয় সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন : আমার এই দু'সন্তানই (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন) ইমাম, তারা আন্দোলন করুকু অথবা না করুক, সব অবস্থাতেই তারা ইমাম (এখানে আন্দোলন বলতে প্রকাশ্যে খেলাফতের অধিকারী হওয়া বা না

হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে)[১৮৮] । এ ছাড়া হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর ইমামতের পদাধিকার লাভ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এবং হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ।

## তৃতীয় ইমাম

'শহীদকূলশিরোমণি' হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ছিলেন হযরত ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা (আ.)- এর দ্বিতীয় সন্তান । তিনি চতুর্থ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন । বড় ভাই হযরত ইমাম হাসানের শাহাদতের পর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং ইমাম হাসান (আ.)- এর 'ওসিয়ত' ক্রমে ৩য় ইমাম হিসেবে মনোনীত হন ।[১৮৯] হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) - এর ইমামতকাল ছিল দশ বছর । তার ইমামতের শেষ ৬মাস ছাড়া বাকী সমগ্র ইমামতকালই মুয়াবিয়ার খেলাফতের যুগেই কেটেছিল । তার ইমামতের পুরা সময়টাতেই তিনি অত্যন্ত কঠিন দূরযোগপূর্ণ ও শ্বাসরূদ্ধকর পরিবেশে জীবন যাপন করেন । কারণ, ঐযুগে ইসলামী আইন-কানুন মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছিল । তখন খলিফার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- এর ইচ্ছার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে । মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.) ও শীয়াদের ধ্বংস করা এবং ইমাম আলী (আ.) ও তার বংশের নাম নিশ্চিহ্ন করার জন্যে এমন কোন প্রকার কর্মসূচী নেই যা অবলম্বন করেনি । শুধু তাই নয় মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করার মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে । কিন্তু ইয়াযিদের চরিত্রহীনতার কারণে একদল লোক তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল । তাই মুয়াবিয়া এ ধরণের বিরোধীতা রোধের জন্যে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে । ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে এক অন্ধকারাচ্ছান্ন দূর্দিন কাটাতে হয়েছে । মুয়াবিয়া ও তার অনুচরদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার মানসিক অত্যাচার তাকে নিরবে সহ্য করতে হয়েছিল । অবশেষে হিজরী ৬০ সনের মাঝামাঝি সময়ে মুয়াবিয়া মৃত্যু বরণ করে । তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইয়াযিদ তার স্থলাভিষিক্ত হয় ।[১৯০]

সে যুগে 'বাইয়াত' (আনুগত্য প্রকাশের শপথ গ্রহণ) ব্যবস্থা আরবদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল । বিশেষ করে রাষ্ট্রিয়কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হত । বিশেষ করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকে রাজা বাদশা বা খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্যে অবশ্যই 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হত । 'বাইয়াত' প্রদানের পর তার বিরোধীতা করা বিরোধী ব্যক্তির জাতির জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ও কলঙ্কের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হত । এমনকি মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শে ও স্বাধীন ও ঐচ্ছিকভাবে প্রদত্ত 'বাইয়াতে'র নির্ভরযোগ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল । মুয়াবিয়াও তার জাতীয় প্রথা অনুযায়ী তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে জনগণের কাছ থেকে স্বীয়পুত্র ইয়াযিদের জন্যে 'বাইয়াত' সংগ্রহ করে । কিন্তু মুয়াবিয়া এ ব্যাপারে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করেনি । শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পূর্বে সে ইয়াযিদকে বিশেষভাবে ওসিয়াত করে গিয়েছিল[১৯১] যে, ইমাম হুসাইন (আ.) যদি তার (ইয়াযিদ) আনুগত্য স্বীকার (বাইয়াত) না করে, তাহলে সে (ইয়াযিদ) যেন এ নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে । বরং নীরব থেকে এ ব্যাপারটা যেন সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে । কারণঃ মুয়াবিয়া এ ব্যাপারে আদ্যোপান্ত চিন্তা করে এর দুঃসহ পরিণাম সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পরেছিল।

কিন্তু ইয়াযিদ তার চরম অহংকার ও দুঃসাহসের ফলে পিতার 'ওসিয়তের' কথা ভুলে বসল । তাই পিতার মৃত্যুর পর পরই সে মদীনার গভর্ণরকে তার (ইয়াযিদ) পক্ষ থেকে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কাছ থেকে 'বাইয়াত' গ্রহণের নির্দেশ দিল । শুধু তাই নয়, ইমাম হুসাইন (আ.) যদি 'বাইয়াত' প্রদান অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার কর্তিত মস্তক দামেস্কে পাঠানোর জন্যেও মদীনার গভর্ণরের কাছে কড়া নির্দেশ পাঠানো হয় ।[১৯২]

মদীনার প্রশাসক হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে যথা সময়ে ইয়াযিদের নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করেন । ইমাম হুসাইন (আ.) ঐ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে কিছু অবসর চেয়ে নিলেন। আর ঐ রাতেই তিনি স্বপরিবারে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা নগরী ত্যাগ করেন ।

মহান আল্লাহ ঘোষিত মক্কার 'হারাম শরীফের' নিরাপত্তার বিধান অনুযায়ী তিনি সেখানে আশ্রয় নেন। সময়টা ছিল হিজরী ৬০ সনে রজব মাসের শেষ ও শা'বান মাসের প্রথম দিকে। ইমাম হুসাইন (আ.) প্রায় চার মাস যাবৎ মক্কায় আশ্রিত অবস্থায় কাটান। আর ধীরে ধীরে এ সংবাদ তদানিন্তন ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুয়াবিয়ার অত্যাচারমূলক ও অবৈধ শাসনে ক্ষিপ্ত অসংখ্য মুসলমান ইয়াযিদের এহেন কার্যকলাপে আরও অসন্তুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা সবাই ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রতি নিজেদের সহমর্মিতা প্রকাশ করল। পাশাপাশি ইরাকের বিভিন্ন শহর থেকে, বিশেষ করে ইরাকের কুফা শহর থেকে সেখানে গমনের আমন্ত্রনমূলক চিঠির বন্যা মক্কায় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কাছে প্রবাহিত হতে লাগলো। ঐসব চিঠির বক্তব্য ছিল একটাই আর তা হল, ইমাম হুসাইন (আ.) যেন অনুগ্রহ পূর্বক ইরাকে গিয়ে সেখানকার জনগণের নেতৃত্বের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে যেন তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ বিষয়টি ইয়াযিদের জন্যে অবশ্যই অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার ছিল। মক্কায় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর অবস্থান হজ্জ মৌসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানরা দলে দলে হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় সমবেত হতে লাগল। হাজীরা সবাই হজ্জপর্ব সম্পূর্ণের জন্যে পস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ইতিমধ্যে গোপন সূত্রে ইমাম হুসাইন (আ.) অবগত হলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অনুচর হাজীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছে। ইহরামের কাপড়ের ভতর তারা অস্ত্র বহন করছে। তারা হজ্জ চলাকালীন সময়ে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে তাদের ইহরামের কাপড়ের ভেতর লুকানো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবে।[১৯৩]

ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযিদের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার টের পেয়ে স্বীয় কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে মক্কা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সিদ্ধান্তের পর হজ্জ উপলক্ষ্যে আগত বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে তিনি সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্য পেশ করেন।[১৯৪] ঐ বক্তব্যে তিনি ইরাকের পথে যাত্রা করার ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। একই সাথে তার আসন্ন শাহাদত প্রাপ্তির কথাও তিনি ঐ জনসভায় ব্যক্ত করেন। আর তাকে ঐ মহান লক্ষ্যে (অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ)

সহযোগিতা করার জন্যে উপস্থিত মুসলমানদেরকে আহবান্ জানান । উক্ত বক্তব্যের পরপরই তিনি কিছু সংখ্যক সহযোগীসহ স্বপরিবারে ইরাকের পথে যাত্রা করেন ।

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) কোন ক্রমেই ইয়াযিদের কাছে 'বাইয়াত' প্রদান না করার জন্যে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন । তিনি ভাল করেই জানতেন যে, এ জন্যে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে । তিনি এটাও জানতেন যে, বনি উমাইয়াদের বিশাল ও ভয়ংকার যোদ্ধা বাহিনীর দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করা হবে । অথচ, ইয়াযিদের ঐ বাহিনী ছিল সাধারণ মুসলমানদের, বিশেষ করে ইরাকী জনগণেরই সমর্থনপুষ্ট । কেননা, সে যুগের সাধারণ মুসলমানদের বেশীর ভাগই গণদূর্নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা এবং চিন্তা ও চেতনাগত অধঃপতনে নিমজ্জিত ছিল ।

শুধুমাত্র সে যুগের অল্প ক'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর শুভাকাংখী হিসাবে ইরাক অভিমুখে যাত্রার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন । তারা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর ঐ যাত্রা ও আন্দোলনের বিপজ্জনক পরিণতির কথা তাকে "স্মরণ করিয়ে দেন । কিন্তু তাদের প্রতিবাদের উত্তরে ইমাম হুসাইন (আ.) বলেন, "আমি কোন অবস্থাতেই ইয়াযিদের বশ্যতা শিকার করব না । অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠিকে আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করব না । আমি যেখানেই যাই না কেন, অথবা যেখানেই থাকি না কেন, তারা আমাকে হত্যা করবেই । আমি এ মূহুর্তে মক্কা নগরী এ কারণেই ত্যাগ করছি যে, রক্তপাত ঘটার মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা যেন ক্ষুন্ন না হয় ।[১৯৫]

অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.) ইরাকের 'কুফা' শহরের অভিমুখে রওনা হন । 'কুফা' শহরে পৌছাতে তখনও বেশ ক'দিনের পথ বাকী ছিল । এমন সময় পথিমধ্যে তার কাছে খবর পৌছাল যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত 'কুফার' প্রশাসক ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধিকে হত্যা করেছে । একই সাথে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জনৈক জোরালো সমর্থক এবং 'কুফা' শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়েছে । এমনকি হত্যার পর তাদের পায়ে রশি বেধে 'কুফা' শহরের সকল বাজার এবং অলি গলিতে টেনে হিছড়ে বেড়ানো হয়েছে ।[১৯৬] এছাড়াও সমগ্র 'কুফা' শহর ও তার পার্শ্বস্থ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ।

অসংখ্য শত্রু সৈন্য ইমাম হুসাইন (আ.)- এর আগমনের প্রতিক্ষায় দিন কাটাচ্ছে । সুতরাং শত্রু হস্তে নিহত হওয়া ছাড়া ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জন্যে আর কোন পথই বাকী রইল না । তখন সবকিছু জানার পর ইমাম সুদৃঢ় ও দ্বিধাহীনভাবে শাহাদত বরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং 'কুফা'র পথে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন ।[১৯৭]

'কুফা' পৌছার প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ পূর্বে 'কারবালা' নামক মরুভুমিতে ইমাম পৌছলেন । তখনই ইয়াযিদের সেনাবাহিনী ইমাম হুসাইন (আ.)- কে ঐ মরু প্রান্তরে ঘেরাও করে ফেললো । ইয়াযিদ বাহিনী আটদিন পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (আ.) ও তার সহচরদের সেখানে ঘেরাও করে রাখল । প্রতিদিনই তাদের ঘেরাওকৃত বৃত্তের পরিসীমা সংকীর্ণ হতে থাকে । আর শত্রু সৈন্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল । অবশেষে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) তার স্বীয় পরিবারবর্গ ও অতি নগণ্য সংখ্যক সহচরসহ তিরিশ হাজার যুদ্ধাংদেহী সেনাবাহিনীর মাঝে ঘেরাও হলেন ।[১৯৮] হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আটকাবস্থায় ঐ দিনগুলোতে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । নিজের সহচরদের মধ্যে শুদ্ধিঅভিযান চালান । রাতের বেলা তার সকল সঙ্গীদেরকে বৈঠকে সমবেত করেন । ঐ বৈঠকে সমবেতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন : "মৃত্যু ও শাহাদত বরণ ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই । আমি ছাড়া আর অন্য কারো সাথেই এদের (ইয়াযিদ বাহিনী) কোন কাজ নেই । আমি তোমাদের কাছ থেকে গৃহীত আমার প্রতি 'বাইয়াত' (আনুগত্যের শপথ) এ মূহুর্ত থেকে বাতিল বলে ঘোষণা করছি । তোমাদের যে কেউই ইচ্ছে করলে রাতের এ আধারে এ স্থান ত্যাগ করার মাধ্যমে এই ভয়ংকর মৃত্যু কুপ থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারে । ইমামের ঐ বক্তৃতার পর শিবিরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হল । তখন পার্থিব উদ্দেশ্যে আগত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর অধিকাংশ সঙ্গীরাই রাতের আধারে ইমামের শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেল । যার ফলে হাতে গোনা ইমামের অল্পকিছু অনুরাগী এবং বনি হাশিম গোত্রের অল্প ক'জন ছাড়া ইমামের আর কোন সঙ্গী বাকী রইল না । ইমামের ঐসব অবশিষ্ট সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জন । অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.) পুনরায় তার অবশিষ্ট সঙ্গীদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে সমবেত করেন । সমবেত সঙ্গী ও হাশেমীয় গোত্রের আত্মীয়

স্বজনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) বলেন : আমি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে এদের কোন কাজ নেই । তোমাদের যে কেউ ইচ্ছে করলে রাতের আধারে আশ্রয় গ্রহণের (পালিয়ে যাওয়া) মাধ্যমে নিজেকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার ।

কিন্তু এবার ইমামের অনুরাগী ভক্তরা একে একে সবাই দৃঢ় কন্ঠে জবাব দিল । তারা বললো, আমরা অবশ্যই সে সত্যের পথ থেকে বিমুখ হব না, যে পথের নেতা আপনি । আমরা কখনোই আপনার পবিত্র সহচর্য ত্যাগ করবো না । আমাদের হাতে যদি তলোয়ার থাকে, তাহলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আপনার স্বার্থ রক্ষার্থে যুদ্ধ করে যাব ।[১৯৯]

ইমাম (আ.)- কে প্রদত্ত অবকাশের শেষ দিন ছিল মহররম মাসের ৯ তারিখ । আজ ইমাম হুসাইন (আ.) কে ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকারের (বাইয়াত) ঘোষণা প্রদান করতে হবে অথবা ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হতে হবে । শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ইমামের জবাব চেয়ে পাঠানো হল । প্রত্যুত্তরে ইমাম (আ.) ঐ রাতে (৯ই মহররমের দিবাগত রাত) সময় টুকু শেষ বারের মত ইবাদত করার জন্যে অবসর প্রদানের আবেদন করলেন । আর পর দিন ইয়াযিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতির্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ।[২০০]

হিজরী ৬১ সনের ১০ই মহররম আশুরার দিন, ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৯০জনের চেয়েও কম । যাদের মধ্যে ৪০ জনই ইমামের পুরনো সঙ্গী । আর আনুমানিক ৩০জনেরও কিছু বেশী সৈন্য এক'দিনে (১লা মহররম থেকে ১০ই মহররম পর্যন্ত) ইয়াযিদের বাহিনী ত্যাগ করে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাহিনীতে যোগদান করেছেন । আর অবশিষ্টরা ইমামের হাশেমী বংশীয় আত্মীয় স্বজন, ইমামের ভাই বোনরা ও তাদের সন্তানগণ, চাচাদের সন্তানগণ এবং তার নিজের পরিবারবর্গ । ইয়াযিদের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় ইমাম হুসাইন (আ.) তার ঐ অতি নগন্য সংখ্যক সদস্যের ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে বিন্যস্ত করলেন । অতঃপর যুদ্ধ শুরু হল । সেদিন আশুরার সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন যুদ্ধ চললো । ইমামের হাশেমী বংশীয় সকল যুবকই একের পর এক শাহাদত বরণ করলেন । ইমামের অন্যান্য সাথীরা একের পর এক সবাই শহীদ হয়ে গেলেন । ঐ সকল শাহাদত প্রাপ্তদের মাঝে ইমাম হাসান

(আ.)- এর দু'জন কিশোর পুত্র এবং স্বীয় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর একজন নাবালক পুত্র ও একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলেন ।[২০১] যুদ্ধ শেষে ইয়াযিদ বাহিনী ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পরিবারের মহিলাদের শিবির লুটপাট করার পর তাদের তাবুগুলোতে অগ্নি সংযোগ করে তা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় । তারা ইমামের বাহিনীর শহীদদের মাথা কটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে । শহীদদের লাশগুলোকে তারা বিবস্ত্র করে । দাফন না করেই তারা লাশগুলোকে বিবস্ত্র অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখে । এরপর ইয়াযিদ বাহিনী শহীদদের কর্তিত মস্তকসহ ইমাম পরিবারের বন্দী অসহায় নারী ও কন্যাদের সাথে নিয়ে কুফা শহরের দিকে রওনা হল । ঐসব বন্দীদের মাঝে ইমাম পরিবারের পুরুষ সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র অল্প ক'জন । এদের একজন ছিলেন চরমভাবে অসুস্থ তিনি হলেন, হযরত ইমাম হুসাইনের ২২ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) । ইনিই সেই চতুর্থ ইমাম । অন্য একজন ছিলেন ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)- এর ৪ বছর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মদ বিন আলী । ইনিই হলেন পঞ্চম ইমাম হযরত বাকের (আ.) । আর তৃতীয় জন হলেন, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জামাতা এবং হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর পুত্র হযরত হাসান মুসান্না (রহঃ) । তিনি চরমভাবে আহত অবস্থায় শহীদদের লাশের মাঝে পড়ে ছিলেন । তখনও তার শ্বাসক্রিয়া চলছিল । শহীদদের মাথা কাটার সময় ইয়াযিদ বাহিনীর জনৈক সেনাপতির নির্দেশে তার মাথা আর কাটা হয়নি । অতঃপর তাকেও সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে বন্দীদের সাথে কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হল । তারপর কুফা থেকে সকল বন্দীকে দামেস্কে ইয়াযিদের দরবারের নিয়ে যাওয়া হয় ।

ইমাম পরিবারের নারী ও কন্যাদেরকে বন্দী অবস্থায় এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুড়িয়ে বেড়ানো হয় । পথিমধ্যে আমিরুল মু'মিনীন ইমাম আলী (আ.)- এর কন্যা হযরত জয়নাব (আ.) ও ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) জনগণের উদ্দেশ্যে কারবালার ঐ মর্মান্তিক ঘটনার ভয়াবহ বর্ণনা সম্বলিত মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন । কুফা ও দামেস্কে তাদের প্রদত্ত ঐ হৃদয়বিদারক গণভাষণ উমাইয়াদেরকে জনসমক্ষে যথেষ্ট অপদস্থ করে । যার ফলে মুয়াবিয়ার বহু বছরের অপপ্রচারের পাহাড় মূহুর্তেই ধুলিসাৎ হয়ে যায় । এমনকি শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে

দাড়ালো যে, ইয়াযিদ তার অধীনস্থদের এহেন ন্যক্কারজনক কার্যকলাপের জন্যে বাহ্যিকভাবে জনসমক্ষে অসন্তুষ্টি প্রকাশে বাধ্য হয়েছিল । কারবালার ঐ ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনা এতই শক্তিশালী ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তারই প্রভাবে উমাইয়া গোষ্ঠি তাদের শাসনক্ষমতা থেকে চিরতরে উৎখাত হয়ে যায় । ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনাই শীয়া সম্প্রদায়ের মূলকে অধিকতর শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে । শুধু তাই নয়, কারবালার ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একের পর এক বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং ছোট বড় অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাত ঘটতে থাকে । এ অবস্থা প্রায় বার বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল । শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (আ.)-কে হত্যা করার সাথে জড়িত একটি ব্যক্তিও জনগণের প্রতিশোধের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়নি ।

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবন ইতিহাস, ইয়াযিদ এবং তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যার সূক্ষাতিসূক্ষ জ্ঞান রয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে জানেন যে, সে দিন হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সামনে শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল । আর তা ছিল শাহাদত বরণ । কেননা, ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত প্রদান, প্রকাশ্যভাবে ইসলামকে পদদলিত করারই নামান্তর । তাই ঐ কাজটি ইমামের জন্যে আদৌ সম্ভব ছিল না । কারণ, ইয়াযিদ যে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আইন কানুনকে সম্মান করত না, তাই নয়; বরং সে ছিল উচ্ছৃংখল চরিত্রের অধিকারী । এমনকি ইসলামের পবিত্র বিষয়গুলো এবং ইসলামী বিধানকে প্রকাশ্যে পদদলিত করার মত স্পর্ধাও সে প্রদর্শন করত । অথচ, ইয়াযিদের পূর্ব পুরুষরা ইসলামের বিরোধী থাকলেও তারা ইসলামী পরিচ্ছদের অন্তরালে ইসলামের বিরোধীতা করত । কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তারা ইসলামকে সম্মান করত । তারা প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-কে সহযোগিতা করত এবং ইসলামের গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বাহ্যত গর্ববোধ করত । কারবালার ইতিহাসের অন্য বিশ্লেষকই বলে থাকেন যে, ঐ দুই ইমামের [ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.)] মতাদর্শ ছিল দু'ধরণের যেমন : ইমাম হাসান (আ.) প্রায় ৪০ হাজার সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়েও মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেন । আর ইমাম হুসাইন (আ.) মাত্র ৪০ জন অনুসারী নিয়েই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে: অবতির্ণ হন । কিন্তু ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কারণ, ইমাম হুসাইন (আ.), যিনি মাত্র একটি দিনের জন্যেও ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার করেননি, সেই তিনিই ইমাম হাসান (আ.)- এর পরপর দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ মুয়াবিয়ার শাসনাধীনে সন্ধিকালীন জীবন যাপন করেন । ঐ সময় তিনি প্রকাশ্যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করেননি । প্রকৃতপক্ষে, ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.) যদি সেদিন মুয়াবিয়ার সংগে যুদ্ধে অবতির্ণ হতেন, তাহলে অবশ্যই তারা নিহত হতেন । আর এর ফলে ইসলামের এক বিন্দু মাত্র উপকারও হত না । কেননা, মুয়াবিয়ার কপটতাপূর্ণ রাজনীতির কারণে, বাহ্যত তাকেই সত্য পথের অনুসারী বলে মনে হত । এছাড়া মুয়াবিয়া নিজেকে রাসূল (সা.)- এর সাহাবী, 'ওহী' লেখক এবং মু'মিনদের মামা (মুয়াবিয়ার জনৈকা বোন রাসূলের স্ত্রী ছিলেন) হিসেবে জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়াত । আপন স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে এমন কোন চক্রান্ত নেই যা সে অবলম্বন করেনি । এমতাবস্থায় মুয়াবিয়ার এহেন প্রতারণামূলক রাজনীতির মোকাবিলায় ইমাম হাসান (আ.) বা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কোন কর্মসূচীই ফলপ্রসূ হত না ।

মুয়াবিয়া এতই চতুর ছিল যে, সে অতি সহজেই লোক লাগিয়ে ইমামদের হত্যা করত । আর সে নিজেই নিহত ইমামদের জন্যে প্রকাশ্যে শোক অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিত । কেননা, একই কর্মসূচী সে তৃতীয় খলিফার ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত করেছিল ।

## চতুর্থ ইমাম

তৃতীয় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পুত্র হযরত আলী বিন হুসাইন (আ.) হলেন চতুর্থ ইমাম । তার প্রসিদ্ধ উপাধি হল 'সাজ্জাদ' ও জয়নুল আবেদীন । আর এ দুটো নামেই (উপাধি) তিনি অধিক পরিচিত । তার মা হলেন ইরানের ইয়াযদগের্দের রাজকন্যা । হযরত ইমাম সাজ্জাদই (আ.) ছিলেন ইমাম হুসাইন (আ.)- এর একমাত্র জীবিত পুত্র । কারণ, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর অন্য তিন ভাই কারবালায় শাহাদৎ বরণ করেন ।[২০২]

অবশ্য হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- ও পিতার সাথে কারবালায় উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু তিনি সেখানে ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন । যার ফলে অস্ত্র বহন বা যুদ্ধ করার মত দৈহিক সামর্থ তখন তার মোটেই ছিল না । তাই তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ বা শাহাদত বরণ করতে পারেননি । যুদ্ধশেষে ইমাম পরিবারের নারী ও কন্যাদের সাথে বন্দী অবস্থায় তাকে দামেস্কে পাঠানো হয় । তারপর সেখানে কিছুদিন বন্দী জীবন কাটানোর পর গণসন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইয়াযিদের নির্দেশে সসম্মানে তাকে মদীনায় পাঠানো হয় । পরবর্তীতে 'আব্দুল মালেক' নামক জনৈক উমাইয়া খলিফার নির্দেশে চতুর্থ ইমামকে পুনরায় বন্দী করে শিকল দিয়ে হাত পা বেধে দামেস্কে পাঠানো হয় । অবশ্য দামেস্ক থেকে আবার তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হয় ।[২০৩]

চতুর্থ ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.) মদীনায় ফেরার পর ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন । অপরিচিতদেরকে সাক্ষাত প্রদান থেকে তিনি বিরত থাকেন । তখন থেকেই সর্বক্ষণ তিনি নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন । হযরত আবু হামজা সামালী (রা.) ও হযরত আবু খালেদ কাবুলীর (রা.) মত বিশিষ্ট শীয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সাথেই তিনি যোগাযোগ করতেন না । ইমামের ঐ বিশিষ্ট সাহাবীরা তার কাছ থেকে যেসব জ্ঞান আরহণ করতেন, তা তারা শীয়াদের মধ্যেই বিতরণ করতেন । এভাবে শীয়া মতাদর্শের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে । আর এর প্রভাব পরবর্তীতে পঞ্চম ইমামের যুগে প্রকাশিত হয় । 'সাহিফাতুস সাজ্জাদিয়াহ' নামক চতুর্থ ইমামের দোয়ার সংকলন তার অবদান সমূহের অন্যতম । এই ঐতিহাসিক দোয়ার গ্রন্থটিতে ৫৭টি দোয়া রয়েছে । যার মধ্যে ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে । এই গ্রন্থ কে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের 'যাবুর' ( হযরত দাউদের (আ.) কাছে অবতির্ণ ঐশী গন্থ) বলে অভিহিত করা হয় । বেশকিছু শীয়া সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) ৩৫ বছর যাবৎ ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন । এরপর উমাইয়া খলিফা হিশামের প্ররোচণায় 'ওয়লিদ। ইবনে আব্দুল মালেক' নামক জনৈক ব্যক্তি বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম (আ.)- কে হত্যা করে ।[২০৪] এভাবে হিজরী ৯৫ সনে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) শাহাদত বরণ করেন ।

# পঞ্চম ইমাম

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী ওরফে বাকের (আ.) হলেন পঞ্চম ইমাম । ‘বাকের’ অর্থ পরিস্ফুটনকারী । মহানবী (সা.) স্বয়ং তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন ।[২০৫] তিনি ছিলেন চতুর্থ ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.)- এর পুত্র । তিনি হিজরী ৫৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন । ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর । কারবালায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ব পুরুষদের ওসিয়তের মাধ্যমে তিনি ইমামতের আসনে সমাসীন হন ।

হিজরী ১১৪ অথবা ১১৭ সনে (কিছু শীয় বর্ণনা অনুযায়ী) উমাইয়া খলিফা হিশামের ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহীম বিন ওয়লিদ বিন আব্দুল মালেকের দ্বারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[২০৬]

পঞ্চম ইমামের যুগে ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন গণঅভ্যুত্থান ও যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে । এমনকি স্বয়ং উমাইয়া পরিবারের মধ্যেও মতভেদ শুরু হয় । এ সব সমস্যা উমাইয়া প্রশাসনকে এতই ব্যস্ত রাখে যে, পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ তাদের তেমন একটা হয়ে উঠতো না । যার ফলে পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) প্রতি তাদের অত্যাচারের মাত্রা অনেকটা কমে যায় । এছাড়া কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা এবং পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) নির্যাতিত অবস্থা জনগণের হৃদয়ের আবেগ অনুভূতিকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছিল । আর চতুর্থ ইমাম ছিলেন কারবালার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার অন্যতম সাক্ষী । এর ফলে ক্রমেই মুসলমানরা পবিত্র আহলে বাইতগণের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়েন । এ সব কারণে, পঞ্চম ইমামের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনায় জনগণ এবং বিশেষ করে শীয়াদের গণস্রোতের ঢল নামে । যার ফলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও পবিত্র আহলে বাইতের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপক সুযোগ ইমাম বাকের (আ.)- এর জন্যে সৃষ্টি হয় । এমনকি তার পূর্ববতী ইমামগণের

(আ.) জীবনেও এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনও আসেনি । এ যাবৎ প্রাপ্ত অসংখ্য হাদীসই এ বক্তব্যের উত্তম সাক্ষী । শীয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী,  পণ্ডিত ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ অসংখ্য বিখ্যাত আলেমই হযরত ইমাম বাকেরর (আ.) পবিত্র জ্ঞান নিকেতনে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়েছেন । ঐসব বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও পণ্ডিতগণের পূর্ণ পরিচিতি 'রিজাল' ( ইসলামী ঐতিহাসিক জ্ঞানী গুণীদের পরিচিতি শাস্ত্র) শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত আছে ।[২০৭]

## ষষ্ঠ ইমাম

পঞ্চম ইমামের পুত্র হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ আস্ সাদেক (আ.) ছিলেন ষষ্ঠ ইমাম । তিনি হিজরী ৮৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি হিজরী ১৪৮ সনে (শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে) আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের চক্রান্তে বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন ।[২০৮] ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগে তদানিন্তন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একের পর এক উমাইয়া শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল । ঐসবের মধ্যে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে 'মুসাওয়াদাহু' বিদ্রোহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেননা,  ঐ বিদ্রোহের মাধ্যমেই উমাইয়া শাসকগোষ্ঠি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত হয় । এছাড়াও ঐসময়ে সংঘটিত বেশকিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ ঘটিয়েছিল । পঞ্চম ইমাম তার দীর্ঘ বিশ বছরের ইমামতের যুগে উমাইয়া খেলাফতের বিশৃংখল ও অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন । এর মাধ্যমে তিনি জনগণের মাঝে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও পবিত্র আহলে বাইতের পবিত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেন । এভাবে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদেক (আ.)- এর জন্যে এক চমৎকার ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় ।

ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগটি ছিল উমাইয়া খেলাফতের শেষ ও আব্বাসীয় খেলাফতের শুরুর সন্ধিক্ষণ । হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ঐ সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস পান । ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য বিখ্যাত পণ্ডিত ও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার কাছেই প্রশিক্ষণপ প্রাপ্ত হয়েছেন । যাদের মধ্যে জনাব যরারাহ , মুহাম্মদ বিন মুসলিম, মুমিন তাক, হিশাম বিন হাকাম, আবান বিন তাগলুব, হিশাম বিন সালিম, হারিয, হিশাম কালবী নাসাবাহ, জাবের বিন হাইয়্যান সুফীর (রসায়নবিদ) নাম উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অসংখ্য বিখ্যাত আলেমগণও তার শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে ইসলামী পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । যাদের মধ্যে হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, কাযী সাকুনী, কাযী আব্দুল বাখতারী, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য, যারা ষষ্ঠ ইমামের শিষ্যত্ব বরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে ইতিহাস বিখ্যাত প্রায় ১৪ হাজার মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) ও ইসলামী পন্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য ।[২০৯] হযরত ইমাম বাকের (আ.) ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর দ্বারা বর্ণিত হাদীস সমূহের পরিমাণ, মহানবী এবং অন্য দশ ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের চেয়ে অনেক বেশী ।

কিন্তু হযরত জাফর সাদেক (আ.) তাঁর ইমামতের শেষ পর্বে এসে আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের কু- দৃষ্টির শিকার হন । খলিফা মানসুর তাকে সদা কড়া পাহারা, নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতার মাঝে বসবাস করতে বাধ্য করেন । আব্বাসীয় খলিফা মানসুর নবীবংশের সাইয়্যেদ বা আলাভীদের উপর অসহ্য নির্যাতন চালাতে শুরু করেন । তার ঐ নির্যাতনের মাত্রা উমাইয়া খলিফাদের নিষ্ঠুরতা ও বিবেকহীন স্পর্ধাকেও হার মানিয়ে দেয় । খলিফা মানসুরের নির্দেশে নবীবংশের লোকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হত । অন্ধকারাচ্ছান্ন জেলের মধ্যে তাদের উপর সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় । নির্যাতনের মাধ্যমে তিলেতিলে তাদের হত্যা করা হত । তাদের অনেকের শিরোচ্ছেদও করা হয়েছে । তাদের বহুজনকে আবার জীবন্ত কবর দেয়া হত । তাদের অনেকের দেহের উপর দেয়াল ও অট্টালিকা নির্মাণ করা হত ।

খলিফা মানসুর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- কে মদীনা ত্যাগ করে তার কাছে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারী করে । অবশ্য হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ইতিপূর্বে একবার

আব্বাসীয় খলিফা সাফফাহ- র নির্দেশে তার দরবারের উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন । এছাড়াও তার পিতার (পঞ্চম ইমাম) সাথে একবার উমাইয়া খলিফা হিশামের দরবারের তাকে উপস্থিত হতে হয়েছিল । খলিফা মানসুর বেশ কিছুকাল যাবৎ ষষ্ঠ ইমামকে কড়া পাহারার মাঝে নজরবন্দী করে রাখেন । খলিফা মানসুর বহুবার ইমামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল । সে ইমামকে বহুবারই অপদস্থ করেছিল । অবশেষে সে ইমামকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয় । ইমাম মদীনায় ফিরে যান । ইমাম তার জীবনের বাকী সময়টুকু অত্যন্ত কঠিন 'তাকীয়ার' মাঝে অতিবাহিত করেন । তখন থেকে তিনি স্বেচ্ছায় গণসংযোগবিহীন ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন । এরপর এক সময় খলিফা মানসুরের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমামকে শহীদ করা হয় ।[২১০]

মানসুর ষষ্ঠ ইমামের শাহাদতের সংবাদ পেয়ে মদীনার প্রশাসককে চিঠি মারফৎ একটি নির্দেশ পাঠালো । ঐ লিখিত নির্দেশে বলা হয়েছে, মদীনার প্রশাসক ষষ্ঠ ইমামের শোকার্ত পরিবারের প্রতি সান্তনা জ্ঞাপনের জন্যে যেন তাঁর বাড়িতে যায় । অতঃপর সে যেন ইমামের ওসিয়ত নামা' (উইল) তার পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তা পড়ে দেখে । ইমামের 'ওসিয়ত নামায়' যাকে তার পরবর্তী ইমাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে (পরবর্তী ইমাম) যেন তৎক্ষণাৎ সেখানেই শিরোচ্ছেদ করা হয় । এই নির্দেশ জারীর ব্যাপারে মানসুরের মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে ইমামতের বিষয়টি চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া । কেননা এর ফলে শীয়াদের প্রাণ প্রদীপ চিরতরে নিভে যাবে । খলিফার নির্দেশ অনুসারে মদীনার প্রশাসক ইমামের বাড়িতে গিয়ে তার 'ওসিয়ত নামা' চেয়ে নেয় । কিন্তু তা পড়ার পর সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে । কারণ, ঐ 'ওসিয়ত নামায়' ইমাম পাঁচ ব্যক্তিকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত ও ঘোষণা করেছেন । ঐ পাঁচ ব্যক্তি হচ্ছেন : স্বয়ং মানসুর, মদীনার প্রশাসক, ইমামের সন্তান আব্দুল্লাহ আফতাহ্, ইমামের ছোট ছেলে মুসা কাজেম এবং হামিদাহ । এ ধরণের অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে খলিফার সকল ষড়যন্ত্র ধুলিষ্যাৎ হয়ে গেল ।[২১১]

## সপ্তম ইমাম

ষষ্ঠ ইমামের পুত্র হযরত মুসা বিন জাফরই (কাযিম) (আ.) ছিলেন সপ্তম ইমাম । তিনি হিজরী ১২৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮৩ সনে জেলে বন্দী অবস্থায় বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন ।[২১২] পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামগণের ওসিয়ত অনুযায়ী ইমামতের পদে আসীন হন । সপ্তম ইমাম হযরত মুসা কাযিম (আ.) আব্বাসীয় খলিফা মানসুর, হাদী, মাহদী, এবং হারুনুর রশিদের সমসাময়িক যুগে বাস করতেন । তার ইমামতের কালটি ছিল অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছান্ন ও সুকঠিন যার ফলে 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তার জীবনকাল অতিবাহিত হয় । অবশেষে খলিফা হারুনুর রশিদ হজ্জ উপলক্ষ্যে মদীনায় গিয়ে ইমামকে বন্দী করে । খলিফা হারুনের নির্দেশে 'মসজিদে নববীতে' নামাযরত অবস্থায় ইমামকে গ্রেপ্তার ও শিকল পরানো হয় । শিকল পরানো অবস্থাই ইমামকে মদীনা থেকে বসরায় এবং পরে বাগদাদে বন্দী হিসেবে স্থানান্তর করা হয় । ইমামকে বহু বছর একাধারে জেলে বন্দী অবস্থায় রাখা হয় । এসময় তাকে একের পর এক বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করা হয় । অবশেষে 'সিন্দি ইবনে শাহেক' নামক বাগদাদের এক জেলে বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[২১৩] অতঃপর 'মাকাবিরে কুরাইশ' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয় । ঐ স্থানের বর্তমান নাম 'কাযেমাইন' নগরী ।

## অষ্টম ইমাম

সপ্তম ইমামের পুত্র হযরত আলী বিন মুসা আর রেযা (আ.)- ই হলেন অষ্টম ইমাম । তিনি হিজরী ১৪৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২০৩ সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[২১৪] পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে ও পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের আসনে সমাসীন হন । আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের পুত্র খলিফা আমিনের এবং তার অন্য আর এক পুত্র

খলিফা মামুনুর রশিদের শাসনামলেই অষ্টম ইমামের ইমামতকাল অতিবাহিত হয় । পিতার মৃত্যুর পর মামুনুর রশিদের সাথে তার ভাই খলিফা আমিনের মতভেদ শুরু হয় । তাদের ঐ মতভেদ শেষ পর্যন্ত একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় । অবশেষে খলিফা আমিনের নিহত হওয়ার মাধ্যমে ঐ সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে । আর এর ফলে মামুনুর রশিদ খেলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করতে সমর্থ হয় ।[২১৫] মামুনুর রশিদের যুগ পর্যন্ত 'আলাভী' (রাসূল বংশের লোক) সৈয়দদের ব্যাপারে আব্বাসীয় খেলাফত প্রশাসনের নীতি ছিল আক্রোশমূলক ও রক্তলোলুপ । নবীবংশের প্রতি তাদের গৃহীত ঐ হিংসাত্মক নীতি দিনদিন কঠোরতর হতে থাকে । তৎকালীন রাজ্যের কোথাও কোন 'আলাভী' (নবীবংশের লোক) বিদ্রোহ করলেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মহাবিশৃংখলার সৃষ্টি হত । যে বিষয়টি স্বয়ং রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের জন্যেও এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করত । পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ ঐসব আন্দোলন ও বিদ্রোহের ব্যাপারে আদৌ কোন সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপ করতেন না । সেসময় আহলে বাইতের অনুসারী শীয়া জনসংখ্যা ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয় । নবীবংশের ইমামগণকে (আ.) তারা তাদের অবশ্য অনুকরণীয় দ্বীনি নেতা এবং মহানবী (সা.)- এর প্রকৃত প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে বিশ্বাস করত । সেযুগে খেলাফত প্রশাসন কায়সার ও কায়সার রাজ দরবার সদৃশ্য ছিল । ঐ খেলাফত প্রশাসন তখন মুষ্টিমেয় চরিত্রহীন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হত । শীয়াদের দৃষ্টিতে তা ছিল এক অপবিত্র প্রশাসন যা তাদের ইমামদের পবিত্রাংগন থেকে ছিল অনেক দূরে । এ ধরণের পরিবেশের অগ্রগতি খেলাফত প্রশাসনের জন্যে ছিল বিপদজনক এক প্রতিবন্ধক, যা খেলাফতকে প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন করছিল । ঐ ধরণের শ্বাসরুকর পরিবেশ থেকে খেলাফত প্রশাসনকে উদ্ধারের জন্যে খলিফা মামুনুর রশিদ ভীষণভাবে চিন্তিত হল । খলিফা মামুন লক্ষ্য করল, ৭০ বছর যাবৎ আব্বাসীয় খেলাফত মরচে পড়া ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে ব্যর্থতারই প্রমাণ দিয়েছে । বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা ঐ রাজনীতি সংস্কারের মধ্যেই সে ঐ দূরাবস্থার চির অবসান খুজে পেল । তার গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে অষ্টম ইমাম হযরত রেজা (আ.)- কে তার খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করে । এই ঘোষণার মাধ্যমে সে

খেলাফতের পথকে সম্পূর্ণরূপে কন্টকমুক্ত করতে চেয়েছিল । কেননা, নবীবংশের সৈয়দগণ যখন রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের সাথে জড়িত হয়ে পড়বেন, তখন খেলাফতের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের বিদ্রোহ থেকেই তারা বিরত থাকবেন ।

আর আহলে বাইতের অনুসারী শীয়াগণ তখন তাদের ইমামকে খেলাফত প্রশাসনের মাধ্যমে অপবিত্র হতে দেখবে, যে প্রশাসনের পরিচালকদের এক সময় অপবিত্র বলে বিশ্বাস করত । তখন আহলে বাইতের ইমামদের প্রতি শীয়াদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও পরম ভক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে । এভাবে তাদের ধর্মীয় সাংগঠনিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে ।[২১৬] এর ফলে রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতাই আর অবশিষ্ট থাকবে না । আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উদ্দেশ্য চারিতার্থের পর ইমাম রেজা (আ.)-কে তার পথের সামনে থেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেয়া খলিফা মামুনের জন্যে কোন কঠিন কাজই নয় । মামুনের ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত ইমাম রেজা (আ.)-কে মদীনা থেকে 'মারওয়' নামক স্থানে নিয়ে আসে । ইমামের সাথে প্রথম বৈঠকেই মামুন তাকে খেলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তাব দেয় । এরপর সে ইমামকে তার মৃত্যুর পর খেলাফতের উত্তাধিকারী হবার প্রস্তাব দেয় । কিন্তু ইমাম রেজা (আ.) মামুনের ঐ প্রস্তাব সম্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন । কিন্তু মামুন চরমভাবে পীড়াপীড়ির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার পরবর্তী খেলাফতের উত্তরাধিকার গ্রহণের ব্যাপারে সম্মত হতে ইমামকে বাধ্য করে । কিন্তু হযরত ইমাম রেজা (আ.) এই শর্তে মামুনের প্রস্তাবে সম্মত হন যে, ইমাম প্রশাসনিককারযে লোক নিয়োগ বা বহিস্কারসহ কোন ধরণের রাষ্ট্রিয় কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করবেন না ।[২১৭] এটা ছিল হিজরী ২০০সনের ঘটনা । কিছুদিন না যেতেই মামুন দেখতে পেল যে, শীয়াদের সংখ্যা পূর্বের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এমনকি ইমামের প্রতি সাধারণ জনগণের ভক্তি দিনদিন আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে । শুধু তাই নয়, মামুনের সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তিই ইমামের ভক্ত হয়ে পড়ছে । এ অবস্থাদৃষ্টে খলিফা মামুন তার রাজনৈতিক ভুল বুঝতে পারে । মামুন ঐ জটিল সমস্যার সমাধান কল্পে ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন । শাহাদতের পর অষ্টম

ইমামকে ইরানের ‘তুস’  নগরীতে (বর্তমানে মাশহাদ নামে পরিচিত) দাফন করা হয় । খলিফা মামুনুর রশিদ ‘দর্শন’  শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগহ দেখিয়ে ছিল । সে প্রায়ই জ্ঞান- বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যালোচনার বৈঠকের আয়োজন করত । সে যুগের বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিতগণ তার ঐ বৈঠকে উপস্থিত হতেন এবং জ্ঞানমূলক আলোচনায় অংশ নিতেন । অষ্টম ইমাম হযরত রেজা (আ.)- ও ঐ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতেন । দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সাথে পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্কে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন । ইমামের ঐসব জ্ঞানমূলক ঐতিহাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠানের বর্ণনা শীয়াদের হাদীসসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে ।[২১৮]

## নবম ইমাম

অষ্টম ইমামের পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন আলী আত তাকী (আ.) হলেন নবম ইমাম । তিনি ইমাম যাওয়াদ এবং ইবনুর রেযা নামেও সম্যক পরিচিত । তিনি হিজরী ১৯৫ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে হিজরী ২২০ সনে আব্বাসীয় খলিফা মু’তাসিম বিল্লাহর প্ররোচনায় বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন । আব্বাসীয় খলিফা মামুনের কন্যা ছিল তার স্ত্রী । খলিফা মু’তাসিম বিল্লাহর প্ররোচনায় ইমামের স্ত্রী (খলিফা মামুনের কন্যা) ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন । বাগদাদের ‘কাযেমাইন’  এলাকায় দাদার (সপ্তম ইমাম) কবরের পাশেই তাকে কবরস্থ করা হয় । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববতী ইমামগণের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত হন । মহান পিতার মৃত্যুর সময় নবম ইমাম মদীনায় ছিলেন । আব্বাসীয় খলিফা মামুন তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠায় । আব্বাসীয় খেলাফতের তৎকালীন রাজধানী ছিল বাগদাদ । খলিফা মামুন প্রকাশ্যে ইমামকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে এবং তার সাথে নম্র ব্যাবহার করে । এমনকি খলিফা মামুন তার নিজ কন্যাকে ইমামের সাথে বিয়ে দেয় । এভাবে সে ইমামকে বাগদাদেই রেখে দেয় । প্রকৃতপক্ষে ঐ বিয়ের

মাধ্যমে ইমামকে ঘরের ভিতরে এবং বাইরে উভয় দিক থেকেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায় । ইমাম তাকী (আ.) বেশ কিছুদিন বাগদাদে কাটানোর পর খলিফা মামুনের অনুমতি নিয়ে মদীনায় ফিরে যান । তারপর খলিফা মামুনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই ছিলেন । খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর মু'তাসিম বিল্লাহ খলিফার সিংহাসনে আরোহণ করেন । এরপরই খলিফা মু'তাসিম ইমামকে পুনরায় বাগদাদে ডেকে পাঠায় এবং তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয় । অতঃপর খলিফা মু'তাসিমের প্ররোচনায় ইমামের স্ত্রী (খলিফা মামুনের কন্যা) ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করে ।[২১৯]

## দশম ইমাম

নবম ইমামের পুত্র হযরত আলী ইবনে মুহাম্মদ আন্ নাকী (আ.)- ই হলেন দশম ইমাম । ইমাম হাদী নামেও তাকে ডাকা হত । তিনি হিজরী ২১২ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ২৫৪ হিজরী সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তায বিল্লাহর নির্দেশে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে শহীদ করা হয় ।[২২০] ইমাম নাকী (আ.) তার জীবদ্দশায় ৭জন আব্বাসীয় খলিফার (মামুন, মুতাসিম, ওয়াসিক, মুতাওয়াক্কিল, মুনতাসির, মুসতাঈন ও মুতায বিল্লাহ) শাসনামল প্রত্যক্ষ করেন । আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের শাসনামলেই ইমাম নাকী (আ.)- এর মহান পিতা (নবম ইমাম) বিষ প্রয়োগের ফলে হিজরী ২২০ সনে বাগদাদে শাহাদত বরণ করেন । তখন তিনি (দশম ইমাম) মদীনায় অবস্থান করছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের পদে অভিষিক্ত হন । তিনি ইসলাম প্রচার ও তার শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন । এরপর আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল শুরু হয় । ইতিমধ্যে অনেকেই ইমাম নাকী (আ.) সম্পর্কে খলিফার কান গরম করে তোলে । ফলে খলিফা মুতাওয়াক্কিল হিজরী ২৪৩ সনে তার দরবারের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে, ইমামকে মদীনা থেকে 'সামেররা' শহরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয় । 'সামেররা' শহর ছিল তৎকালীন আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী । খলিফা মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত

সম্মানসূচক একটি পত্র ইমামের কাছে পাঠায় । পত্রে সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইমামের সাক্ষাত লাভের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং ইমামকে দ্রুত 'সামেররা' শহরের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ।[২২১] কিন্তু 'সামেররা' শহরে প্রবেশের পর ইমামকে আদৌ কোন অভ্যর্থনা জানান হয়নি । বরং ইমামকে কষ্ট দেওয়া ও অবমাননা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুরই আয়োজন করা হয়েছিল । এ ব্যাপারে খলিফা বিন্দুমাত্র ত্রুটিও করেনি । এমনকি ইমামকে হত্যা এবং অবমাননা করার লক্ষ্যে বহুবার তাকে খলিফার রাজ দরবারের উপস্থিত করানো হত । খলিফার নির্দেশে বহুবার ইমামের ঘর তল্লাশী করা হয় ।

নবীবংশের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে মুতাওয়াক্কিলের জড়ি মেলা ভার । খলিফা মুতাওয়াক্কিল হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর প্রতি মনে ভীষণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত । এমনকি হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর ব্যাপারে প্রকাশ্যে সে অকথ্য মন্তব্য করত । খলিফা কৌতুক অভিনেতাকে বিলাস বহুল পোষাকে হযরত আলী (আ.)- এর অনুকরণমূলক ভঙ্গীতে তার (ইমাম আলী) প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক অভিনয় করার নির্দেশ দিত । আর ঐ দৃশ্য অবলোকন খলিফা চরমভাবে উল্লাসিত হত । হিজরী ২৩৭ সনে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশেই কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর মাযার (রওজা শরীফ) এবং তদসংলগ্ন অসংখ্য ঘরবাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় । তার নির্দেশে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর মাযার এলাকায় পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইমামের মাযারের উপর চাষাবাদের কাজ শুরু করা হয় । যাতে করে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর নাম এবং মাযারের ঠিকানা চিরতরে ইতিহাস থেকে মুছে যায় ।[২২২] আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসন আমলে হেজাজে (বর্তমান সৌদি আরব) বসবাসকারী সাইয়্যেদদের (নবীবংশের লোকজন) দূর্দশা এতই চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যে, তাদের স্ত্রীদের পরার মত বোরখাও পর্যন্ত ছিল না । অল্প ক'জনের জন্যে মাত্র একটি বোরখা ছিল, যা পরে তারা পালাক্রমে নামায পড়তেন ।[২২৩] শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে ঠিক এমনি ধরণের অত্যাচারমূলক কার্যক্রম মিশরে বসবাসকারী সাইয়্যেদদের

(নবীবংশের লোকজন) উপরও করা হয় । দশম ইমাম খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সবধরণের অত্যাচার ও শাস্তিই অম্লান বদনে সহ্য করেন ।

এরপর একসময় খলিফা মুতাওয়াক্কিল মৃত্যুবরণ করে । মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর মুনতাসির, মুস্তাঈন ও মু'তায একের পর এক খেলাফতের পদে আসীন হয় । অবশেষে খলিফা মু'তাযের ষড়যন্ত্রে ইমামকে বিষ প্রয়োগ করা হয় এবং ইমাম শাহাদত বরণ করেন ।

## একাদশ ইমাম

দশম ইমামের পুত্র হযরত হাসান বিন আলী আল আসকারী (আ.) হলেন একাদশ ইমাম । তিনি হিজরী ২৩২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে হিজরী ২৬০ সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদের দ্বারা বিষ প্রয়োগে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[২২৪]

পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি ইমামতের পদ লাভ করেন । তার ইমামতের মেয়াদকাল ছিল মাত্র সাত বছর । ইমাম আসকারী (আ.)- এর যুগে আব্বাসীয় খলিফার সীমাহীন নির্যাতনের কারণে অত্যন্ত কঠিন তাকীয়া নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয় । তিনি হাতে গোনা বিশিষ্ট ক'জন শীয়া ব্যতীত অন্য সকল সাধারণ শীয়াদের সাথে গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হন । এরপরও তার ইমামত কালের অধিকাংশ সময় জেলে বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয় ।[২২৫] রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরোপিত ঐ প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপের মূল কারণ ছিল এই যে,

**প্রথমত :** সে সময় চারিদিকে শীয়াদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল । শীয়ারা যে ইমামতে বিশ্বাসী এবং কে তাদের ইমাম, এটা তখন সবাই ভাল করেই জানত । এ কারণেই খেলাফতের পক্ষ থেকে ইমামদেরকে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয় । আর এসকল রহস্যময় পরিকল্পনার মাধ্যমে ইমামদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা চালাত ।

**দ্বিতীয়ত :** খেলাফত প্রশাসন এটা জানতে পরেছিল যে, ইমামের অনুসারী বিশিষ্ট শীয়ারা ইমামের এক বিশেষ সন্তানের আগমনে বিশ্বাসী এবং তাঁর জন্যে প্রতীক্ষারত । এছাড়াও স্বয়ং একাদশ ইমাম এবং তার পূর্ববর্তী ইমামগণের (আ.) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী একাদশ ইমামের আসন্ন পুত্র সন্তানই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) যার আগমনের সু সংবাদ স্বয়ং মহানবী (সা.)- ই দিয়েছেন । মহানবী (সা.)- এর ঐ সকল হাদীস শীয়া এবং সুন্নী উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে ।[২২৬] আর ঐ নবজাতকই হলেন ইমাম মাহদী (আ.) বা দ্বাদশ ইমাম । এ সকল কারণেই একাদশ ইমামকে খেলাফতের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী যে কোন ইমামের তুলনায়ই অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় । তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা এ ব্যাপারে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, ইমামতের এই বিষয়টিকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করতে হবেই । ইমামতের এই দরজাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে । এ কারণেই যখন আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদ ইমামের অসুস্থ অবস্থার সংবাদ পেল, সাথে সাথেই সে ইমামের কাছে একজন ডাক্তার পাঠায় । ঐ ডাক্তারের সাথে খলিফার বেশ ক'জন বিশ্বস্থ অনুচরসহ ক'জন বিচারককেও ইমামের বাড়িতে পাঠানো হয় । এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তারা ইমামের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ও তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় । আর এটাই ছিল খলিফা মু'তামিদের মূল উদ্দেশ্য ইমামের শাহাদত বরণের পরও তার সমস্ত বাড়ী ঘরে তল্লাশী চালানো হয় । এমনকি ধাত্রীদের দিয়ে ইমামের বাড়ীর মহিলা ও তার দাসীদেরকেও দৈহিক পরীক্ষা করানো হয় । ইমামের শাহাদত বরণের পর প্রায় দু'বছর পর্যন্ত খলিফার নির্দেশে ইমামের সন্তানের অস্তিত্ব খুজে পাওয়ার জন্যে সর্বত্র ব্যাপক তল্লাশী অব্যাহত থাকে । দীর্ঘ দু'বছর পর খলিফা ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে ।[২২৭] শাহাদত বরণের পর 'সামেরা' শহরে নিজ গৃহে পিতার (দশম ইমাম) শিয়রে ইমাম আসকারীকে (আ.) দাফন করা হয় । পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ তাদের জীবদ্দশায় অসংখ্য খ্যাতনামা আলেম ও হাদীস বিশারদ তৈরী করেছিলেন । যাদের সংখ্যা শতাধিক । এই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ঐসব (ইমামদের শিষ্যবর্গ)

বিশ্ববরেণ্য আলেমদের নাম ও তাদের রচিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখে বিরত থেকেছি।[২২৮]

## দ্বাদশ ইমাম

একাদশ ইমামের পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হাসান আল্ মাহদী হলেন দ্বাদশ ইমাম । তিনি মাহদী মাওউদ, ইমামুল আসর এবং সাহেবুজ জামান নামে পরিচিত । হিজরী ২৫৫ অথবা ২৫৬ সনে ইরাকের 'সামেরা' শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । পিতার শাহাদতের (২৬০ হিঃ) পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরাসরি পিতার তত্ত্বাবধানেই লালিত পালিত হন । অবশ্য ঐসময় তাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসবাস করতে হয় । শুধুমাত্র ইমামের অনুসারী অল্প ক'জন বিশিষ্ট শীয়া ব্যতীত তার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আর কারও ঘটেনি । পিতার (একাদশ ইমাম) শাহাদত প্রাপ্তির পর তিনি ইমামতের পদে অভিষিক্ত হন । কিন্তু তার পরপরই মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন । দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তার বিশেষ প্রতিনিধিবর্গ ছাড়া আর কারো নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি ।[২২৯]

## বিশেষ প্রতিনিধি

দ্বাদশ ইমাম হযরত মাহদী (আ.) আত্মগোপন করার পর জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীকে (রহঃ) নিজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন । তিনি ইমামের দাদা (দশম ইমাম) ও বাবার (একাদশ ইমাম) বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত । জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মাধ্যমেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) শীয়া জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন । জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মৃত্যুর পর তারই পুত্র মুহাম্মদ বিন ওসমান ইমাম মাহদী (আ.) এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । জনাব মুহাম্মদ বিন ওসমান ওমারীর মৃত্যুর পর জনাব আবুল কাসিম হুসাইন বিন রূহ্ আন

নওবাখতি (রহঃ) ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । তার মৃত্যুর পর জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) ইমাম মাহদী (আ.)- এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) হিজরী ৩২৯ সনে মৃত্যু বরণ করেন । তার মৃত্যুর অল্প ক'দিন পূর্বে ইমামের স্বাক্ষরসহ একটি নির্দেশ নামা জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরীর হাতে পৌছে । ঐ নির্দেশ লিপিতে ইমাম মাহদী (আ.) তাকে বলেন যে, আর মাত্র ছয় দিন পরই তুমি এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিবে । তার পরপরই বিশেষ প্রতিনিধিত্বের যুগের অবসান ঘটবে এবং দীর্ঘকালীন অর্ন্তধানের যুগ শুরু হবে । মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের নির্দেশনা আসা পর্যন্ত ঐ দীর্ঘ কালীন অর্ন্তধানের যুগ অব্যাহত থাকবে ।[২৩০] ইমামের হস্তলিপি সম্পন্ন ঐ পত্রের বক্তব্য অনুসারে ইমাম মাহদী (আ.)- এর অর্ন্তধানকালীন জীবনকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করা যায় ।

**প্রথম :** স্বল্পকালীন অর্ন্তধান । হিজরী ২৫০ সনে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং হিজরী ৩২৯ সন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে । অর্থাৎ প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত এই অর্ন্তধান স্থায়ী ছিল ।

**দ্বিতীয় :** দীর্ঘকালীন অর্ন্তধান । হিজরী ৩২৯ সন থেকে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছামত এই অর্ন্তধান অব্যাহত থাকবে । মহানবী (সা.)- এর একটি সর্বসম্মত হাদীসে বলা হয়েছে : এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে ।[২৩১]

# সাধারণ দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব

ইতিপূর্বে আমরা নবুয়ত ও ইমামতের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, গণহেদায়েতের নীতি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে বলবৎ রয়েছে। সেই নীতির, অপরিহার্য ফলাফল স্বরূপ মানবজাতি 'ওহী' ও 'নবুয়তের' শক্তি সরঞ্জামে সুসজ্জিত। ঐ বিশেষ শক্তিই মানব জাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিশেষ শক্তি যদি সামাজিক জীবন যাপনকারী মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করতেই না পারে, তাহলে ঐ বিশেষ শক্তির সরঞ্জাম মানবজাতিকে সুসজ্জিত করার মূলকাজটিই বৃথা বলে প্রমাণিত হবে। অথচ, এ সৃষ্টিজগতে বৃথা বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অন্যকথায় বলতে গেলে, মানব জাতি যেদিন থেকে এ জগতে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে সৌভাগ্যপূর্ণ (সার্বিক অর্থে) এক সামাজিক জীবন যাপনের আকাংখা তার হৃদয়ে লালন করে আসছে। আর সেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই সে প্রয়াজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার হৃদয়ে ঐ আকাংখা সত্যিই যদি অবাস্তব হত, তাহলে নিশ্চয়ই সে ঐ আকাংখার স্বপ্নিল ছবি তার হৃদয় পটে আকতো না। অথচ, আবহমান কাল থেকে জগতের প্রতিটি মানুষই তার জীবনে এমন একটি আকাংখা হৃদয় কঠুরীতে লালন করে আসছে। যদি খাদ্যের অস্তিত্ব না থাকত তা হলে ক্ষুধার অস্তিত্ব থাকত না। পানির অস্তিত্বই যদি না থাকবে, তাহলে কিভাবে তৃষ্ণার অস্তিত্ব থাকতে পারে? যৌনাংগের অস্তিত্বই যদি না থাকত তা হলে যৌন কামনার অস্তিত্বও থাকত না। এ কারণেই বিশ্ব জগতে এমন এক দিনের আবির্ভাব ঘটবে, যখন মানব সমাজ সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার ভোগ করবে। সমগ্র বিশ্বে তখন শান্তি নেমে আসবে। সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করবে। তখন মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের মাঝে নিমিজ্জিত হবে। অবশ্য ঐ ধরণের পরিবেশ টিকিয়ে রাখার ব্যাপরটি তখন মানুষের উপরই নির্ভরশীল হবে। ঐধরণের সমাজের নেতৃত্ব দান করবে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা; হাদীসের ভাষায় যার নাম হবে মাহদী (আ.)। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মেই বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা সম্পর্কে আলোচিত

হয়েছে এবং সাধারণভাবে তার আবির্ভাবের সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে । যদিও ঐ বক্তব্যের বাস্তব প্রয়োগে কমবেশী মতভেদ রয়েছে । সর্বসম্মত হাদীসে মহানবী (সা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বলেছেনঃ "প্রতিশ্রুত মাহদী আমারই সন্তান ।"

## বিশেষ দৃষ্টিকোণে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব

মহানবী (সা.) ও পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের পক্ষ থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজকে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন দান করবে ।[২৩২] অসংখ্য হাদীসের সাক্ষ্য অনুযায়ী একাদশ ইমাম
হযরত হাসান আসকারীর (আ.) সন্তানই ইমাম মাহদী (আ.) ।[২৩৩] হাদীস সমূহের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর জন্মের পরে সুদীর্ঘকালের জন্যে তিনি অদৃশ্যে অবস্থান করবেন । তারপর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ বিশ্বে সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন ।

## কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

**প্রশ্ন :** শীয়া বিদ্বেষী লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তিমূলক প্রশ্ন উপস্থাপন করে যে, ইমাম মাহদী (আ.) শীয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ যাবৎ প্রায় ১২০০ বছর জীবন যাপন করেছেন । অথচ এযাবৎ পৃথিবীর কোন মানুষই এত দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পারে না ।

**উত্তর :** বাহ্যিকভাবে আপত্তিটি গ্রহণযোগ্য বটে । তবে আমরা যদি উক্ত বিষয় সংক্রান্ত মহানবী (সা.) ও ইমামগণের (আ.) হাদীসগুলো পড়ে দেখি, তা হলে অবশ্যই দেখতে পাব যে,

সেখানে ইমাম মাহদী (আ.)- এর ঐ দীর্ঘ জীবনকে অলৌকিক ও অসাধারণ একটি বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । অবশ্য অলৌকিক বিষয় এবং অসম্ভব বিষয় এক নয় । বরং দু'টিই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় । জ্ঞানগত দিক থেকে অলৌকিক বিষয়কে অস্বীকার করা সম্ভব নয় । কারণ, এটা কারও পক্ষে আদৌ বলা সম্ভব নয় যে, শুধুমাত্র আমাদের দেখা এবং জানা কার্য- কারণ গুলোই এ বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল । আর এর বাইরে এ জগতে অন্য কোন কার্য- কারণই ক্রিয়াশীল নয়, যা সম্পর্কে আমাদের আদৌ কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই । অথবা যে সব কার্য- কারণ, কখনই আমরা দেখিনি, অনুধাবন করিনি তার কোন অস্তিত্বই এ জগতে থাকতে পারে না । সুতরাং উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এক বা একাধিক মানুষের ক্ষেত্রে এ বিশ্ব জগতে এমন কোন কার্য কারণ ঘটতে পারে, যার ফলে তাদের আয়ু একাধিক হাজার বছর পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে । আর এই সম্ভাবনার অস্তিত্বের কারণেই আজ আমরা দেখতে পাই যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের দীর্ঘায়ু লাভ সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণায় আজও নিরাশ হয়নি । আর ঐশীগ্রন্থের অধিকারী এবং নবীদের অলৌকিক নিদর্শনে বিশ্বাসী ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ ধরণের আপত্তিমূলক প্রশ্নের উপস্থাপন সত্যিই আশ্চার্যজনক ।

**প্রশ্ন :** শীয়া বিরোধীরা আপত্তি করে বলে যে, শীয়ারা তো দ্বীনি বিধান ও ইসলামের নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা ও জনগণের নেতৃত্ব প্রদানের জন্যেই ইমামের উপস্থিতিকে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে । কিন্তু ইমামের অর্ন্তধানের বিষয়টি শীয়াদের বর্ণিত ঐ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ বলেই প্রমাণ করে । অর্ন্তধানের ফলে জনগণ যদি ইমামের নাগালই না পায়, তাহলে ঐ ইমামের অদৃশ্য অস্তিত্বই তো মূল্যহীন । মানবসমাজ সংস্কারের জন্যে যদি ইমামের অস্তিত্বের প্রয়োজন আল্লাহ কখনও উপলব্ধি করেন, তাহলে ঐ মুহূর্তেই তাকে সৃষ্টি করার মত ক্ষমতাও আল্লাহর রয়েছে ।

সুতরাং ইমামের আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত ইমামের আয়ু দীর্ঘায়িত করার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই ।

**উত্তর :** উপরোক্ত প্রশ্ন উথাপনকারী আসলে ইমামতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হননি । ইতিপূর্বে ইমামতের অধ্যায়ে আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের বাহ্যিক জ্ঞান ও

বিধিবিধান বর্ণনা এবং জনগণের প্রকাশ্যে নেতৃত্ব দানই ইমামের একমাত্র দায়িত্ব নয় । মানুষের বাহ্যিক পথনির্দেশনা যেমন ইমামের দায়িত্ব, তেমনি গোপন ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব দানও তারই দায়িত্ব । মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে তো তিনিই বিন্যাস করেন এবং মানুষের কৃতকর্মের প্রকৃত স্বরূপকেও তিনিই আল্লাহর অভিমুখে পরিচালিত করেন । এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ইমামের দৈহিক উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি এখানে আদৌ কার্যকর নয় । আধ্যাত্মিকভাবে সকল মানুষের হৃদয় ও আত্মার সাথে ইমামের সংযোগ বিদ্যমান এবং সবার আত্মার উপরই তিনি সম্যক দ্রষ্টা ও প্রভাবশালী । যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি অদৃশ্য অবস্থায় রয়েছেন এবং তার দ্বারা মানবসমাজের সংস্কার ও তার আত্মপ্রকাশের সময় এখনও উপস্থিত হয়নি । তবুও তার প্রতিনিয়ত অদৃশ্য উপস্থিতি মানবজাতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন ।

# পরিশিষ্টঃ শীয়াদের আধ্যাত্মিক আহবান

বিশ্ববাসীর প্রতি শীয়াদের বাণী শুধু এটাই যে, "আল্লাহকে জানুন।" অর্থাৎ জীবনে যদি সৌভাগ্য ও মুক্তি কামনা করেন, তাহলে আল্লাহকে জানার পথ অবলম্বন করুন। আর এটা প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী (সা.)- এর হাদীসের অনুরূপ। বিশ্বনবী (সা.) যখন ইসলামের আন্তর্জাতিক আহবানের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন : হে জনগণ! এক আল্লাহকে জানতে চেষ্টা কর এবং আল্লাহকে এক বলেই স্বীকার কর। কেননা এর মধ্যেই তোমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এই অমিয় বাণীর ব্যাখায় সংক্ষেপে এটাই বলব মানুষ হিসেবে আমরা স্বভাবগতভাবে জীবনের বিভিন্ন পার্থিব লক্ষ্য ও কামনা বাসনার পুজারী। যেমন : সুস্বাদু খাদ্য, পানীয়, সুন্দর পোষাক, আরামপ্রদ বাসস্থান, মনোরম দৃশ্য, সুন্দরী স্ত্রী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশাল ধনসম্পদ, প্রবল ক্ষমতা, উচ্চতর রাজনৈতিক পদমর্যাদা, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব, আপন মনের সাধ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বাস্তবায়ন ও বিরোধীদের বিনাশই আমাদের প্রবৃত্তির চির আকাংখা। কিন্তু এর পাশাপাশি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক অনুযায়ী আমরা সবাই এটা উপলদ্ধি করতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের উপভোগ্য সবকিছু মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে ঐসবের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। স্বাভাবতই ঐ সমস্ত কিছু মানুষের পিছনে ছুটে আসবে। তাই মানুষকে ঐসবের পিছনে ধাবিত হওয়া উচিত নয়। উদরপূর্তি এবং যৌনতৃপ্তি ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া তো গরু ছাগেলেরই বা পাশবিক জীবনাদর্শ। অন্যদের হত্যা করা, ছিন্ন- ভিন্ন করা এবং অসহায় করাতো বাঘ, নেকড়ে, বা শিয়ালেরই নীতি। আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকপ্রসূত স্বভাবই মানুষের জীবনাদর্শ। বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞাজাত জীবন দর্শনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করে। আমাদেরকে তা কখনোই কামরিপু চরিতার্থের পথে বা আত্মঅহমিকা অথবা স্বার্থ পরতার পথে পরিচালিত করে না। বিবেক ও প্রজ্ঞা প্রসূত জীবন দর্শন মানুষকে এ সৃষ্টি জগতেরই একটি অংশ বিশেষ হিসেবে বিবেচনা করে। ঐ জীবন দর্শনের দৃষ্টিতে মানুষ

সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সার্বভৌম কোন অস্তিত্বের অধিকারী নয় । অথচ মানুষ সাধারণতঃ ধারণা করে যে, সে এই প্রকৃতি জগতের নিয়ন্ত্রক । তার ধারণা অনুযায়ী সে- ই এই অবাধ্য ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতিকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার কাছে নতজানু হতে বাধ্য করে । অথচ, প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার নিজের অজান্তেই এই প্রকৃতির হাতের পুতুল এবং তার নির্দেশ পালনকারী আজ্ঞাবহ দাস মাত্র । প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত জীবন দর্শন মানুষকে এই দ্রুত ধ্বংসশীল জগতের নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধির ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও সূক্ষ পর্যবেক্ষণের আহবান জানায় । কেননা, এর ফলে মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সৃষ্টিজগতের কিছুই নিজ থেকে অস্তিত্বশীল হয়নি । বরং তা এক অসীম উৎস থেকেই উৎসরিত । ঐ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে এটা মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আকাশ ও পৃথিবীর সব সুন্দর ও অসুন্দর অস্তিত্ব বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অন্য একটি বাস্তবতারই প্রতিফলন মাত্র । এটা ঐ মূল অস্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যার বহিঃপ্রকাশ কখনও নিজ থেকে নয় । অতীতের সকল ঘটনা, শক্তি ও মহিমা সবই আজ রূপকথার গল্প বৈ আর কিছুই নয় । তেমনি আজকের ঘটনাপ্রবাহও আগামীকালের রূপকথা বৈ কিছু নয় । অর্থাৎ সবকিছুই তার নিজের কাছে রূপকথারই নামান্তর বটে । এ বিশ্বজগতে একমাত্র মহান আল্লাহ বাস্তব অস্তিত্বের অধিকারী । তাঁর অস্তিত্বই অমর । বিশ্বের সবকিছু তাঁরই আশ্রয়ে অস্তিত্বের রং ধারণ করে । তারই সত্তার জ্যোতিতে সবকিছু অস্তিত্বের জ্যোতি লাভ করে । মানুষ যখন এধরণের উপলব্ধির অধিকারী হয়, তখন তার অন্তরচক্ষু উন্মোচিত হয় । তখন সে তার ঐ অন্তরচক্ষু দিয়ে এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বগত সীমাবদ্ধতা অবলোকন করতে সক্ষম হয় । তখন সে উপলব্ধি করে যে, সমগ্র বিশ্ব জগত এক অপরিসীম আয়ু, শক্তি ও জ্ঞানের অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল । এ জগতের প্রতিটি অস্তিত্বই অনন্ত জগতের এক একটি জানালা স্বরূপ, যার ভিতর সেই অনন্ত অসীম জগতের দৃশ্যাবলীর কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হয় । মানুষের উপলব্ধি যখন এমনই এক স্তরে উন্নীত হবে, তখন সে তার মৌলিকত্ব ও সার্বভৌমত্বকে তার প্রকৃত সত্তার অধিকারীর কাছেই প্রত্যর্পণ করবে । তখন সে আপন হৃদয়কে সকল অস্তিত্বের বাধন থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র এক

আল্লাহর সত্তার সাথে হৃদয়কে গেথে নেবে । একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোন শক্তির সামনে সে মাথা ঝোকাবে না । এ পর্যায়ে পৌছানোর পরই সে মহান আল্লাহর পবিত্র তত্ত্বাবধান ও কৃতকর্মের অধীন হয় । তখন প্রতিটি অস্তিত্বকেই সে আল্লাহর মাধ্যমেই চেনে এবং সৎকাজ ও সচ্চরিত্র অর্জনের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর দ্বারাই সে পরিচালিত হয় । আর এটাই হচ্ছে মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তর । ইমামগণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহও তত্ত্বাবধানেই শ্রেষ্ঠত্বের ঐ বিশেষ মানবীয় স্তরে উন্নীত হন । আর যে ব্যক্তি তার স্বীয় প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই পর্যায়ে উন্নীত হন, তিনিই ইমামের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হন । এটাই তার সাথে ইমামের পদমর্যাদাগত পার্থক্য । তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পরিচিতি এবং ইমাম পরিচিতির বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় । একইভাবে আল্লাহ পরিচিতি ও আত্মপরিচিতির বিষয়ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় । কেননা, যে তার আপন সত্তাকে চিনতে সক্ষম হল, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তিই সর্বস্রষ্টা আল্লাহর সত্তাকেও অনুধাবন করতে সক্ষম হল ।

## তথ্যসূত্র :

১। মহান আল্লাহ বলেছেন : ‘‘স্মরণ রাখ! আল্লাহর অভিশাপ অত্যাচারীদের উপর নিপতিত, যারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাতে বক্রতা সৃষ্টি করে। (- সুরা আল আ'রাফ, ৪৪ ও ৪৫ নং আয়াত।)

২। মহান আল্লাহ বলেন : তার চেয়ে দ্বীনের ব্যাপারে কে উত্তম যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে এবং নিজেও সৎকর্ম পরায়ণ, আর একনিষ্ট ভাবে ইব্রাহীমের সরল ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? ( - সূরা আন্ নিসা, ১২৫ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেনঃ তুমি বল, হে ঐশী গ্রন্থের অধিকারীগণ! এসো, এমন এক কথায় (ঐক্য বদ্ধ হই) যা আমাদের ও তোমাদের মাঝেও একই (সমভাবে গ্রহণযোগ্য); যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো ইবাদত না করি এবং কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক না করি। আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যেন প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা এ প্রস্তাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলিম। (- সুরা আল্ ইমরান, ৬৪ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিনগণ তোমরা সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণের স্তরে (ইসলামে) প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ককে অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।(- সুরা আল্ বাকারা ২০৮ নম্বর আয়াত।)

৩। ‘যাইদিয়া’দের যে দলটি ইমাম আলী (আঃ)- এর পূর্ববর্তী দু’জন খলিফাকে (১ম ও ২য় খলিফা) সঠিক বলে বিশ্বাস করে এবং ফেকাহগত দিক থেকে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী, তারাও শীয়া হিসেবে পরিচিত। তবে এরা বনি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের মোকাবিলায় ইমাম আলী (আঃ) ও তার বংশধরদেরকেই (পবিত্র আহলে বাইত) খেলাফতের ন্যায্য অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। এ কারণেই এদেরকেও শীয়া বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ (হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল বললেন) হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার প্রতি অনুগত (মুসলিম) এক উম্মত (সৃষ্টি) কর’’। (- সুরা আল বাকারা, ১২৮ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ । তিনিই পূর্বে তোমাদেরকে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হিসেবে নাম করণ করেছেন। (- সুরা আল হাজ্জ, ৭৮ নং আয়াত।)

৪. রাসূল (সঃ)- এর জীবদ্দশায় সর্ব প্রথম যে পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটে, তা হল ‘শীয়া’। রাসুল (সঃ)- এর সাহাবী হযরত আবুযার (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত মিকদাদ (রাঃ), হযরত আম্মার

ইয়াসিরও (রাঃ) রাসুল (সঃ)- এর জীবদ্দশাতেই এই খেতাবে ভূষিত ছিলেন। (হাদের আল আলাম আল্ ইসলামী, ১ম খণ্ড, ১৮৮ নং পৃষ্ঠা)

৫. (হে রাসূল) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (সুরা 'আশ শুয়ারা' ২১৫ নং আয়াত)

৬. এ হাদীসে হযরত আলী (আঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ট। আমি মহানবীকে (সঃ) বললামঃ 'আমি আপনার প্রতিনিধি হব'। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তার হাত আমার কাধে রেখে বললেন, 'এ ব্যক্তি আমারই ভাই, আমার উত্তরাধিকারী এবং আমার স্থলাভিষিক্ত। তোমরা অবশ্যই এর আনুগত্য করবে'। উপস্থিত লোকেরা হেসে আবু তালিবকে বলল, 'তোমাকে এবার থেকে তোমার ছেলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে।' ( 'তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠা। আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ , ৩য় খণ্ড, ৩৯ নং পৃষ্ঠা। গায়াতুল মারাম, ৩২০ নং পৃষ্ঠা।)

৭. হযরত উম্মে সালমা হতে বর্ণিত; হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ আলী (আঃ) সর্বদা সত্য ও কুরআনের সাথে রয়েছে। আর সত্য ও কুরআনও সর্বদা আলী (আঃ)- এর সাথে রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। এ হাদীসটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ১৫টি বর্ণনা সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর শীয়াদের ১১টি বর্ণনা সূত্র থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উম্মে সালমা, ইবনে আব্বাস, প্রথম খলিফা আবু বকর, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা, হযরত আলী (আঃ), আবু সাঈদ খুদরী, আবু লাইলা এবং আবু আইয়ুব আনসারী প্রমুখ সাহাবীগণ হয়েছেন এ হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী, ( - বাহরানী রচিত 'গায়াতুল মারাম' ৫৩৯ ও ৫৪০ নং পৃষ্ঠা)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ আলীর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, কেননা, সত্য সর্বদা তার সাথে রয়েছে। - আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ্ , ৭ম খণ্ড ৩৬ নং পৃষ্ঠা।

৮. হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ 'হিকমাত (প্রজ্ঞা) দশ ভাগে বিভক্ত যার নয় ভাগই দেয়া হয়েছে আলী (আঃ)-কে এবং বাকী এক ভাগ সমগ্র মানব জাতির মাঝে বন্টন করা হয়েছে'। (- আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ্, ৭ম খণ্ড ৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

৯. যখন মক্কার কাফিররা আল্লাহর রাসূল (সঃ)- কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করল, তখন মহা নবী (সঃ) মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হযরত আলী (আঃ)- কে বললেন, তুমি কি আমার বিছানায় শুতে প্রস্তুত আছো, যাতে করে কাফেররা ভাববে আমিই বিছানায় ঘুমিয়ে আছি। আর এ ভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্বাবন বা তল্লাশী থেকে নিরাপদ থাকব। হযরত আলী (আঃ) ঐ বিপদজনক মূহুর্তে রাসূল (সঃ)- এর প্রস্তাবটি মনে প্রাণে মেনে নিলেন।

১০. 'তাওয়ারীখ ও জাওয়ামিঈ হাদীস'।

১১. 'গাদীরে খুমের' হাদীসটি শীয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের সর্বজন স্বীকৃত একটি হাদীস। শীয়া ও আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে শতাধিক সাহাবীর দ্বারা এ হাদীসটি বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক পাঠকদের নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলো দেখার পরামর্শ দেওয়া হল। ('গায়াতুল মারাম' ৭৯ নং পৃষ্ঠা, 'আল গাদীর' এবং 'আবাকাতের' 'গাদীর খণ্ড দ্রষ্টব্য)

১২. 'তারিখে ইয়াকবী' - নাজাফীয় মুদ্রণ- ২য় খণ্ড, ১৩৭ ও ১৪০ নং পৃষ্ঠা। 'তারিখে আবিল ফিদা' ১ম খণ্ড ১৫৬ নং পৃষ্ঠা। 'সহীহ্ বখারী' ৪র্থ খণ্ড, ১০৭ নং পৃষ্ঠা। 'মুরুযুয যাহাব' ২য় খণ্ড, ৪৩৭ নং পৃষ্ঠা। 'ইবনে আবিল হাদীদ' ১ম খণ্ড, ১২৭- ১৬১ নং পৃষ্ঠা ১০- 'সাহীহ মুসলিম' ৫ম খণ্ড, ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। 'সহীহ বুখারী' ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ নং পৃষ্ঠা। 'মুরুযুয যাহাব', ২য় খণ্ড, ২৩ এবং ৪৩৭ নং পৃষ্ঠা। 'তারীখু আবিল ফিদা' প্রথম খণ্ড, ১২৭ ও ১৮৭ নং পৃষ্ঠা।

১৩. হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল্ আনসারী (রাঃ) বলেছেনঃ আমরা একবার মহানবী (সঃ)- এর সাথে ছিলাম। একটু দূরে হযরত আলী (আঃ)- কে দেখা গল। মহা নবী (সঃ) বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ এ ব্যক্তি (আলী) ও তার 'শীয়ারাই' ( অনুসারী) কেয়ামতের দিন নাজাত (মুক্তি) পাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াতটি { যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, তারই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।- সূরা আল বাইয়িনাহ, ৭নং আয়াত} নাযিল হলো, রাসূল (সঃ) হযরত আলী (আঃ)- কে বললেন, তুমি এবং তোমার শীয়ারাই (অনুসারী) হচ্ছে এই আয়াতের বাস্তব উদাহরণ যারা কেয়ামতের দিন সন্তষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তষ্ট থাকবেন। এ ছাড়াও এধরণের হাদীস নীচের গ্রন্থ গুলোতে উল্লেখিত হয়েছে : 'দুররুল মানসুর' ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭৯ নং পৃষ্ঠা। 'গায়াতুল মারাম' ৩২৬ নং পৃষ্ঠা।

১৪. মহানবী (সঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় জনাব উসামা বিন যায়েদকে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। আর অন্য সবাইকে তিনি উসামার নেতৃত্বে ঐ বাহিনীতে যোগ দিয়ে মদীনার বাইরে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্ত বেশকিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সঃ)- এর এই আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ঐসব বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে প্রথম খলিফা আবু বকর ও দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ বিষয়টি মহানবীকে (সঃ) ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল। [শারহু ইবনে আবিল হাদীদ, ( মিশরীয় মুদ্রণ) ১ম খণ্ড ৫৩ নং পৃষ্ঠা]

মহানবী (সঃ) শেষনিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে উপস্থিত সাহাবীদেরকে বললেনঃ কাগজ কলম নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্যে এমন কিছু লিখে রেখে যেতে চাই, যা তোমাদের জন্যে হেদায়ত স্বরূপ হবে এবং যার ফলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্ত দ্বিতীয় খলিফা ওমর এ কাজের বিরোধীতা করলেন এবং বললেনঃ রাসূল (সঃ)- এর রোগ খুব চরম মাত্রায় পৌছে গেছে। তিনি প্রলাপ বকছেন।(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড ৪৩৬ নং পৃষ্ঠা।

সহীহ্ বুখারী ৩য় খণ্ড, সহীহ্ মুসলিম ৫ম খণ্ড, আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ্ , ৫ম খণ্ড ২২৭ নং পৃষ্ঠা। ইবনে আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড ১৩৩ নং পৃষ্ঠা।)

ঠিক একই ধরণের ঘটনা প্রথম খলিফা আবু বকরের মৃত্যুর সময় ঘটে ছিল। তখন প্রথম খলিফা দ্বিতীয় খলিফা ওমরকে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে ওসিয়ত (উইল) লিখে যান। এমন কি 'ওসিয়াত' লিখার মাঝে তিনি সংজ্ঞাও হারিয়ে ফেলেন। কিন্ত তখন দ্বিতীয় খলিফা ওমর প্রতিবাদ করেননি। অথচ মহানবী (সঃ) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন এবং তার সাহাবীরাও সুস্থ ছিলেন। এ ছাড়া মহানবী (সঃ) ছিলেন সম্পূর্ণ মাসুম (নিস্পাপ)। (রওদাতুস্ সাফা' ২য় খণ্ড, ২৫০ নং পৃষ্ঠা)

১৫. শারহু ইবনে আবিল হাদীদ' ১ম খণ্ড, ৫৮ ও ১২৩ থেকে ১৩৫ নং পৃষ্ঠা। তারিখে ইয়াকুবী' ২য় খণ্ড, ১০২ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী' ২য় খণ্ড, ৪৪৫ থেকে ৪৬০ নং পৃষ্ঠা।

১৬. তারিখে ইয়াকুবী' ২য় খণ্ড ১০৩ থেকে ১০৬ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা' ১ম খণ্ড, ১৫৬ ও ১৬৬ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব' ২য় খণ্ড ৩০৭ নং ও ৩৫২ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদীদ' ১ম খণ্ড, ১৭ ও ১৩৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭. জনাব ওমর বিন হুরাইস, সা'দ বিন যাইদকে, বলেছেনঃ প্রথম খলিফা আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে কেউ বিরোধীতা করেছিল কি?' তিনি উত্তর দিলেনঃ শুধুমাত্র 'মুরতাদ' বা 'মুরতাদ'সম লোক ছাড়া আর কেউই এর বিরোধীতা করেনি।(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ৪৪৭ নং পৃষ্ঠা)

১৮. হাদীসে সাকালইনে বর্ণিত হয়েছে আমি আমানত স্বরূপ তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা ঐ দু'টি বস্তু কে দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাক তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে : 'কুরআন ও আমার পবিত্র আহলে বাইত (নবী বংশ), যা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত কখনই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন হবে না। বিখ্যাত এ হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে রাসূল (সা.) এর সাহাবীই প্রায় ৩৫ জন এবং অন্য আরো শতাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (গায়াতুল মারাম' ২১১ নং পৃষ্ঠা, ও তাবাকাত গ্রন্থের সাকালাইন হাদীস দ্রষ্টব্য।) রাসূল (সা.) বলেছেনঃ আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী (আ.) তার দরজা। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হবে, তাকে ঐ দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ ' ৭ম খণ্ড, ৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

১৯. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১০৫ থেকে ১৫০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০. পবিত্র কুরআন, রাসুল (সা.) এবং পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.) জ্ঞানার্জনের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহ প্রদান করতেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মহা নবী (সা.) বলেনঃ জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলমানের জন্যেই ফরজ। (বিহারুল আনোয়ার, ১ম খণ্ড, ১৭২ নং পৃষ্ঠা)

২১. আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ , ৭ম খণ্ড, ৩৬০ নং পৃষ্ঠা।

২২. তারিখে ইয়াকুবী, ১১১, ১২৬, ও ১২৯ নং পৃষ্ঠা।

২৩. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : পবিত্র কুরআন একটি সম্মানিত গ্রন্থ, যার সামনে ও পিছন থেকে কখনই মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।। - সূরা ফুসসিলাত, ৪১ও ৪২ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত নির্দেশ দেয়ার অধিকার আর কারও নেই । - সূরা আল ইউসুফ, ৬৭ নং আয়াত।

শরীয়ত বা ইসলামী বিধি বিধানের একমাত্র প্রতিভু আল্লাহই, যা নবীর মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্ব শেষ নবী। - সূরা আল আহযাব, ৪০ নং আয়াত।

এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবুয়্যত ও শরীয়তের (খোদায়ী বিধান) সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন ।

মহান আল্লাহ আরও বলেন : যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে নির্দেশনা প্রদান করে না, তারাই কাফের - সরা আল মায়েদা, ৪৪ নং আয়াত।

২৪. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১০ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৫৮ নং পৃষ্ঠা।

২৫. দুররূল মানসুর, ৩য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা। তারিখে ইয়াকুবী, ৩য় খণ্ড ৪৮ নং পৃষ্ঠা। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনেও আবশ্যকীয় বিধান সুস্পষ্ট। যেমনঃ খুমস সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত : জেনে রাখ! যা কিছু তোমরা লাভ কর তা থেকে এক পঞ্চামাংশ আল্লাহর, রাসূল ও রাসূলের আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য। (- সূরা আল আনফাল, ৪১ নং আয়াত।)

২৬. প্রথম খলিফা আবু বকর তার খেলাফত কালে প্রায় পাঁচ শত হাদীস সংগ্রহ করেন। উম্মুল মুমিনীন আয়শা বর্ণনা করেনঃ এক দিন ভোর পর্যন্ত সারা রাত আমার পিতাকে মানসিক অস্তিরতায় ভুগতে দেখেছি। সকালে তিনি আমাকে বললেনঃ রাসূল (সঃ)- এর হাদীসগুলো নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি আনীত ঐ হাদীসগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ২৩৭ নং পৃষ্ঠা। )

দ্বিতীয় খলিফা ওমর প্রতিটি শহরে লিখিতভাবে এই মর্মে নির্দেশনামা পাঠান যে, যার কাছেই রাসূল (সঃ)- এর হাদীস রয়েছে সে যেন অতি সত্তর তা পুড়িয়ে ফেলে। (- কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ২৩৭ নং পৃষ্ঠা।) মুহাম্মদ বিন আবু বকর বলেনঃ দ্বিতীয় খলিফা ওমরের যুগে রাসূল (সঃ)- এর অসংখ্য হাদীস সংগৃহীত হয়েছিল। ঐগুলো যখন তার কাছে আনা হল তখন তিনি ওগুলো সব পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৫ম খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।)

২৭. তারিখে ইবনে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, ও অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ।'

২৮. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার বিদায় হজ্জের সময় যেসব হাজীরা দূর- দূরান্ত থেকে মক্কায় প্রবেশ করত, তাদের জন্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন । যার উৎস ছিল পবিত্র কুরআনের এই আয়াত. 'আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে একইসাথে পালন করতে চাও .....'( - সূরা আল বাকারা - ১৯৬ নং আয়াত।) কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা তার খেলাফতের যুগে দূর থেকে আগত হাজীদের জন্যে হজ্জের ঐ আইনটি (হজ্জে তামাত্ত) বাতিল ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। 'মোতাহ বা সাময়িক বিবাহ্' যা আল্লাহর রাসূল (সঃ)- এর যুগে প্রচলিত ছিল, তাও দ্বিতীয় খলিফা ওমর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আর তিনি তার নির্দেশ অমান্যকারীদের পাথর মেরে হত্যার বিধান জারী করেন। একইভাবে হযরত রাসূল (সঃ)- এর যুগে, 'হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল' অর্থাৎ উত্তম কাজের (নামাজের) দিকে ধাবিত হও ব্যাক্যটি আযানের মধ্যে উচ্চারিত হত । কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা ওমর তার শাসন আমলে বলেন : এ ব্যাক্যটি জনগণকে জিহাদের অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে! তাই তিনি তার খেলাফতের যুগে আযানে ঐ ব্যাক্যটির উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। হযরত রাসূলের (সা.) যুগে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী মাত্র এক বৈঠকে একটির বেশী 'তালাক' প্রদান বৈধ বলে গৃহীত হত না। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা ওমর তার শাসন আমলে একই বৈঠকে তিনটি 'তালাক' প্রদান জায়েয বলে ঘোষণা দেন!! একই বৈঠকে তিন তালাক গৃহীত হওয়ার বৈধতা তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো, হাদীস গ্রন্থ ও শীয়া এবং সুন্নী মাযহাবের ফেকহ ও 'কালাম' শাস্ত্রের গ্রন্থে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

২৯. তারিখে ইয়াকুবী ২য় খণ্ড, ১৩১ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা।

৩০. আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৬ নং পৃষ্ঠা। আল- ইসাবাহ, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩১. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৬৮ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা।

৩২. তারীখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৯৮ নং পৃষ্ঠা।

৩৩. মিসরবাসীদের একটি দল তৃতীয় খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। খলিফা এতে বিপদের আশংকা করলেন। তিনি এ ব্যাপারে হযরত আলী (আঃ)- এর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন এবং কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচণা প্রকাশ করেন। তখন হযরত আলী (আঃ) মিসরবাসীদের উদ্দেশ্যেবলেনঃ তোমরাতো সত্যের বিজয়ের জন্যেই বিদ্রোহ করেছ। আর ওসমানও তার কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং তওবা করেছেন। তিনি বলেছেন : 'আমি আমার অতীত কৃতকর্ম থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। আগামী তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের দাবী- দাওয়া আমি বাস্তবায়ন করব এবং সকল অত্যাচারী প্রশাসকদের বরখাস্ত করব'। এর পর হযরত আলী (আঃ) তৃতীয় খলিফা ওসমানের পক্ষ হয়ে একটি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। অতঃপর বিদ্রোহীরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায় । কিন্তু বিদ্রোহীরা বাড়ী ফেরার পথে তৃতীয় খলিফা ওসমানের জনৈক ক্রীতদাসকে তারই উটে চড়ে মিশরের দিকে যেতে

দেখল। বিদ্রোহীরা সন্দিহান হয়ে ঐ ক্রীতদাসকে থামিয়ে তল্লাশী চালায়। ঘটনাক্রমে ঐ ক্রীতদাসের কাছে মিশরের প্রশাসককে লেখা তৃতীয় খলিফা ওসমানের একটি চিঠি তারা উদ্ধার করে। ঐ চিঠিতে এ ভাবেই লখা ছিলঃ ''আল্লাহর নামে শুরু করছি। যখন আব্দুর রহমান বিন উদাইস তোমার নিকট পৌছবে, তাকে ১০০টি চাবুক মারবে। তার চুল ও দাড়ি কামিয়ে ফেলবে এবং সুদীর্ঘ কারাবাসে নিবদ্ধ করবে। আর ওমর বিন আল-হামাক, সুদান বিন হামরান, এবং 'উরওয়া বিন নাবা'র ব্যাপারেও একই নির্দেশ জারী করবে। বিদ্রোহীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায় ঐ চিঠি সহ ওসমানের কাছে ফিরে এসে বললঃ 'আপনি আমাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। কিন্তু ওসমান ঐ চিঠির বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। জবাবে বিদ্রোহীরা বললঃ আপনার ক্রীতদাসই এই চিঠিটার বাহক। ওসমান বললেনঃ সে আমার বিনা অনুমতিতে এ কাজ করেছে! তারা বললঃ সে আপনার উটেই চড়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ 'সে আমার উট চুরি করেছে'! তারা বললোঃ 'চিঠিতো আপনার ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর লেখা'। তিনি বললেনঃ 'সে আমাকে অবহিত না করেই এ কাজ করেছে'! তারা বললো : 'তাহলে তো খেলাফতের কাজ পরিচালনা করার মত যোগ্যতা আদৌ আপনার নেই। শিগগীর ইস্তফা দিন। কারণ যদি প্রকৃতপক্ষে এ কাজ আপনার দ্বারাই ঘটে থাকে, তাহলে অবশ্যই খিয়ানত করেছেন। আর যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনার বিনা অনুমতিতে হয়ে থাকে তবে খেলাফতের ব্যাপারে আপনার অযোগ্যতা ও ব্যর্থতাই প্রমাণিত হল। সুতরাং ইস্তফা দিন, তা'নাহলে অত্যাচারী প্রশাসকদের বরখাস্ত করুন। এর উত্তরর ওসমান বললেনঃ 'আমাকে যদি তোমাদের কথা মেনে চলতে হয়, তাহলে তো তোমরাই আমার শাসনকর্তা। সেখানে আমি কোন জন? তৃতীয় খলিফার এধরণের উত্তরে বিদ্রোহীরা চরমভাবে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং বৈঠক ত্যাগ করে। (তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড ৪০২- ৪০৯ নং পৃষ্ঠা। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ১৫০- ১৫১ নং পৃষ্ঠা।)

৩৪. তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৭৭ নং পৃষ্ঠা।

৩৫. সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১৩ নং পৃষ্ঠা।

৩৬. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১১ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১২৯- ১৩২ নং পৃষ্ঠা।

৩৭. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড ১১৩ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ৯ নং পৃষ্ঠা। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, প্রথম খলিফা আবুবকর খেলাফতের 'বাইয়াত' প্রাপ্তির পর পরই হযরত আলী (আঃ)- এর নিকট থেকে তাঁর 'বাইয়াত' প্রাপ্তির জন্য লোক পাঠান। কিন্তু হযরত আলী (আঃ) উত্তর দিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, কেবল মাত্র নামায ছাড়া আর অন্য কোন কারণে বাড়ীর বাইরে যাব না, যাতে করে আমি কুরআন সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। ইতিহাসে আরও পাওয়া যায় যে, রাসূল (সঃ)- এর মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পর তিনি আবু বকরের 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন।

এ ঘটনাটি কুরআন সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হওয়ার একটি প্রমাণ স্বরূপ। অতঃপর হযরত আলী (আঃ) নিজ সংগৃহীত কুরআনকে উটের পিঠে করে জনগণের নিকট নিয়ে তাদেরকে দেখান। অথচ 'ইয়মামার' যুদ্ধের পর যখন কুরআন সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয় সেটা ছিল প্রথম খলিফা আবু বকরের খেলাফতের দ্বিতীয় বছর। এ সমস্ত ঘটনা ইসলামের ইতিহাসসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

৩৮. তারিখে ইয়াকুবি, ২য় খণ্ড, ১৫৪ নং পৃষ্ঠা।

৩৯. তারিখে ইয়াকুবি, ২য় খণ্ড, ১৫৫ নং পৃষ্ঠা। মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬৪ নং পৃষ্ঠা।

৪০. নাহজুল বালাগা, ১৫ নং বক্তৃতা।

৪১. মহানবী (সা.)- এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (আ.)- এর অনুসারী মুষ্টিমেয় কিছু সাহাবী খলিফার 'বাইয়াত' (আনুগত্য প্রকাশ) গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠির শীর্ষে ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত আবু যার (রা.), হযরত মিকদাদ (রা.) এবং হযরত আম্মার (রা.)। একই ভাবে স্বয়ং হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফতের সময়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কিছুলোক তার 'বাইয়াত' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এ সব বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোরপন্থীরা ছিলেন, জনাব সাইদ বিন আস, ওয়ালিদ বিন উকবা, মারওয়ান বিন হাকাম, ওমর বিন আস, বাসার বিন এরাদা, সামার নিজান্দা, মুগাইরা বিন শু'আবা ও আরো অনেকে। খেলাফতের যুগের এ দুই বিরোধী পক্ষের লোকদের সবার ব্যক্তিগত জীবনী এবং তাদের ঐতিহাসিক কার্যকলাপ যদি আমরা সুক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করি, তাহলে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সবাই ছিলেন হযরত রাসূল (সা.)- এর বিশেষ সাহাবী বৃন্দ। তাঁরা সংযম সাধানা, ইবাদত, আত্মত্যাগ, খোদা ভীরুতা, ইসলামী চেতনার দিক থেকে রাসূল (সা.) এর বিশেষ প্রিয় পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এদের সম্পর্কে বলেছেনঃ 'মহান আল্লাহ আমাকে অবগত করেছেন যে চারজন ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন। আর আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমিও যেন তাদেরকে ভালবাসি। সবাই ঐ ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞেস করলে, এর উত্তরে পর পর তিনবার তিনি ''প্রথম আলী (আ.) অতঃপর সালমান (রা.), আবু যার (রা.) ও মিকদাদের (রা.) নাম উচ্চারণ করেন। (সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা।) হযরত আয়শা (রা.) বলেনঃ হযরত রাসূল (সা.) বলেছেনঃ ''যে দু টি বিষয় আম্মারের (রা.) প্রতি উপস্থাপিত হবে, আম্মার (রা.) অবশ্যই ঐ দু ক্ষেত্রে সত্যকেই বেছে নেবে।'' (ইবনে মাজা ১ম খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা।)

মহানবী (সা.) বলেছেন : ''আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আবু যারের (রা.) চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী আর কেউ নেই।'' (ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, ৬৮ নং পৃষ্ঠা।) এদের কারও জীবন ইতিহাসেই শরীয়ত বিরোধী একটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরা কেউ অন্যায়ভাবে কোন রক্তপাত ঘটাননি। অন্যায়ভাবে কারও অধিকার

কখনও হরণ করেননি। কারও অর্থসম্পদ কখনও ছিনিয়ে নেননি। জনগণের মাঝে তারা কখনই দূর্নীতি ও পথ ভ্রষ্টতার প্রসারে লিপ্ত হননি। কিন্তু দ্বিতীয় বিরোধী পক্ষের ব্যক্তিদের জঘণ্য অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের অসংখ্য সাক্ষীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। ইতিহাসে অন্যায়ভাবে প্রচুর রক্তপাত তারা ঘটিয়েছেন মুসলমানদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করেছেন। এতসব লজ্জাকর কান্ড তারা ঘটিয়েছেন যে, তা গুনে শেষ করাও কঠিন। তাদের ঐ সব ঐতিহাসিক অপরাধের আদৌ কোন যুক্তিপূর্ণ অজুহাত খুজে পাওয়া যায় না। তাদের ঐ সব কৃত কর্মের মোকাবিলায় শুধুমাত্র এটা বলেই সান্তনা দেয়া হয় যে, তারা যত অপরাধই করুক না কেন, আল্লাহ তো তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। কুরআন বা সুন্নায় উল্লেখিত ইসলামী আইন অন্যদের জন্য, ওসব সাহাবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়!!

৪২. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬২ নং পৃষ্ঠা। নাহজুল বালাগা, ১২২ নং বক্তৃতা। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ১৮০ নং পৃষ্ঠা।

৪৩. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৭২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬৬ নং পৃষ্ঠা।

৪৪. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫২ নং পৃষ্ঠা।

৪৫. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬২ নং পৃষ্ঠা। নাহজুল বালাগা, ১২২ নং বক্তৃতা। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ১৮০ নং পৃষ্ঠা।

৪৬. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৭২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয্ যাহাব, ২য় খণ্ড, ৩৬৬ নং পৃষ্ঠা।

৪৭. তৃতীয় খলিফা যখন বিপ্লবীদের দ্বারা নিজ বাড়ী ঘেরাও অবস্থায় কাটাচ্ছিলেন। তখন এ অবস্থার নিরসন কল্পে সাহায্য চেয়ে তিনি মুয়াবিয়ার কাছে পত্র পাঠান। মুয়াবিয়া উক্ত পত্র পেয়ে প্রায় বারো হাজার সৈন্যের একটি সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন। তিনি ঐ সেনাবাহিনীসহ সিরিয়া থেকে মদীনার দিকে রওনা দেন। কিন্ত এর পরই তিনি আপন সেনাবাহিনীকে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সেনাবাহিনী ঐ অবস্থায় রেখে তিনি একাই মদীনায় গিয়ে তৃতীয় খলিফার সাথে সাক্ষাত করেন এবং খলিফাকে সাহায্যের জন্যে তার প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতী চুড়ান্তের পতিবেদন পেশ করেন। তৃতীয় খলিফা এর প্রত্যুত্তরে বলেন : 'তুই উদ্দেশ্য মুলকভাবে সেনাবাহিনীর অভিযান থামিয়ে রেখে এসেছিস, যাতে করে আমি নিহত হই আর আমার হত্যার প্রতিশোধের বাহানায় তুই বিদ্রোহ করার সুযোগ পাস। তাই নয় কি? ( তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৫২ নং পৃষ্ঠা। মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড ২৫ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী, ৪০২ নং পৃষ্ঠা।')

৪৮. মরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড ৪১৫ নং পৃষ্ঠা।

৪৯. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পুজায় দৃঢ় থাক।''( - সূরা আসু সায়াদ, ৬ নং আয়াত।)

আল্লাহ আরও বলেছেন : ''আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি পায় কিছুটা ঝুকে পড়তেন।''( - সূরা আল ইসূরা, ৭৪ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেছেন : ''তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।''( - সূরা আল কালাম, ৯ নং আয়াত।) উপরোক্ত আয়াতগুলোর হাদীস ভিত্তিক তাফসির দ্রষ্টব্য।

৫০. 'কিতাবুল গারার ওয়াদ দারার আমাদি ও মুতাফাররিকাতু জাওয়ামিউ হাদীস'।

৫১. 'মরুযুয যাহাব' ২য় খণ্ড, ৪৩১ নং পৃষ্ঠা। 'শারহু ইবনি আবিল হাদীদ' ১ম খণ্ড, ১৮১ নং পৃষ্ঠা।

৫২. আশবাহ ও নাযাইরু সুয়ুতী ফিন নাহু ২য় খণ্ড। শারহু ইবনি আবিল হাদীদ ১ম খণ্ড ৬ নং পৃষ্ঠা।

৫৩. নাহজুল বালাগা দ্রষ্টব্য।

৫৪. শারহু ইবনি আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, ৬-৯ নং পৃষ্ঠা। 'জঙ্গে জামালের' যুদ্ধে জৈনক বেদুইন ব্যক্তি হযরত আলী (আ.)-কে বললঃ হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনার দৃষ্টিতে আল্লাহ কি এক? পার্শ্বস্থ সবাই ঐ ব্যক্তিকে আক্রোমণ করে বলল : হে বেদুইন এ দূযোগমুহুর্তে তুমি কি ইমাম আলী (আ.)-এর অরাজক মানসিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করছো না! জ্ঞান চর্চার আর কোন সময় পেলে না?

ইমাম আলী (আ.) তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। কেননা, মৌলিক বিশ্বাস ও ইসলামী মতাদর্শের সংশোধন এবং ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষকে সুস্পষ্ট করার জন্যেই তো আজ আমি এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। অতঃপর তিনি ঐ বেদুইন আরব ব্যক্তির প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখা সহ উত্তর দিয়ে ছিলেন। (বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ৬৫ নং পৃষ্ঠা।)

৫৫. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯১ নং পৃষ্ঠা। এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫৬. শারহু ইবনে আবিল হাদীদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা। তারিখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ নং পৃষ্ঠা। তারিখে ইবনে আসির, ৩য় খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা।

৫৭. পূর্বোক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫৮. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯৩ নং পৃষ্ঠা।

৫৯. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২০২ নং পৃষ্ঠা।

৬০. ইয়াযিদ ছিল এক অলস ও চরম বিলাসী ব্যক্তি। সে ছিল লম্পট ও মদ্যপ। রেশমী বস্তুই ছিল তার পোশাক। কুকুর ও বানর ছিল তার নিত্য সংগী ও খেলার সাথী। তার নিত্য আসরগুলো ছিল মদ ও নাচ- গানে আনন্দ মুখর। তার বানরের নাম ছিল আবু কায়েস। ঐ বানরটিকে ইয়াযিদ সবসময় অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান পোশাক পরিয়ে

মদপানের আসরে নিয়ে আসত ! কখনো বা বানরটিকে নিজের ঘাড়ায় চড়িয়ে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় পাঠাতো। (তারীখু ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯৬ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড ৭৭ নং পৃষ্ঠা।)

৬১. মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৫ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড ১৮৩ নং পৃষ্ঠা।

৬২. আন নাসাঈহ আল কাফিয়াহ, ৭২ নং পৃষ্ঠা। আল ইহদাস নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৬৩. হাদীস জনাব আবুল হাসান আল- মাদায়েনী কিতাবুল ইহদাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (আ.)- এর সাথে চুক্তির পরের বছর মুয়াবিয়া তার জনৈক কর্মচারীর কাছে লিখিত এক নির্দেশে জানায় : ''যে ব্যক্তি ইমাম আলী (আ.) বা আহলে বাইতের মর্যাদা সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণনা করবে, তাকে হত্যা করার জন্যে আমি দায়ী নই।'' { কিতাবুল নাসাঈহুল কাফিয়াহ (মুহাম্মদ বিন আকিল), ( ১৩৮৬ হিজরী সনে নাজাফে মুদ্রিত) ৮৭ ও ১৯৪ নং পৃষ্ঠা।}

৬৪. আন নাসাঈহুল কাফিয়াহ, ৭২ - ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

৬৫. আন নাসাঈহুল কাফিয়াহ, ৫৮, ৬৪, ৭৭ ও ৭৮ নং পৃষ্ঠা।

৬৬. আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। (- সূরা আত্ তওবা, ১০০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।)

৬৭. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২১৬ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৯০ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৬৪ নং পৃষ্ঠা। আরও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

৬৮. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২৪৩ নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৯২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৭৮ নং পৃষ্ঠা।

৬৯. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২২৪নং পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১৯২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৮১ নং পৃষ্ঠা।

৭০. তারিখে ইয়াকুবী, ৩য় খণ্ড, ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

৭১. মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ২২৮ নং পৃষ্ঠা।

৭২. এ বইয়ের ইমাম পরিচিতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৩. 'মু'জামুল বুলদান' 'কোম' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৭৪. 'মরুযুয যাহাব' ৩য় খণ্ড, ২১৭- ২১৯ নং পৃষ্ঠা। 'তারিখে ইয়াকুবী' ৩য় খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা।

৭৫. 'বিহারুল আনোয়ার' ১২ নং খণ্ড।

৭৬. 'তারিখে ইয়াকুবী' ৩য় খণ্ড, ৮৪ নং পৃষ্ঠা।

৭৭. ‘তারিখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড ৭৯ নং পৃষ্ঠা। ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ১ম খণ্ড, ২০৮ নং পৃষ্ঠাও অন্যান্য ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৭৮. ‘তারিখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৮৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’ ৩য় খণ্ড, ২৬৮ নং পৃষ্ঠা।

৭৯. ‘তারিখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৮৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মুরুযুয যাহাব’ ৩য় খণ্ড, ২৭০ নং পৃষ্ঠা।

৮০. ‘তারিখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৯১- ৯৬ নং পৃষ্ঠা। ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ১ম খণ্ড, ২১২ নং পৃষ্ঠা।

৮১. ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ২য় খণ্ড, ৬ নং পৃষ্ঠা।

৮২. ‘তারিখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৯৮ নং পৃষ্ঠা। ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ২য় খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা।

৮৩. ‘বিহারুল আনোয়ার’ ১২ তম খণ্ড, ‘ইমাম জাফর সাদিকের (আ.) অবস্থা’ অধ্যায়।

৮৪. ‘বাগদাদ সেতুর কাহিনী’।

৮৫. ‘আগানী আবিল ফারাজ কিস’আতু আমিন’।

৮৬. তাওয়ারিখ

৮৭. রাজনৈতিক দিক থেকে আব্বাসীয় খলিফা মামুন ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তিনি অষ্টম ইমাম হযরত ইমাম রেজা (আ.)- কে তার খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধীকারী হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু এটা ছিল তার এক ধূর্ততাপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল। হযরত ইমাম রেজা (আ.) এটা ভাল করেই জানতেন। তাই তিনি বাহ্যতঃ খলিফা মামুনের প্রস্তাব মেনে নিলেও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কোন কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন। মামুনের ধূর্ততা সম্পর্কে ইমাম রেজা (আ.)- এর ধারণার সত্যতার প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল, যখন খলিফা মামুন হযরত ইমাম রেজা (আ.)- কে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন।

৮৮. তারিখে আবিল ফিদা ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য ।

৮৯.‘আল হিদারাতুল ইসলামিয়া ’ - ১ম খণ্ড, ৯৭ নং পৃষ্ঠা।

৯০. ‘মরুযুয যাহাব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৭৩ নং পৃষ্ঠা। ‘আল মিলাল ওয়ান নিহাল’ ১ম খণ্ড, ২৫৪ নং পৃষ্ঠা।

৯১. ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ২য় খণ্ড, ৬৩ নং পৃষ্ঠা, এবং ৩য় খণ্ড, ৫০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯২. ‘তাওরীখে কামেল’ ‘তারিখে রাওদাতুস সাফা, ও ‘তারিখে হাবিবুস সিয়ার দ্রষ্টব্য

৯৩. ‘তারিখে কামেল’ ‘তারিখে আবিল ফিদা, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৯৪. ‘তারিখে হাবিবুস সিয়ার’। ‘তারিখে আবিল ফিদা’ ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯৫. ‘রওদাতল জান্নাত ও রিয়াদুল উলামা (রাইহানাতুল আদাব )’ ২য় খণ্ড, ৩৬৫ নং পৃষ্ঠা।

৯৬. ‘কিতাবুর রাওদাত কিতাবুল মাজালিশ ও ওয়াফিয়াতুল আ’ঈয়ান’।

৯৭. ‘রওদাতুস সাফা’ ও ‘হাবিবুস সাইর’।

৯৮. ‘রওদাতুস সাফা’ ও ‘হাবিবুস সাইর’।

৯৯. উল্লেখ্য যে পাঠকদের হাতে উপস্থিত গ্রন্থটি প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে রচিত। ফলে শীয়াদের যে সংখ্যাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি অত্যন্ত প্রাচীন হিসাব। বর্তমান যুগে বিশ্বে শীয়াদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি। (- অনুবাদক)

১০০. উক্ত বিষয়টি শাহরিস্তানীর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল’ গ্রন্থ ও ‘আল - কামিল - ইবনে আসীর’ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

১০১. উক্ত বিষয়টি ইবনে আস্রিরর’ আল কামিল’ গ্রন্থ ও ‘রাওদাতুস সাফা হাবিবুস সেইর’ ‘আবিল ফিদা’ এবং শাহরিস্তানীর মিলাল ওয়াল নিহাল গ্রন্থ এবং কিছু অংশ ‘তারিখে আগাখানি’ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

১০২. ইসলামে আল্লাহর ইবাদত তার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসের একটি অংশ এবং তার উপর ভিত্তি করেই তা গঠিত হয়ে থাকে। এটাই উল্লেখিত কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ ।

১০৩. যথার্থ গুণকীর্তন সঠিক উপলদ্ধির উপরই নির্ভরশীল। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একমাত্র ‘মুখলাস’ (পরম নিষ্টবান ব্যক্তি) এবং আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউই সর্বস্রষ্টা অল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভে সক্ষম হবে না। আর মহান অল্লাহ্ অন্যদের দ্বারা বিশেষিত হওয়া থেকে পবিত্র।

১০৪. উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে তার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন ও সৎকাজ সম্পাদন ছাড়া আর কোন পথ নেই।

১০৫. উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মহান আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত ও আনুগত্য ‘নিশ্চিত বিশ্বাসের’ স্তরে উন্নত হওয়ারই ফসল।

১০৬. উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নিশ্চিত বিশ্বাসের (ইয়াকীন) স্তরে উপনীত হওয়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে পৃথিবী ও আকাশের প্রকৃত রূপের রহস্য অবলোকন।

১০৭. উক্ত আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজ সম্পাদনকারীদের স্থান হবে বেহেস্তের ‘ইল্লিয়্যিন’ (অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান) নামক স্থানে, যা একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই অবলোকন করবেন। এখানে ‘বই’ বলে লিখিত কোন পুস্তককে বুঝানো হয়নি। বরং তা দিয়ে উন্নত ও নৈকট্যের জগতই বুঝানো হয়েছে।

১০৮. এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)- এর একটি হাদীস আছে, যা শীয়া ও সুন্নী উভয় গোষ্ঠি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ ‘‘আমরা নবীরা মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাণ অনুযায়ী কথা বলে থাকি।’’ (বিহারুল আনোয়ার, ১ম খণ্ড, ৩৭ নং পৃষ্ঠা। উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা।)

১০৯. নাহজুল বালাগা, ২৩১ নং বক্তৃতা।

১১০. দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, ৬নং পৃষ্ঠা।

১১১. তাফসীরে সাফী, ৮ নং পৃষ্ঠা ও বিহারুল আনোয়ার ১৯ তম খণ্ড, ২৮ নং পৃষ্ঠা।

১১২. সূরা আশু শুয়ারা, ১২৭ নং আয়াত।

১১৩. সূরা আল হিজর, ৭৪ নং আয়াত।

১১৪. তাফসীরে সাফী, ৪নম্বর পৃঃ ।

১১৫. সাফিনাতুল বেহার তাফসীরে সাফী, ১৫ নম্বর পৃঃ এবং অন্যসব তাফসীর গ্রন্থেও মুরসাল স্বরূপ মহানবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কাফী, তাফসীরে আইয়াশী ও মা'আনী আল আখবার গ্রন্থেও এজাতীয় রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

১১৬. বিহারুল আনওয়ার, ১খণ্ড, ১১৭পঃ।

১১৭. হাদীসের দ্বারা কুরআনের আয়াত বাতিল হওয়ার বিষয়টি 'ইলমুল উসুলের'(ইসলামী আইন প্রণয়নে মূলনীতি শাস্ত্র) আলোচ্য বিষয়। আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আলেমদের একাংশের মতে হাদীসের দ্বারা কুরআনী আইন রহিত হওয়া সম্ভব। প্রথম খলিফাও যে, এ মতেরই অনুসারী ছিলেন, তা 'ফিদাকের' ব্যাপারে তার ভূমিকা তাই প্রমাণ করে।

১১৮. এ বিষয়ের সাক্ষী সরূপ, হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলেমগণের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থই যথেষ্ট। এ ছাড়া 'ইলমে রিজাল' (হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা শাস্ত্র) সংক্রান্ত গ্রন্থ গুলোতে হাদীসের অনেক বর্ণনাকারীকেই মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে।

১১৯. বিহারুল আনোয়ার, ১ম খণ্ড, ১৩৯ নং পৃষ্ঠা।

১২০. বিহারুল আনোয়ার, ১ম খণ্ড, ১১৭ নং পৃষ্ঠা।

১২১. 'খাবারে ওয়াহিদের' (অ-মুতাওয়াতির হাদীস) দলিল হওয়ার যোগ্যতার আলোচ্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এটা ইলমে উসুলের (ইসলামী আইন প্রণয়নের মূলনীতি শাস্ত্র) আলোচ্য বিষয়।

১২২. বিহারুল আনওয়ার ১খণ্ড ১৭২পঃ।

১২৩. এ বিষয়ে মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্র (এলমে উসুলের) এর ইজতিহাদ ও তাকলীদ অধ্যায় দেখুন।

১২৪. 'ওয়াফিয়াত ইবনে খালকান' ৭৮ নং পৃষ্ঠা, এবং 'আইয়ানুশ শীয়া' ১১তম খণ্ড ২৩১ নং পৃষ্ঠা।

১২৫. 'ওয়াফিয়াত ইবনে খালকান' ১৯০ নং পৃষ্ঠা, এবং 'আইয়ানুশ শীয়া।'

১২৬. 'ইতকান' (সুয়ুতী)।

১২৭. 'শারহু ইবনি আবিল হাদীদ' ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

১২৮. 'আখবারুল হুকমা' ও 'ওফিয়াত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

১২৯. হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেনঃ ইবাদত তিন প্রকার :

(ক) একদল লোক শাস্তির ভয়ে আল্লাহর উপাসনা করে। এটা ক্রীতদাসদের ইবাদত।

( খ) একদল লোক পুরুস্কারের আশায় আল্লাহর ইবাদত করে। এটা অর্থলোভী শ্রমিকের উপাসনা।

( গ) একদল লোক শুধুমাত্র আন্তরিকতা ও ভালবাসার কারণেই আল্লাহর ইবাদত করে। এটা হচ্ছে স্বাধীনচেতা ও মহৎ ব্যক্তিদের ইবাদত আর এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত(বিহারূল আনোয়ার, ১৫ তম খণ্ড ২০৮ নং পৃষ্ঠা।)

১৩০. তাযকিরাতুল আউলিয়া, তারাযিম, তারায়েক ও অন্যান্য তরীকত পন্থার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৩১. মহান আল্লাহ বলেছেন : ‘‘আর সন্ন্যাসবাদ তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রর্বতন করেছিল। আমি তো তাদেরকে ঐ বিধান দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথ ভাবে পালন করেনি। (- সূরা আল হাদীদ, ২৭ নং আয়াত।)

১৩২. হযরত ইমাম আলী (আ.) বলেছেনঃ সে তো আল্লাহ নয়, যে জ্ঞানের পরিসীমায় সীমাবদ্ধ। বরং তিনিই আল্লাহ, যিনি প্রমাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিজের প্রতি পথ নির্দেশনা প্রদান করেন’’।

১৩৩. হযরত আলী (আ.) বলেছেনঃ যে নিজেকে জানতে পারলো, নিশ্চয় সে আল্লাহকেও জানতে পারলো। (বিহারূল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা।)

১৩৪. হযরত ইমাম আলী (আ.) আরো বলেছেন যে, ‘‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে বেশী চেনে সে তার প্রতিপালককেও তোমাদের মধ্যে বেশী চেনে। (গুরারূল হিকাম, ২য় খণ্ড, ৬৫৫ নং পৃষ্ঠা।)

১৩৫. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উল্লিখিত দলিলটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন : তাদের রাসূলগণ বলেছিলেনঃ আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? ( - সূরা আল ইব্রাহীম, ১০ নং আয়াত।)

১৩৬. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ- মণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে ও চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য, দিবা রাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষন করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরূজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (- সূরা জাসিয়া, ৩ থেকে ৬ নম্বর আয়াত।)

১৩৭. ‘জংগে জামালের’ যুদ্ধের সময় জনৈক আরব বেদুঈন হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর কাছে এসে প্রশ্ন করল : ‘হে আমিরুল মু’মিনীন আপনি কি বলেন, আল্লাহ এক? আরব বেদুঈনের এ ধরণের অসময়োচিত প্রশ্নে উপস্থিত সকলে বিরক্ত হয়ে ঐ ব্যক্তিকে আক্রমন করে বলল : ‘হে বেদুঈন! তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা যে, আমিরুল মু ’মিনীন এখন এ যুদ্ধের ব্যাপারে কেমন মানসিক ব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছেন? হযরত আমিরুল

মু'মিনীন আলী (আ.) বললেনঃ ''ওকে ছেড়ে দাও! ঐ আরব বেদুঈন তাই চাচ্ছে, যা আমরা এই দলের (যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ) কাছে চাচ্ছি''। অতঃপর তিনি ঐ আরব বেদুঈনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ''এই যে বলা হয়ে থাকে 'আল্লাহ এক' এ কথার চারটি অর্থ রয়েছে। এ চারটি অর্থের মধ্যে দু'টো অর্থ শুদ্ধ নয়। এ ছাড়া বাকী দুটো অর্থই সঠিক। ঐ ভুল অর্থ দুটো হচ্ছে, এ রকম যেমনঃ কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ এক এবং এ ব্যাপারে (আল্লাহর একত্ববাদ) যদি সংখ্যার ভিত্তিতে কল্পনা করে। তাহলে এ ধরণের একত্ববাদের অর্থ সঠিক নয়। কারণঃ যার কোন দ্বিতীয় নেই, সেটা কখনোই সংখ্যামূলক হতে পারে না। তোমরা কি দেখছো না যে, খৃষ্টানরা আল্লাহর ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হবার কারণে কাফেরে পরিণত হয়েছে? এর (আল্লাহর একত্ববাদ) অন্য একটি ভুল অর্থ হচ্ছে এই যে, যেমন অনেকেই বলেঃ অমুক অনেক মানুষের মধ্যে একজন। অর্থাৎ অমুক রহিম, করিম খালেদের মতই একজন সমগোত্রীয় মানুষ মাত্র। (অথবা অমুক তার সমগোত্রীয়দেরই একজন।) আল্লাহর ব্যাপারে এ ধরণের অর্থও কল্পনা করা ভুল । কারণ এটা এক ধরণের সাদৃশ্য মূলক কল্পনা। আর আল্লাহ যে কোন সাদৃশ্য মূলক বিষয় থেকে পবিত্র। আর আল্লাহর একত্ববাদের দু'টো সঠিক অর্থের একটি হচ্ছে, যেমন কেউ বলেঃ আল্লাহ এক। অর্থাৎ এ সৃষ্টিজগতে তার সাদৃশ্য কিছুই নেই। আল্লাহ প্রকৃতই এ রকম। অন্য অর্থটি হচ্ছে এই যে, কেউ বলে : আল্লাহ এক। অর্থাৎ তাঁর কোন আধিক্য সম্ভব নয়। তিনি বিভাজ্যও নন বাস্তবে যেমন সম্ভব নয়, চিন্তাজগতে কল্পনা করাও তমনি সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহর স্বরূপ। (বিহারুল আনোয়ার, ৬৫ নং পৃষ্ঠা।)

হযরত ইমাম আলী (আ.) আরো বলেছেনঃ আল্লাহ কে এক হিসেবে জানার অর্থই তাঁর পরিচিতি লাভ করা। (বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা। )

অর্থাৎ মহান আল্লাহর অসীম ও অবিনশ্বর অস্তিত্বের প্রমাণই তাঁর একত্ববাদ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট কারণঃ অসীম অস্তিত্বের জন্যে দ্বিতীয়ের কল্পনা আদৌ সম্ভব নয়।

১৩৮. ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.) বলেন : মহান আল্লাহ স্থির অস্তিত্বের অধিকারী। তিনি নিজেই তাঁর জ্ঞান। তাঁর জন্য জ্ঞাত বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি নিজেই তার শ্রবণ ক্ষমতা । তার জন্য শ্রুত বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি নিজেই তার দর্শন ক্ষমতা । তার জন্য দৃষ্ট বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই । তিনি নিজেই তার শক্তির পরিচায়ক তাঁর জন্য প্রয়োগকৃত শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। (বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ১২৫ নং পৃষ্ঠা।)

এ বিষয়ে আহলে বাইত গণের (আ.) অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এ ব্যাপারে 'নাহজুল বালাগা' 'তাওহীদে আইউন' ও 'বিহারুল আনোয়ার, ( ২য় খণ্ড গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য)

১৩৯. অষ্টম ইমাম, ইমাম রেজা (আ.) বলেনঃ মহা প্রভু এমন এক জাতি, যার সাথে কখনো আধারের সংমিশ্রন ঘটতে পারে না। তিনি এমন এক জ্ঞানের অধিকারী, যেখানে অজ্ঞতার কোন উপস্থিতিই কল্পনা করা

আদৌ সম্ভব নয়। তিনি এমন এক জীবনের অধিকারী, যেখানে মৃত্যুর কোন ছোয়া পড়তে পারে না। (বিহারুল আনোয়ার ২য় খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা।) অষ্টম ইমাম (আ.) বলেনঃ প্রভুর গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষেরা তিনটি মতে বিভক্ত।

১৪০. (ক) অনেকে প্রভুর গুণাবলী প্রমাণ করতে অন্যদের সাথে ঐ গুণাবলীর তুলনা করেন।

(খ) আবার অনেকে গুণাবলী সমূহকে অস্বীকার করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি সঠিক, যা অন্য সকল প্রকারের গুনাবলীর সাথে তুলনা না করেই পভুর গুণাবলী প্রমাণ করে ।

১৪১. সূরা আশ শুরা, ১১ নং আয়াত।

১৪২. ষষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেনঃ মহান আল্লাহকে সময়, স্থান, গতি, স্থানান্তর অথবা স্থিরতার ন্যায় গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ, তিনিই স্থান, কাল, গতি, স্থানান্তর ও স্থিরতার স্রষ্টা। (বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ৯৬ নং পৃষ্ঠা।)

১৪৩. ষষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ সর্বদাই জ্ঞানী, কিন্তু এ জন্যে জ্ঞাত বস্তুর প্রয়োজন তার নেই। তিনি সর্বদাই ক্ষমতাশীল, কিন্তু এ জন্যে কুক্ষিগত অস্তিত্বের প্রয়োজন তার নেই। বর্ণনাকারী (রাবী) জিজ্ঞেস করেনঃ তিনি কি 'কথোপকথনকারী'ও ? হযরত জাফর সাদিক (আ.) বললেনঃ কথা ধ্বংসশীল। আল্লাহ ছিলেন। কিন্তু 'কথা' ছিল না। অতঃপর তিনি 'কথা' সৃষ্টি করেন। (বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, ১৪৭ নং পৃষ্ঠা। )

অষ্টম ইমাম হযরত রেজা (আ.) বলেছেনঃ মানুষের ক্ষেত্রে 'ইচ্ছা' তার অন্তরের একটি অবস্থা। তা তার ঐ অবস্থা অনুযায়ী কাজ সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'ইচ্ছা' আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টি বা বাস্তবায়নের নামান্তর মাত্র। কেননা, আমাদের মত চিন্তা ধারণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (বিহারুল আনোয়ার, ৩য় খণ্ড ১৪৪ নং পৃষ্ঠা।)

১৪৪. ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.) বলেনঃ মহান আল্লাহ যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তা নির্ধারণ করেন। নির্ধারণের পর তিনি তা মানুষের জন্যে ভাগ্যে পরিণত করেন। এরপর তা তিনি বাস্তবায়ন করেন। (বিহারুল আনোয়ার , ৩য় খণ্ড, ৩৪ নং পৃষ্ঠা)

১৪৫. হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেনঃ মহান আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু । তাই তাদেরকে পাপ কাজে লিপ্ত হতে তিনি কখনোই বাধ্য করেন না, যাতে তারা পাপ জনিত কঠিন শাস্তিভোগ না করে । মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা এর চাইতে অনেক উর্দ্ধে যে, তিনি কিছু ইচ্ছা করবেন, আর তা বাস্তবায়িত হবে না। (বিহারুল আনোয়ার, ৩য় খণ্ড, ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠা।)

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ.) আরও বলেন : মানুষের ক্ষমতার বাইরে কোন দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে আল্লাহর উদারতা অনেক বেশী। মহান আল্লাহ এতই পরাক্রমশালী যে, তার রাজত্বে তাঁর ইচ্ছে বিরোধী কোন কিছু ঘটার বিষয়টিই কল্পনাতীত। (বিহারুল আনোয়ার, ৩য় খণ্ড, ১৫ নং পৃষ্ঠা।)

১৪৬. এ জগতের সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষটিও তার প্রকৃতিজাত স্বভাবের দ্বারা একজন আইন প্রণেতার প্রয়োজন অনুভব করে । যার ফলে এ বিশ্বের সকল প্রাণীই নির্বিঘ্নে শান্তি ও সৌহার্দের মাঝে নিরাপদ জীবন - যাপন করতে পারে । দর্শনের দৃষ্টিতে চাওয়া, আগ্রহ ও ইচ্ছা পোষণ করা এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা অতিরিক্ত ও পরস্পর সম্পর্ক মূলক । অর্থাৎ এধরণের বৈশিষ্ট্য প্রান্তের সাথে সম্পর্কিত । এক কথায় ঐ বৈশিষ্ট্য দু'টি প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত । যেমনঃ ঐ বৈশিষ্ট্য (কামনা), কামনাকারী ও কাংখিতবস্তু, এ দু'প্রান্ত দ্বয়ের মাঝে বিদ্যমান । তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে কাংখিতবস্তু অর্জন যদি অসম্ভব হয়, তাহলে তার আকাংখা অর্থহীন হয়ে পড়ে । অবশেষে সবাই এ ধরণের বিষয়ের (আদর্শ আইন) অভাব বা ত্রুটি উপলব্ধি করে । আর পূর্ণতাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন যদি অসম্ভবই হত, তাহলে অপূর্ণতা বা ত্রুটির অস্তিত্বও অর্থহীন হয়ে পড়ত ।

১৪৭. যেমন : একজন ঠিকাদার তার শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করতলগত করে । একজন নেতা তার অনুসারীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে । ভাড়াটে অর্থের বিনিময়ে মালিকের সত্ত্ব ভোগ করার মাধ্যমে তার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে । একজন ক্রেতা বিক্রেতার স্বত্বের ওপর অধিকার লাভ করে । এ ভাবে মানুষ বিভিন্ন ভাবে পরস্পরের উপর প্রভুত্ব বা শ্বাসন ক্ষমতা বিস্তার করে । (- সূরা আয়ু যুখরূফ, ৩২ নং আয়াত ।)

১৪৮. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : তারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার (কুরআনের) সদৃশ্য কোন রচনা উপস্থাপন করুক না! (- সূরা আত তুর, ৩৪ নং আয়াত ।)

১৪৯. তারা কি এটা বলে, 'সে এটা (কুরআন) নিজে রচনা করেছে? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদীই হও তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর ।' ( - সূরা আল হুদ, ১৩ নং আয়াত ।)

১৫০. মহান আল্লাহ বলেছেন : আর মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও! তোমরা নিয়ে এসো (- কুরআনের সূরার মতই) একটিই সূরা । (- সূরা আল ইউনুস, ৩৮ নং আয়াত ।)

১৫১. জনৈক আরব বক্তা বর্ণনা করেছেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : (ওয়ালিদ অন্য চিন্তা ভাবনার পর সত্যকে অবজ্ঞা করে) বলেঃ এর পর বলেছে : এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এতো মানুষের উক্তি নয় । (- সূরা আল্ মুদ্দাসসির, ২৪ ও ২৫ নং আয়াত ।)

১৫২. মহান আল্লাহ তার নবী (সা.)- এর ভাষায় বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে একটা বয়স অতিবাহিত করেছি, তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? ( - সূরা আল ইউনুস, ১৬ নং আয়াত ।)

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন : আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণহস্তে কোন কিতাব লিখেননি। (- সূরা আনকাবুত, ৪৮ নং আয়াত।)

মহান আল্লাহ বলেছেন : এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতির্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (- সূরা আল বাকারা, ২৩ নং আয়াত।)

১৫৩. মহান আল্লাহ বলেছেন : এরা কি লক্ষ্য করে না, কুরআনের প্রতি ? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (- সূরা আন নিসা, ৮২ নং আয়াত।)

১৫৪. বিহারুল আনোয়ার, ৩য় খণ্ড, ১৬১ নং পৃষ্ঠা।

১৫৫. বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, বারযাখ অধ্যায়।

১৫৬. বিহারুল আনোয়ার, ২য় খণ্ড, বারযাখ অধ্যায়।

১৫৭. উপরোক্ত বিষয়টি নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২৬- ৬১ নং পৃষ্ঠা। সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২৩- ২৭১ পৃষ্ঠা। তারিখে আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড ১২৬ নং পৃষ্ঠা। গায়াতুল মারাম, ৬৬৪ নং পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

১৫৮। রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ইমাম আলী (আ.) এর অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াত উল্লেখ যোগ্য। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন : তোমাদের অভিভাবক (পথ নির্দেশক) তো আল্লাহ ও তার রাসূল এবং মু'মিন বান্দাদের মধ্যে যে নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং রুক অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। (সূরা মায়েদা, ৫৫ নং আয়াত।) সুন্নী ও শীয়া উভয় তাফসীরকারকগণই এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর মর্যাদায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখা স্বরূপ শীয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের বর্ণিত অসংখ্য হাদীসও এ কথারই প্রমাণ বহন করে। এ বিষয়ে রাসূল (সা.) এর সাহাবী হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বলেনঃ একদিন মহানবীর পিছনে যাহরের নামায পড়ছিলাম। এ সময়ে জনৈক ভিক্ষুক সেখানে উপস্থিত হয়ে সবার কাছে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু কেউই ঐ ভিক্ষুককে সাহায্য করল না। তখন ঐ ভিক্ষুক তার হাত দু'টা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললোঃ 'হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থেকো, রাসূল (সা.)- এর এই মসজিদে কেউই আমাকে সাহায্য করলনা। ঐ সময় হযরত ইমাম আলী (আ.) নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি তখন রুকুরত অবস্থায় ছিলেন। হযরত আলী (আ.) তখন রুকু অবস্থাতেই হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঐ ভিক্ষুকের প্রতি ইশারা করলেন। ঐ ভিক্ষুকও ইমাম আলী (আ.) এর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার হাতের আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিল। এ দৃশ্য দেখে মহানবী (সা.) আকাশের দিকে মাথা উচিয়ে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন :' হে আল্লাহ আমার ভাই হযরত মুসা (আ.) তোমাকে বলেছিল আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে

দাও এবং আমার কাজগুলোকে করে দাও সহজ । আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে সবাই আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে । আর আমার ভাই হারূনকে আমার প্রতিনিধি ও সহযোগীতে পরিণত কর । ’ তখন তোমার ঐশীবাণী অবতীর্ণ হলঃ ‘তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে আমরা শক্তিশালী করব এবং তোমাকে প্রভাব বিস্তারের শক্তি দান করব’ । সুতরাং, হে আল্লাহ ! আমিও তো তোমারই নবী । তাই আমাকেও হৃদয়ের প্রশস্ততা দান কর । আমার কাজগুলোকেও করে দাও সহজ । আর আলীকে আমার প্রতিনিধি ও সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত কর । হযরত আবু যার (রা.) বললেনঃ রাসূল (সা.)- এর কথা শেষ না হতেই পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি অবতির্ণ হল । [যাখাইরূল উকবা (তাবারী) ১৬ নং পৃষ্ঠা, ১৩৫৬ হিজরী মিশরীয় সংস্করণ ।]

একই হাদীস সামান্য কিছু শব্দিক পার্থক্য সহ নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে । (দুররূল মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৯৩ নং পৃষ্ঠা । গায়াতুল মারাম- বাহরানী, এ বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় ।)

আলোচ্য আয়াতের অবতরণেরর ইতিহাস বর্ণনায় সুন্নী সূত্রে বর্ণিত ২৪টি হাদীস এবং শীয়া সূত্রে বর্ণিত ১৯টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন : আজ কাফেররা তোমাদের ‘দ্বীন’ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে । অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর । আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন’কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম । তোমাদের প্রতি আমার অবদান (নিয়ামত) সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম । (সূরা মায়েদা ৩ নং আয়াত । )

বাহ্যত উক্ত আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কাফেররা এই ভেবে আশান্বিত ছিল যে, শীঘ্রই এমন একদিন আসবে, যেদিন ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে । কিন্তু মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে চিরদিনের জন্যে কাফেরদেরকে নিরাশ করলেন । আর এটাই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও তার ভিত্তিকে শক্তিশালী হওয়ার কারণ ঘটিয়েছিল । এটা সাধারণ কোন ইসলামী নির্দেশজারীর মত স্বাভাবিক কোন ঘটনা ছিল না । বরং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, যার উপর ইসলামের অস্তিত্ব টিকে থাকা নির্ভরশীল ছিল । এই সূরার শেষের অবতীর্ণ আয়াতও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন নয় ।

মহান আল্লাহ বলেছেন : হে রাসূল! পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতির্ণ হয়েছে । আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তার (প্রতিপালকের) রিসালাতের কিছুই পৌছালেন না । আল্লাহ আপনাকে অত্যাচারীদের (অনিষ্ট) হতে রক্ষা করবেন । (সূরা মায়েদা, ৬৭ নং আয়াত ।)

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, মহান আল্লাহ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন, যা সাধিত না হলে ইসলামের মূলভিত্তি ও বিশ্বনবী (সা.) এর এই মহান মিশন বা রিসালাত চরম বিপদের সম্মুখীন হবে । তাই আল্লাহ এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) কে নির্দেশ দেন । কিন্তু বিশ্বনবী (সা.) ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সাধিত হওয়ার ব্যাপারে জনগণের বিরোধীতা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা করলেন । এমতাবস্থায় ঐ

গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অতিদ্রুত সমাধা করার জন্যে জোর তাগিদ সম্বলিত নির্দেশ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী (সা.) এর প্রতি জারী করা হয় । মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (সা.)- এর প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধানের ব্যাপারে অবশ্যই অবহেলা কর না এবং ঐ ব্যাপারে কাউকে ভয়ও কর না । এ বিষয়টি অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান ছিল না । কেননা এক বা একাধিক ইসলামী বিধান প্রচারের গুরুত্ব এত বেশী হতে পারে না যে, তার অভাবে ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে । আর বিশ্বনবী (সা.) - ও কোন ঐশী বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে আদৌ ভীত ছিলেন না ।

উপরোক্ত দলিল প্রমাণাদি এটাই নির্দেশ করে যে, আলোচ্য আয়াতটি 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে হযরত ইমাম আলী ইবনে আবি তালিবের (আ.) বিলায়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে । অসংখ্য সুন্নী ও শীয়া তাফসীরকারকগণই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন : বিশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.) এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এরপর বিশ্বনবী (সা.) ইমাম আলী (আ.) এর হাত দু'টা উপরদিকে উত্তোলন করেন । এমনকি বিশ্বনবী (সা.) হযরত আলী (আ.) এর হাত এমনভাবে উত্তোলন করেছেন যে, মহানবী (সা.) এর বগলের শুভ্র অংশ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল । এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন'কে পূর্ণঙ্গ করে দিলাম । তোমাদের প্রতি আমার অবদান (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম । ( সূরা মায়েদা, ৩ নং আয়াত । )

উক্ত আয়াতটি অবতির্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) বললেন : 'আল্লাহ্ আকবর' কারণ, বিশ্বনবী (সা.) এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর 'বিলায়াত' ( কর্তৃত্ব) প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে আজ আল্লাহর নেয়ামত ও সন্তুষ্টি এবং ইসলামের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটলো । অতঃপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বললেনঃ ''আমি যাদের অভিভাবক, আজ থেকে আলীও তাদের অভিভাবক । হে আল্লাহ! আলীর বন্ধুর প্রতি বন্ধু বৎসল হও ও আলীর শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণ কর । যে তাকে (আলীকে) সাহায্য করবে, তুমিও তাকে সাহায্য কর । আর যে আলীকে ত্যাগ করবে, তুমিও তাকে ত্যাগ কর ।''

জনাব আল্লামা বাহরানী তার 'গায়াতুল মারাম' নামক গ্রন্থের ৩৩৬ নং পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের অবতরণের কারণ প্রসঙ্গে সুন্নী সূত্রে বর্ণিত ৬টি হাদীস এবং শীয়া সূত্রে বর্ণিত ১৫টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ।

সারাংশ : ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার স্বার্থে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে কখনোই কুন্ঠাবোধ করেনি । কিন্তু এত কিছুর পরও তারা ইসলামের সামান্য

পরিমাণ ক্ষতি করতেও সক্ষম হয়নি । ফলে ব্যর্থ হয়ে তারা সবদিক থেকেই নিরাশ হয়ে পড়ে । কিন্তু এর পরও শুধু মাত্র একটি বিষয়ে তাদের মনে আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছিল । আর সেই আশার সর্বশেষ বস্তুটি ছিল এই যে,

তারা ভেবে ছিল, যেহেতু মহানবী (সা.)-ই ইসলামের রক্ষক ও প্রহরী, তাই তার মৃত্যুর পর ইসলাম অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে। তখন ইসলাম অতি সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনা তাদের হৃদয়ে লুকানো আশার শেষ প্রদীপটাও নিভিয়ে দিল। কারণ, 'গাদীরে খুমে' মহানবী (সা.), হযরত ইমাম আলী (আ.) কে তাঁর পরবর্তী দায়িত্বশীল ও ইসলামের অভিভাবক হিসেবে জনসমক্ষে ঘোষণা প্রদান করেন। এমনকি বিশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পর ইসলামের এই দায়িত্বভার মহানবী (সা.)- এর পবিত্র বংশ তথা হযরত আলী (আ.) এর ভবিষতে বংশধরদের জন্যে নির্ধারণ করেন। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে হযরত আল্লামা তাবাতাবাঈ রচিত 'তাফসীর আল মিজান' নামক কুরআনের তাফসীরের ৫ম খণ্ডের ১৭৭ থেকে ২১৪ নং পৃষ্ঠা এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫০ থেকে ৫৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

**হাদীসে গাদীরে খুম**

বিশ্বনবী (সা.) বিদায় হজ্জ শেষে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে 'গাদীরে খুম' নামক একটি স্থানে পৌছানোর পর পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৬৭ নম্বর আয়াতটি অবতির্ণ হয়। মহানবী (সা.) তাঁর যাত্রা থামিয়ে দিলেন। অত:পর তার আগে চলে যাওয়া এবং পেছনে আগত সকল মুসলমানদেরকে তার কাছে সমবেত হবার আহবান করেন। সবাই মহানবী (সা.)এর কাছে সমবেত হবার পর তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এক মহা মূল্যবান ও ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। এটাই সেই ঐতিহাসিক 'গাদীরে খুমের' ভাষণ হিসেবে পরিচিত। এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। হযরত বুরআ (রা.) বলেনঃ বিদায় হজ্জের সময় আমি মহানবীর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌছলাম, তখন মহানবী (সা.) আমাদেরকে ঐ স্থানটি পরিস্কার করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে তার ডান দিকে এনে তার হাত দু'টি জনসমক্ষে উপর দিকে উচিয়ে ধরলেন। তারপর তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদের অভিভাবক (কর্তা) নই? সবাই উত্তর দিল, আমরা সবাই আপনারই অধীন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি যার অভিভাবক ও কর্তা আলীও তার অভিভাবক ও কর্তা হবে। হে আল্লাহ্! আলীর বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব কর এবং আলীর শত্রুর সাথে শত্রুতা কর। এরপর দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব হযরত আলী (আ.) কে সম্বোধন করে বললেন : 'তোমার এই অমূল্য পদমর্যাদা আরও উন্নত হোক! কেননা তুমি আমার এবং সকল মু'মিনদের অভিভাবক হয়েছ।' - আল্ বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম খণ্ড, ২০৮ নং পৃষ্ঠা, এবং ৭ম খণ্ড, ৩৪৬ নং পৃষ্ঠা। যাখাইরূল উকবা, (তাবারী), ১৩৫৬ হিজরী মিশরীয় সংস্করণ, ৬৭ নং পৃষ্ঠা। ফুসুলুল মুহিম্মাহু, (ইবনে সাব্বাগ), ২য় খণ্ড, ২৩ নং পৃষ্ঠা। খাসাইসুন - নাসাঈ, ১৩৫৯ হিজরীর নাজাফীয় সংস্করণ, ৩১ নং পৃষ্ঠা।

জনাব আল্লামা বাহরানী (রহঃ) তার 'গায়াতুল মারাম' নামক গ্রন্থে সুন্নী সূত্রে বর্ণিত ৮৯ টি হাদীস এবং শীয়া সূত্রে বর্ণিত ৪৩টি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ।

**সাফিনাতুন নুহের হাদীস**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হযরত নুহ (আ.) এর নৌকার মত । যারা নৌকায় আরহণ করল, তারাই রক্ষা পল । আর যারা তা করল না তারা সবাই ডুবে মরল' । ('যাখাইরুল উকবা' ২০ নং পৃষ্ঠা । 'আস সাওয়াইকুল মুহরিকাহ (ইবনে হাজার)' মিশরীয় সংস্করণ, ৮৪ ও ১৫০ নং পৃষ্ঠা । 'তারীখুল খুলাফাহ (জালালুদ্দীন আস সূয়ুতী)' ৩০৭ নং পৃষ্ঠা । 'নরুল আবসার (শাবালঞ্জি)' মিশরীয় সংস্করণ, ১১৪ নং পৃষ্ঠা ।)

জনাব আল্লামা বাহরানী, তার 'গায়াতুল মারাম' নামক গ্রন্থের ২৩৭ নং পৃষ্ঠায় সুন্নীদের ১১টি সূত্র থেকে এবং শীয়াদের ৭টি সূত্র থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

**হাদীসে সাকালাইন**

হযরত যাইদ বিন আরকাম (রা.) বলেন : মহানবী (সা.) বলেছেনঃ মনে হচ্ছে আল্লাহ যেন আমাকে তাঁর দিকেই আহবান জানাচ্ছেন, অবশ্যই আমাকে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে । তবে আমি তোমাদের মাঝে অত্যন্ত ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি : তা হচ্ছে আল্লাহর এই ঐশী গ্রন্থ (কুরআন) এবং আমার পবিত্র আহলে বাইত । তাদের সাথে কেমন ব্যাবহার করবে, সে ব্যাপারে সতর্ক থেকো । এ দু'টা (পবিত্র কুরআন ও আহলে বাইত) জিনিষ 'হাউজে কাউসারে' ( কেয়ামতের দিন) আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কখনোই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না । (আল বিদাহয়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্ ৫ম খণ্ড, ২০৯ নং পৃষ্ঠা । যাখাইরুল উকবা, ( তাবারী) ১৬ নং পৃষ্ঠা । ফুসুলুল মুহিম্মাহু , ২২নং পৃষ্ঠা । খাসইসুন্ - নাসাঈ, ৩০ নং পৃষ্ঠা । আস্ সাওয়াইকুল মুহরিকাহ , ১৪৭ নং পৃষ্ঠা ।)

গায়াতুল মারাম' গ্রন্থে ' আল্লামা বাহরানী ৩৯টি সুন্নী সূত্রে এবং ৮২টি শীয়া সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 'হাদীসে সাকালাইন' একটি বিখ্যাত ও সর্বজনস্বীকৃত এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত । উক্ত হাদীসটি অসংখ্য সূত্রে এবং বিভিন্ন ধরণের বর্ণনায় (একই অর্থে ) বর্ণিত হয়েছে । উক্ত হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে সুন্নী ও শীয়া, উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকৃতি প্রদান করেছে । এ ব্যাপারে তারা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে একমত । আলোচ্য হাদীসটি এবং এ ধরণের হাদীস থেকে বেশ কিছু বিষয় আমাদের কাছে প্রমাণিত হয় । তা হল :

১. পবিত্র কুরআন যেভাবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মানব জাতির মাঝে টিকে থাকবে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র আহলে বাইত ও তার পাশাপাশি মানব জাতির মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবেন । অর্থাৎ এ বিশ্বের কোন যুগই ইমাম বা প্রকৃত নেতাবিহীন অবস্থায় থাকবে না ।

২. বিশ্বনবী (সা.) মানব জাতির কাছে এই দু'টো অমূল্য আমানত গচ্ছিত রাখার মাধ্যমে তাদের সর্ব প্রকার ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক প্রয়োজন মেটানো এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে গেছেন । মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণকে (আ.) সকল প্রকার জ্ঞানের অমূল্য রত্ন ভান্ডার হিসেবে মুসলমানদের মাঝে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন । মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) যে কোন কথা ও কাজকেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন ।

৩. পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতকে অবশ্যই পরস্পর থেকে পৃথক করা যাবে না । মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের পবিত্র জ্ঞানধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের উপদেশ ও হেদায়েতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার কোন মুসলমানেরই নেই ।

৪. মানুষ যদি পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) আনুগত্য করে এবং তাদের কথা মেনে চলে, তাহলে কখনোই তারা পথভ্রষ্ট হবে না । কেননা, তারা সর্বদাই সত্যের সাথে অবস্থান করছেন ।

৫. মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার ধর্মীয় ও অন্য সকল জ্ঞানই পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) কাছে রয়েছে । তাই যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, এবং তারা অবশ্যই জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করবে । অর্থাৎ, পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.) সর্ব প্রকার ত্রুটি- বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, পবিত্র আহলে বাইত বলতে মহানবী (সা.) এর পরিবারের সকল আত্মীয়বর্গ ও বংশধরকেই বোঝায় না । বরং পবিত্র আহলে বাইত বলতে নবী বংশের বিশেষ ব্যক্তিবর্গকেই বোঝানো হয়েছে । ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং সর্বপ্রকার পাপ ও ভুল থেকে তাদের অস্তিত্ব মুক্ত ও পবিত্র হওয়াই ঐ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্য । যাতে করে তারা প্রকৃত নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী হতে পারেন । ঐ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন : হযরত ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) এবং তার বংশের অন্য এগারোজন সন্তান । তাঁরা প্রত্যেকেই একের পর এক ইমাম হিসেবে মনোনীত হয়েছেন । একই ব্যাখা মহানবী (আ.) এর অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায় ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ আমি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞাস করলাম যে, আপনার যেসব আত্মীয়কে ভালবাসা আমাদের জন্যে ওয়াজিব, তারা কারা? মহানবী (সা.) বললেনঃ 'তারা হলেন আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হোসাইন । (- ইয়ানাবী- উল- মুয়াদ্দাহ , ৩১১ নং পৃষ্ঠা ।)

হযরত যাবির (রা.) বলেন : বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন : মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীর বংশকেই স্বীয় পবিত্র সত্তার মাঝে নিহিত রেখেছেন । কিন্তু আমার বংশকে আলীর মাঝেই সুপ্ত রেখেছেন । (- ইয়ানাবী- উল- মুয়াদ্দাহ, ৩১৮ নং পৃষ্ঠা ।)

**হাদীসে হাক্ক**

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)- কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ 'আলী পবিত্র কুরআন ও সত্যের সাথে রয়েছে । আর পবিত্র কুরআন ও সত্যও আলীর সাথে থাকবে এবং তারা 'হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কখনই পরস্পর বিচ্ছিন হবে না । উক্ত হাদীসটি 'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ৫৩৯ নং পৃষ্ঠায় একই অর্থে সুন্নী সূত্রে ১৪টি এবং শীয়া সূত্রে ১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

**হাদীসে মানযিলাত**

হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.) বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.) কে বলেছেনঃ 'তুমি কি এতেই সন্তুষ্ট নও যে, তুমি (আলী) আমার কাছে মুসা (নবী) আর হারুনের মত? শুধু এই টুকুই পার্থক্য যে, আমার পর আর কোন নবী আসবে না । (বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ, ৭ম খণ্ড, ৩৩৯ নং পৃষ্ঠা । যাখাইরুল উকবা, ( তাবারী ), ৫৩ নং পৃষ্ঠা । ফুসুলুল মুহিম্মাহ, ২১ নং পৃষ্ঠা । কিফায়াতুত তালিব (গাঞ্জী শাফেয়ী), ১১৪৮ - ১৫৪ পৃষ্ঠা । খাসাইসুন্ - নাসাঈ, ১৯- ২৫ নং পৃষ্ঠা । আস্ সাওয়াইকুল মুরিকাহ , ১৭৭ নং পৃষ্ঠা ।) 'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ১০৯ নং পৃষ্ঠায় জনাব আল্লামা বাহরানী উক্ত হাদীসটি ১০০টি সুন্নী সূত্রে এবং ৭০টি শীয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন ।

**আত্মীয়দের দাওয়াতের হাদীস**

মহানবী (সা.) তার নিকট আত্মীয়দেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । আমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : এমন কোন ব্যক্তির কথা আমার জানা নেই, যে আমার চেয়ে উত্তম কিছু তার জাতির জন্যে উপহার স্বরূপ এনেছে । মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তার প্রতি আহবান জানানোর জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন । অতএব তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমাকে এ পথে সহযোগিতা করবে? আর সে হবে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমার খলিফা বা প্রতিনিধি । উপস্থিত সবাই নিরুত্তর রইল । অথচ আলী (আ.) যদিও উপস্থিত সবার মাঝে কনিষ্ট ছিলেন, তিনি বললেনঃ 'আমিই হব আপনার প্রতিনিধি এবং সহযোগী' । অতঃপর মহানবী (সা.) নিজের হাত তাঁর ঘাড়ের উপর রেখে বললেন : 'আমার এ ভাইটি আমার উত্তরাধিকারী এবং আমার খলিফা । তোমরা সবাই অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে' । এ দৃশ্য প্রত্যক্ষের পর উপস্থিত সবাই সেখান থেকে উঠে গেল এবং এ বিষয় নিয়ে ঠাট্রা- বিদ্রূপ করতে লাগলো । তারা জনাব আবু তালিবকে বললঃ মুহাম্মদ তোমাকে তোমার ছেলের আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে । (তারীখু আবিল ফিদা, ১ম খণ্ড, ১১৬ নং পৃষ্ঠা ।)

এ জাতীয় হাদীসের সংখ্যা অনেক, যেমন : হযরত হুযাইফা বলেন মহানবী (সা.) বলেছেনঃ তোমরা যদি আমার পরে আলীকে খলিফা ও আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিযুক্ত কর, তাহলে তোমরা তাকে একজন দিব্য দৃষ্টি

সম্পন্ন পথ প্রদর্শক হিসেবেই পাবে, যে তোমাদেরকে সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। তবে আমার মনে হয় না যে, এমন কাজ তোমরা করবে। (খলিফাতুল আউলিয়া, আবু নাঈম, ১ম খণ্ড, ৬৪ নং পৃষ্ঠা। কিফায়াতুত তালিব, ৬৭ নং পৃষ্ঠা, ১৩৫৬ হিজরীর নাজাফিয় মুদ্রণ।)

হযরত ইবনু মারদুইয়াহ (রা.) বলেনঃ মহানবী (সা.) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার মতই জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করতে চায় এবং বহেশতবাসী হতে চায়, সে যেন আমার পরে আলীর প্রেমিক হয় ও আমার পবিত্র আহলে বাইতের অনুসারী হয়। কারণ, তারা আমারই রক্ত সম্পর্কের ঘনিষ্ট আত্মিয়বর্গ এবং আমারই কাদামাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আমার জ্ঞান ও বোধশক্তি তারাই লাভ করেছে। সুতরাং হতভাগ্য সেই, যে তাদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করবে। অবশ্যই আমার সুপারিশ (শাফায়াত) থেকে তারা বঞ্চিত হবে। (মুন্তাখাবু কানযুল উম্মাল, মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, ৯৪ নং পৃষ্ঠা।

১৫৯। আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্, ৫ম খণ্ড, ২৭৭ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদিদ, ১ম খণ্ড, ১৩৩ নং পৃষ্ঠা। আল কামিল ফিত তারীখ (ইবনে আসির), ২য় খণ্ড, ২১৭ নং পৃষ্ঠা। তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলুক (তাবারী), ২য় খণ্ড, ৪৩৬ নং পৃষ্ঠা।

১৬০। আল কামিল ফিত তারীখ (ইবনে আসির), ২য় খণ্ড, ২৯২ নং পৃষ্ঠা। শারহু ইবনি আবিল হাদিদ, ১ম খণ্ড, ৪৫ নং পৃষ্ঠা।

১৬১। শারহু ইবনি আবিল হাদিদ, ১ম খণ্ড, ১৩৪ নং পৃষ্ঠা।

১৬২। তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৩৭ নং পৃষ্ঠা।

১৬৩। আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১১ নং পৃষ্ঠা।

১৬৪। উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি উল্লেখযোগ্য : শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের। আমরা কুরআনকে আরবী ভাষায় (বর্ণনা) করেছি, যাতে তোমারা চিন্তা কর। নিশ্চয়ই এই কুরআন আমার কাছে সমুন্নত ও অটল রয়েছে 'লওহে- মাহফুজে'। (সূরা যুখরূফ, ২- ৪ নং আয়াত।)

১৬৫। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ 'মে'রাজ' সংক্রান্ত হাদীসে মহানবী (সা.) কে বলেন : যে ব্যক্তি তার কার্য ক্ষেত্রে আমার (আল্লার) সন্তুষ্টি চায়। তাকে তিনটা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে।

ক. অজ্ঞতামূলক ভাবে প্রভুর প্রসংশা না করা।

খ. অন্যমনস্ক অবস্থায় প্রভুকে "স্মরণ না করা।

গ. প্রভুর ভালবাসায় যেন অন্যবস্তুর প্রেম কোন প্রভাব বিস্তার না করে। এমতবাস্থায় যে আমাকে ভালবাসবে আমিও তাকে ভালবাসবো এবং তার অন্তদৃষ্টি উন্মুচিত করে দেব, আমার ঐশ্বর্যের প্রতি। তার দৃষ্টি সম্মুখে সৃষ্টির

প্রকৃতরূপ প্রকাশিত হবে । তাকে রাতের আধারে অথবা সূর্যালোকে এমনকি জনগণের মাঝে বা নির্জনেও সাফল্যমণ্ডিত করবো । তখন সে আমার ও ফেরেস্তাদের কথা শুনতে পাবে এবং যে সকল রহস্য আমি আমার সৃষ্টিকূল থেকে গোপন রেখেছি তাও সে জানতে পারবে । আর তাকে শালীনতার পরিচ্ছদ পরিধান করানো হবে, যাতে সৃষ্টিকূল তার সাথে শালীনতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে । সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পথ চলবে । তার অন্তরকে ক্রন্দনময় ও দৃষ্টিশক্তিকে বিচক্ষণ করে দেন । তখন সে বহেশত ও দোযখের সব কিছু কেই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারবে । কেয়মতের দিন মহাভয় ও ভীতিতে মানুষের অবস্থা কেমন হবে তাও তাকে জানানো হবে । - বিহারূল আনোয়ার, (কোনম্পানী মুদ্রণ) ১৭ নং খণ্ড, ৯ নং পৃষ্ঠা ।] অন্য একটি হাদীস : আবি আব্দুল্লাহ্ (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন : একদিন রাসূল (সা.) এর সাথে হারেস বিন মালেক আন নু'মানী আল্ আনসারীর সাক্ষাত হল । অতঃপর রাসূল (সা.) তাকে বললেনঃ 'তুমি কেমন আছো, হে হারেস বিন মালিক?' সে বললো : 'হে রাসুলুল্লাহ্ (সা.), প্রকৃত মুমিনের অবস্থায় ।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ 'প্রত্যেকটি বিষয়ের যুক্তি বা প্রমাণ আছে, তোমার একথার যুক্তি বা প্রমাণ কি?' সে বললো : 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.), পার্থিবজগতে আমার আত্মার অবস্থা অবলোকন করেছি যার ফলে সারারাত জাগরণে এবং সমস্ত দিন রোযা রেখে কেটেছে । পৃথিবী থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে এমনকি যেন আমি দেখতে পাচ্ছি প্রভুর 'আরশ'কে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে মানুষের হিসাব নিকাশের জন্য । এখনই যেন আমি দেখতে পাচ্ছি বহেশতবাসীরা বেহেশতে আনন্দ উল্লাস করছে আরও শুনতে পাচ্ছি জাহান্নামীদের অগ্নিদগ্ধের বিকট আর্তনাদ ।' অতঃপর রাসূল (সা.) বললেনঃ 'তুমি এমন এক বান্দা যার অন্তরকে প্রভু ঐশী নুরে জ্যোতির্ময় করেছেন ।' (আল ওয়াফী, ৩য় খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা । )

১৬৬. মহান আল্লাহ্ বলেন : আমি তাদেরকে নেতা মনোনীত করলাম । তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ পদর্শন করত । আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার ওহী নাযিল করলাম ......"( সূরা আল আম্বিয়া, ৭৩ নং আয়াত ।)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন : তারা ধৈর্য অবলম্বন করতো বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত । (সূরা সিজদাহু , ২৪ নং আয়াত ।)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, ইমামগণ জনগণকে উপদেশ প্রদান ও বাহ্যিকভাবে সৎপথে পরিচালিত করা ছাড়াও একধরণের বিশেষ হেদায়েত ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন, যা সাধারণ জড়জগতের উর্ধ্বে । তাঁরা তাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক জাতি দিয়ে গণমানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রভাব বিস্তার করেন । আর এভাবে তাঁরা বিশেষ ক্ষমতা বলে অন্যদেরকে আত্মিক উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের সিড়িতে আরোহণে সাহায্য করেন ।

১৬৭ উদাহরণ স্বরূপ কিছু হাদীস : "যাবের বিন সামরাতেন বলেন : রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, বারজন প্রতিনিধি আবির্ভাবের পূর্বে এই অতীব সম্মানীত ধর্মের সমাপণ ঘটবে না । যাবের বললেন : জনগণ তাকবির

ধ্বনিতে গগন মুখরিত করে তুললো । অতঃপর রাসূল (সা.) আস্তে কিছু কথা বললেন । আমি আমার বাবাকে বললাম : কি বল্লেন? বাবা বললেন : রাসূল (সা.) বললেনঃ তারা সবাই কুরাইশ বংশের হবেন । (সহীহু আবু দাউদ, ২য় খণ্ড ২০৭ নং পৃষ্ঠা । মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, ৯২ নং পৃষ্ঠা । )

একই অর্থে বর্ণিত আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে । স্থানাভাবে এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে না । অন্য একটি হাদীসঃ সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হলাম যে যখন হোসাইন তার উরুর উপর ছিল এবং তিনি তার চোখ ও ওষ্ঠতে চুম্বন দিচ্ছেন আর বলছেন যে , তুমি সাইয়্যেদের সন্তান সাইয়্যেদ এবং তুমি ইমামের সন্তান ইমাম, তুমি ঐশী প্রতিনিধির সন্তান ঐশী প্রতিনিধি । আর তুমি নয় জন ঐশী প্রতিনিধিরও বাবা, যাদের নবম ব্যক্তি হলেন কায়েম (ইমাম মাহ্দী) । [- ইয়ানাবী- উল্ - মুয়াদ্দাহ, ( সুলাইমান বিন ইব্রাহীম কান্দুযি) ৭ম মুদ্রণ, ৩০৮ নং পৃষ্ঠা ।)]

১৬৮. নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্যঃ

১. 'আল- গাদীর'- আল্লামা আমিনী ।

২. 'গায়াতুল মারাম'- সাইয়্যেদ হাশিম বাহরানী ।

৩. 'ইসবাতুল হুদাহ '- মুহাম্মদ বিন হাসান আল হুর আল্ আমিলী ।

৪. 'যাখাইরুল উকবা' মহিবুদ্দিনে আহমাদ বিন আবদিল্লাহ আত তাবারী ।

৫. 'মানাকিব'- খারাযমি ।

৬. 'তাযকিরাতুল খাওয়াস '- সিবতু ইবনি জাউযি ।

৭. 'ইয়া নাবী উল মুয়াদ্দাহ, সুলাইমান বিন ইব্রাহীম কান্দুযি হানাফী ।

৮. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ'- ইবনু সাব্বাগ ।

৯. 'দালাইলুল ইমামাহ' - মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী ।

১০. 'আন নাস্ ওয়াল ইজতিহাদ' আল্লামা শারাফুদ্দীন আল মুসাভী ।

১১. উসুলুল কাফী, ১ম খণ্ড - মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আল কুলাইনী ।

১২. 'কিতাবুল ইরশাদ' - শেইখ মুফিদ ।

১৬৯. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ( ২য় মুদ্রণ), ১৪ নং পৃষ্ঠা । 'মানাকিবে খারাযমি' ১৭ নং পৃষ্ঠা ।

১৭০. 'যাখাইরুল উকবা' ১৩৫৬ হিজরী মিশরীয় মুদ্রণ, ৫৮ নং পৃষ্ঠা । 'মানাকিবে খারাযমি'১৩৮৫ হিজরী নাজাফিয় মুদ্রণ, ১৬ থেকে ২২ নং পৃষ্ঠা । 'ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ' ( ৭ম মুদ্রণ), ৬৮ থেকে ৭২ নং পৃষ্ঠা ।

১৭১. 'কিতাবুল ইরশাদ' ( শেইখ মুফিদ), ১৩৭৭ হিজরী তেহরানের মুদ্রণ, ৪ নং পৃষ্ঠা । 'ইয়ানাবীউল মুয়াদ্দাহ' ১২২ নং পৃষ্ঠা ।

১৭২. ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ২৮ থেকে ৩০ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ১৩৮৩ হিজরী নাজাফিয় সংস্করণ, ৩৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ’ ১০৫ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে খারাযমি’ ৭৩ থেকে ৭৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭৩. ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ৩৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭৪. ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ২০ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ২০ থেকে ২৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ’ ৫৩ থেকে ৬৫ নং পৃষ্ঠা।

১৭৫. ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ১৮ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ২১ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে খারাযমি’ ৭৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭৬. ‘মানাকিবে আলে আবি তালিব’ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাহরের আশুব), কোমে মুদ্রিত, ৩য় খণ্ড, ৬২ ও ২১৮ নং পৃষ্ঠা। ‘গায়াতুল মারাম’ ৫৩৯ নং পৃষ্ঠা। ‘ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ’ ১০৪ নং পৃষ্ঠা।

১৭৭. ‘মানাকিবে আলে আবি তালিব’ ৩য় খণ্ড, ৩১২ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১১৩ থেকে ১২৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ১৭২ থেকে ১৮৩ নং পৃষ্ঠা।

১৭৮. ‘তাযকিরাতল খাওয়াস’ ২৭ নং পৃষ্ঠা।

১৭৯. ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ২৭ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে খারাযমি’ ৭১ নং পৃষ্ঠা। ১৮০. ‘মানাকিব আলে আবি তালিব’ ৩য় খণ্ড, ২২১ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে খারাযমি’ ৯২ নং পৃষ্ঠা।

১৮১. ‘নাহজুল বালাগা’ ৩য় খণ্ড, ২৪ নং অধ্যায়।

১৮২. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ২১ থেকে ২৫ নং পৃষ্ঠা। ‘যাখাইরুল উকবা’ ৬৫ ও ১২১ নং পৃষ্ঠা।

১৮৩. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ২৮ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ (মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী), ১৩৬৯ হিজরী নাজাফীয় মুদ্রণ, ৬০ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৩৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস্’ ১৯৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখু ইয়াকুবী’ ১৩১৪ হিজরীতে নাজাফে মুদ্রিত, ২য় খণ্ড, ২০৪ নং পৃষ্ঠা। ‘উসুলুল কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৬১ নং পৃষ্ঠা।

১৮৪. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৪৪ নং পৃষ্ঠা।

১৮৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা। ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ, (আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ), ১ম খণ্ড, ১৬৩ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৪৫ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ১৯৭ নং পৃষ্ঠা।

১৮৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ), ১৭৩ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৫ নং পৃষ্ঠা । ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ, ( আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ ), ১ম খণ্ড, ১৬৪ নং পৃষ্ঠা ।

১৮৭. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ), ১৭৪ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৪২ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৪৬ নং পৃষ্ঠা ।

১৮৮. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ), ১৮১ নং পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল হুদাহ’ ৫ম খণ্ড, ১২৯ ও ১৩৪ নং পৃষ্ঠা ।

১৮৯ । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ১৭৯ নং পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল হুদাহ্’ ৫ম খণ্ড, ১৫৮ ও ২১২ নং পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ’ ( মাসউদী) [১৩২০ হিজরীতে তেহরানে মুদ্রিত] ১২৫ নং পৃষ্ঠা ।

১৯০. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ১৮২ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখু ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড, ২২৬- ২২৮ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৫৩ নং পৃষ্ঠা ।

১৯১. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৮ নং পৃষ্ঠা ।

১৯২. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৮ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ১৮২ নং পৃষ্ঠা । ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস্ সিয়াসাহ’ ১ম খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড, ২২৯ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৫৩ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ২৩৫ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৩. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২০১ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৪. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২০১ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৬৮ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২০৪ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৭০ নং পৃষ্ঠা । ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ২য় সংস্করণ, ৭৩ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৭. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২০৫ নং পৃষ্ঠা । ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৭১ নং পৃষ্ঠা । ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ২য় সংস্করণ, ৭৩ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৮. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা ।

১৯৯. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৯৯ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২১৪ নং পৃষ্ঠা ।

২০০. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২১৪ নং পৃষ্ঠা।

২০১. ‘বিহারুল আনোয়ার’ ১০ম খণ্ড, ২০০, ২০২ ও ২০৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০২. ‘মাকাতিলুত তালেবিন’ ৫২ ও ৫৯ নং পৃষ্ঠা।

২০৩. ‘তাযকিরাতুস খাওয়াস্’ ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল হুদাহ’ ৫ম খণ্ড, ২৪২ নং পৃষ্ঠা।

২০৪. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ৮০ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৯০ নং পৃষ্ঠা।

২০৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৪৬ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৯৩ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ১৯৭ নং পৃষ্ঠা।

২০৬. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৬৯ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ১ম খণ্ড, ২৪৫ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২০২ ও ২০৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৬৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৪০ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ৯৪ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২১০ নং পৃষ্ঠা।

২০৭. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৪৫ থেকে ২৫৩ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুর রিজাল’ মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আব্দুল আজিজ কাশী। ‘কিতাবুর রিজাল’ - মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আত তুসী।

২০৮. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১১১ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১১৯ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহু’ ২১২ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস্’ ৩৪৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২৮০ নং পৃষ্ঠা।

২০৯. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২০৪ ও নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২৪৭ নং পৃষ্ঠা।

২১০. ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ২১২ ও নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১১১ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ্’ ১৪২ নং পৃষ্ঠা।

২১১. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৩১০ নং পৃষ্ঠা।

২১২. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৭৬ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৭০ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২১৪ থেকে ২২৩ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১৪৬ থেকে ১৪৮ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল

খাওয়াস’ ৩৪৮ থেকে ৩৫০ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩২৪ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা ।

২১৩. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২৭৯ থেকে ২৮৩ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ১৪৭ ও ১৫৪ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মহিম্মাহ’ ২২২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩২৩ ও ৩২৭ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা ।

২১৪. ‘উসুলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৬ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২৮৪ থেকে ২৯৬ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ১৭৫ থেকে ১৭৭ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২২৫ থেকে ২৪৬ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৮৮ নং পৃষ্ঠা ।

২১৫. ‘উসুলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৮ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২৩৭ নং পৃষ্ঠা।

২১৬. ‘দালাইরুল ইমামাহ’ ১৯৭ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৬৩ নং পৃষ্ঠা ।

২১৭. ‘উসুলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৯নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২৯০ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৩৭ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৬৩ নং পৃষ্ঠা ।

২১৮. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৫১ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইহতিজাজ’ ( আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আত তাবারসি ), - হিজরী ১৩৮৫ সনের নাজাফীয় মুদ্রণ, ২য় খণ্ড, ১৭০ থেকে ২৩৭ নং পৃষ্ঠা ।

২১৯. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ২৯৭ নং পৃষ্ঠা । ‘উসুলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৯৭ থেকে ৪৯২ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ২০১ থেকে ২০৯ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৭৭ থেকে ৩৯৯ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৪৭ থেকে ২৫২ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫৮ নং পৃষ্ঠা ।

২২০. ‘উসুলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৯৭ থেকে ৫০২ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ৩০৭ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ২১৬ থেকে ২২২ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২৫৯ থেকে ২৬৫ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস্’ ৩৬২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪০১ থেকে ৪২০ নং পৃষ্ঠা ।

২২১. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ ( শেইখ মুফিদ) ৩০৭ থেকে ৩১৩ নং পৃষ্ঠা । ‘উসূলে কাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০১ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৬১ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫৯ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে

আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪১৭ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ’ ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ২১৭ নং পৃষ্ঠা। ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ৩৯৫ নং পৃষ্ঠা। ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ৩৯৫ ও ৩৯৬ নং পৃষ্ঠা।

২২২. মাকাতিলুত তালিবীন ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

২২৩. মাকাতিলুত তালিবীন ৩৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯৬পৃষ্ঠা।

২২৪. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩১৫ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ২২৩ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৬৬ থেকে ২৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪২২ নং পৃষ্ঠা। ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস’ ৩৬২ নং পৃষ্ঠা।

২২৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫১২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪২৯ ও ৪৩০ নং পৃষ্ঠা।

২২৬. ‘সহীহ তিরমিযি’ ৯ম খণ্ড, হযরত মাহদী (আ.) অধ্যায়। ‘সহীহ্ ইবনে মাযা’ ২য় খণ্ড, মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অধ্যায়। ‘কিতাবুল বায়ান ফি আখবারি সাহেবুজ্জামান’ - মুহাম্মদ ইউসুফ শাফেয়ী। ‘নুরুল আবসার’- শাবলাঞ্জি। ‘মিশকাতুল মিসবাহ্’ - মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খাতিব। ‘আস্ সাওয়াইক আল মুরিকাহ’ - ইবনে হাজার। ‘আস আফুর রাগিবিন’ - মুহাম্মদ আস সাবান। (‘কিতাবুল গাইবাহ’ - মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম নোমানী। ‘কামালুদ দ্বীন’- শেইখ সাদুক। ‘ইসবাতুল হুদাহ্’ - মুহাম্মদ বিন হাসান হুর আল আমেলী। ‘বিহারুল আনোয়ার’ - আল্লামা মাজলিসি ৫১ ও ৫২ নং খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

২২৭. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০৫ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩১৯ নং পৃষ্ঠা।

২২৮. রিজালে কাশী, রিজালে তুসী, ফেহরেস্ত - এ তুসী ও অন্যান্য রিজাল গ্রন্থসমূহ।

২২৯. ‘বিহারূল আনোয়ার’ ৫১ নং খণ্ড, ৩৪২ ও ৩৪৩ থেকে ৩৬৬ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল গাইবাহ শেইখ মুহামাদ বিন হাসান তুসী - দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২১৪ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল হুদাহু’ ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

২৩০. বিহারূল আনোয়ার’ ৫১ নং খণ্ড, ৩৬০ থেকে ৩৬১ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল গাইবাহ্’ - শেইখ মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী’ ২৪২ নং পৃষ্ঠা।

২৩১. নমুনা স্বরূপ একটি হাদীসের উদ্ধৃতী এখানে দেয়া হলঃ এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (ফসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৭১ নং পৃষ্ঠা।)

২৩২. উদাহরণ স্বরূপ দু'টি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল, "হযরত ইমাম বাকের (আ.) বলেছেনঃ যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে, তখন মহান আল্লাহ তার ঐশী শক্তিতে সমস্ত বান্দাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে পূর্ণত্ব দান করবেন। (বিহারুল আনোয়ার' ৫২তম খণ্ড, ৩২৮ ও ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।) আবু আব্দুল্লাহ্ (আ.) বলেনঃ সমস্ত বিদ্যা ২৭টি অক্ষরের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসূল (সা.)- এর আনীত জনগণের উদ্দেশ্যে সমস্ত বিদ্যার পরিমাণ মাত্র দুটি অক্ষর সমান। মানবজাতি আজও ঐ দুটি অক্ষর পরিমাণ জ্ঞানের অধিকের সাথে পরিচিত হয়নি। তবে যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে তখন আরও ২৫টি অক্ষরের বিদ্যা জনসমাজে প্রকাশ ঘটাবেন। একইসাথে পূর্বের ঐ দু'টি অক্ষরের বিদ্যাও তিনি সংযুক্ত করবেন, ফলে জ্ঞান ২৭টি অক্ষরে পরিপূর্ণ হবে। (বিহারুল আনোয়ার, ৫২তম খণ্ড ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।)

২৩৩. উদাহরণ স্বরূপ আরো একটি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল : জনাব সিক্কিন বিন আবি দালাফ বলেনঃ আমি হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন রেজা (আ.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আমার পরবর্তী ইমাম হবে আমারই পুত্র হাদী। তার আদেশ ও বক্তব্য সমূহ আমারই আদেশ ও বক্তব্যের সমতুল্য আর তাঁর আনুগত্য আমাকে আনুগত্য করার শামিল। হাদীর পরবর্তী ইমাম হবে তারই সন্তান হাসান আসকারী। যার আদেশ ও বক্তব্য সমূহ তার পিতারই আদেশ ও বক্তব্য ও আদেশসম। একইভাবে তার আনুগত্য তার বাবারই আনুগত্যের শামিল। (অতঃপর ইমাম যাওয়াদ (আ.) নীরব থাকলেন) - তাকে বলা হল : হে রাসূলের সন্তান ! হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম কে হবেন? (ইমাম যাওয়াদ) প্রচন্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন : হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম তারই সন্তান কায়েম (মাহদী) সত্যের উপর অধিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুত। (বিহারুল আনোয়ার' ৫১তম খণ্ড, ১৫৮ নং পৃষ্ঠা।)

## সূচীপত্র: